ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ

শ্লোক ১-২

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতি; **পুরুষম্**—পুরুষ; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **ক্ষেত্রজ্ঞম্**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **এতৎ**—এই সমস্ত; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞেয়ম্**—জ্ঞেয়; **চ**—ও; **কেশব**—হে কৃষ্ণ; **শ্রীভগবান্ উবাচ**—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইদম্**—এই; **শরীরম্**—শরীর; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **ইতি**—এভাবে; **অভিধীয়তে**—অভিহিত হয়; **এতৎ**—এই; **যঃ**—যিনি; **বেত্তি**—জানেন; **তম্**—তাঁকে; **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **ক্ষেত্রজ্ঞ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **ইতি**—এভাবে; **তদ্বিদঃ**—যিনি জানেন।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

প্রকৃতির আর পুরুষ ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রজ্ঞ ।
জানিবার ইচ্ছা মোর আমি নহি বিজ্ঞ ॥
সেইরূপ জ্ঞান আর বিজ্ঞান কি হয় ।
কেশব আমাকে কহ করিয়া নিশ্চয় ॥

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

হে কৌন্তেয়! এ শরীর ক্ষেত্র নাম তার ।
ইহার যে জ্ঞাতা সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে কেশব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই সমস্ত তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করি।

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং যিনি এই শরীরকে জানেন, তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

অর্জুন প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়র বিষয় সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন যে, এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং যিনি এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত তাঁকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। এই দেহ হচ্ছে বদ্ধ জীবের কর্মক্ষেত্র। বদ্ধ জীব মাত্রই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড়া প্রকৃতির উপরে আধিপত্য করার চেষ্টা করে। আর তাই, জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা অনুসারে সে একটি কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। সেই কর্মক্ষেত্রটি হচ্ছে তার দেহ। এই দেহটি কি? দেহটি ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে তৈরি। বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায় এবং তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার ক্ষমতা অনুসারে সে একটি শরীর বা কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। তাই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র অথবা বদ্ধ জীবের কর্ম করার ক্ষেত্র। এখন, যে ব্যক্তি তার দেহের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত তাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং দেহ ও দেহের জ্ঞাতা এদের পার্থক্য বুঝতে পারা খুব একটা কঠিন নয়।

যে কেউই বিবেচনা করে দেখতে পারেন যে, শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার দেহে কত পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু তবুও দেহের যে দেহী তার কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি সব সময় একই থাকেন। এভাবেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। এভাবেই বদ্ধ জীব বুঝতে পারে যে, সে তার দেহ থেকে ভিন্ন। *ভগবদ্গীতার* প্রথম দিকেই বর্ণনা করা হয়েছে, *দেহিনোঽস্মিন্* অর্থাৎ দেহের দেহী আছে এবং দেহ কৌমার থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পরিবর্তন হচ্ছে এবং যে ব্যক্তি এই দেহের মালিক তিনি জানেন যে, দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। দেহের এই মালিকই হচ্ছেন ক্ষেত্রজ্ঞ। কখনও আমরা মনে করে থাকি যে, "আমি সুখী," "আমি একটি পুরুষ", "আমি একটি মহিলা," "আমি একটি কুকুর", "আমি একটি বেড়াল।" এগুলি হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞের দেহগত উপাধি। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ দেহ থেকে ভিন্ন। যদিও আমরা অনেক জিনিস ব্যবহার করে থাকি, যেমন আমাদের কাপড় চোপড় আদি। আমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত ব্যবহৃত জিনিসগুলি থেকে আমরা স্বতন্ত্র। তেমনই, একটু চিন্তা করার ফলে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দেহ থেকে আমরা স্বতন্ত্র। দেহের মালিক আমি, তুমি অথবা যে কেউই হচ্ছি ক্ষেত্রজ্ঞ এবং দেহটিকে বলা হয় ক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্র।

ভগবদ্গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে দেহের জ্ঞাতা বা জীব এবং তার স্থিতি, যার দ্বারা সে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে, তা বর্ণিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* মধ্যবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান এবং ভক্তিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পরমপদ এবং তাঁর নিত্য সেবকরূপে জীবের যে স্বাভাবিক স্বরূপ তা এই অধ্যায়গুলিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। জীব সর্ব অবস্থাতেই অধীনতত্ত্ব, কিন্তু ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। শুভ কর্ম বা সুকৃতির প্রভাবে যখন তাঁদের চেতনার উন্মেষ হয়, তখন তাঁরা আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীরূপে ভগবানের অনুগামী হন। সেই কথাও বর্ণিত হয়েছে। এখন ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে জীব কিভাবে জড় জগতের সংস্পর্শে আসে এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে সে কিভাবে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মাধ্যমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে এখানে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীব যদিও তাঁর জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, তবুও সে তার জড় দেহের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। সেই কথাও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞম্—ক্ষেত্রজ্ঞ; **চ**—ও; **অপি**—অবশ্যই; **মাম্**—আমাকে; **বিদ্ধি**—জানবে; **সর্ব**—সমস্ত; **ক্ষেত্রেষু**—ক্ষেত্রে; **ভারত**—হে ভারত; **ক্ষেত্র**—ক্ষেত্র (শরীর); **ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যৎ**—যে; **তৎ**—সেই; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **মতম্**—অভিমত; **মম**—আমার।

গীতার গান

আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ বুঝ সকল শরীরে ।
হে ভারত, অন্তর্যামী কহে সে আমারে ॥
সেই ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের যেবা জ্ঞান ।
আমার বিচারে হয় সেই শুদ্ধ জ্ঞান ॥

অনুবাদ

হে ভারত! আমাকেই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

আমরা যখন দেহ ও দেহের জ্ঞাতা, আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন আমরা তিনটি আলোচনার বিষয় দেখতে পাই—ভগবান, জীব ও জড় পদার্থ। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে বা প্রতিটি দেহে দুটি আত্মা আছে—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যেহেতু পরমাত্মা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ, তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু আমি দেহের অণু ক্ষেত্রজ্ঞ নই, আমি হচ্ছি পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমাত্মা রূপে আমি প্রতিটি শরীরেই অবস্থান করি।"

কেউ যদি *ভগবদ্গীতার* পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেন, তা হলে তিনি জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

ভগবান বলছেন, "আমি প্রতিটি দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ।" জীবাত্মা তার নিজের দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু অন্য শরীর সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই। পরমেশ্বর ভগবান যিনি পরমাত্মা রূপে প্রত্যেক শরীরে বর্তমান, তিনি সমস্ত শরীর সম্বন্ধে

সর্বতোভাবে অবগত। তিনি দেবতা, মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা আদি সমস্ত প্রজাতির শরীর সম্বন্ধেই সর্বতোভাবে অবগত। কোন নাগরিক যেমন শুধু তার নিজের জমিটি সম্বন্ধেই অবগত, কিন্তু রাজা কেবল তাঁর রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধেই অবগত নন, তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের সমস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধেও অবগত। তেমনই, কেউ তাঁর নিজের দেহের মালিক হতে পারেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের মালিক। রাজা হচ্ছেন তাঁর রাজ্যের মুখ্য মালিক এবং নাগরিকেরা হচ্ছেন গৌণ মালিক। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের মুখ্য মালিক।

দেহ গঠিত হয় ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন হৃষীকেশ, যার অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা'। রাজা যেমন রাজ্যের সমস্ত কার্যকলাপের মুখ্য নিয়ন্তা এবং তাঁর প্রজারা হচ্ছে গৌণ নিয়ন্তা, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান নিয়ন্তা। ভগবান বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ"। এর অর্থ হচ্ছে যে, তিনি হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ; জীবাত্মা কেবল তার নিজের শরীরটির ক্ষেত্রজ্ঞ। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভে ।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥

এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং এই দেহের মধ্যেই বাস করেন দেহের মালিক। পরমেশ্বর ভগবান এই দেহ ও দেহের মালিক উভয়কেই জানেন। তাই, তাঁকে সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। এভাবেই কর্মক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরম ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। দেহের স্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপ ও পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানকে বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞান বলা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মত। জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে এক কিন্তু তবুও স্বতন্ত্র বলে বুঝতে পারাটাই হচ্ছে জ্ঞান। যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে অবগত নন, তিনি যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হননি। প্রকৃতি, পুরুষ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের পরম নিয়ন্তা পরম ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। এই তিনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। চিত্রকার, চিত্র ও চিত্র অঙ্কনের ফলক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এই জড় জগৎ, যা হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, তা হচ্ছে প্রকৃতি আর এর ভোক্তা হচ্ছে জীব এবং এই উভয়ের ঊর্ধ্বে পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। বৈদিক শাস্ত্রে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* ১/১২) বলা হয়েছে—*ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা/ সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ*। ব্রহ্মকে তিনভাবে উপলব্ধি করা যায়—কর্মক্ষেত্র রূপে প্রকৃতিই হচ্ছে ব্রহ্ম, জীবও ব্রহ্ম এবং সে জড় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার

চেষ্টা করছে এবং এই উভয়েরই নিয়ন্তাও হচ্ছেন ব্রহ্ম, কিন্তু তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত নিয়ন্তা।

এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যে, এই দুই ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে একজন হচ্ছেন ভ্রান্ত এবং অপর জন অভ্রান্ত। একজন ঊর্ধ্বতন, অপর জন অধস্তন। যারা মনে করে যে, এই উভয় ক্ষেত্রজ্ঞই এক এবং অভিন্ন, তারা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে। এখানে তিনি অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ", রজ্জুকে যার সর্প ভ্রম হয়, তার যথার্থ জ্ঞান নেই। ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে এবং সেই সমস্ত শরীরে ভিন্ন ভিন্ন শরীরী বা মালিক আছেন। যেহেতু প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মার এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার ব্যক্তিগত ক্ষমতা আছে, তাই তাদের ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে। কিন্তু পরম নিয়ন্তারূপে পরমেশ্বর ভগবানও সেই সমস্ত শরীরে বর্তমান। *চ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না তার মাধ্যমে সমস্ত শরীরকে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিমত। প্রতিটি শরীরে আত্মা ছাড়াও পরমাত্মা রূপে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কর্মক্ষেত্র ও তার সীমিত ভোক্তা উভয়েরই নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমাত্মা।

শ্লোক ৪

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

তৎ—সেই; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **যৎ**—যা; **চ**—ও; **যাদৃক্**—যে রকম; **চ**—ও; **যৎ**—যেরূপ; **বিকারি**—বিকার; **যতঃ**—যার থেকে; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **যৎ**—যেরূপ; **প্রভাবঃ**—প্রভাব; **চ**—ও; **তৎ**—সেই; **সমাসেন**—সংক্ষেপে; **মে**—আমার থেকে; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

সেই ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার ।
কি তার স্বরূপ কিংবা কি তার বিচার ॥
কি তার প্রভাব কিংবা কোথা হতে হয় ।
শুন তুমি কহি আমি করিয়া নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

সেই ক্ষেত্র কি, তার কি প্রকার, তার বিকার কি, তা কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি এবং তার প্রভাব কি, সেই সব সংক্ষেপে আমার কাছে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এই শরীর কিভাবে গঠিত হয়েছে, তার গঠনের উপাদানগুলি কি, কার নিয়ন্ত্রণাধীনে এই শরীর কাজ করে চলেছে, কিভাবে তার পরিবর্তন হচ্ছে, কোথা থেকে এই পরিবর্তনগুলি আসছে, তার কারণ কি, তার উদ্দেশ্য কি, প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মার পরম লক্ষ্য কি এবং স্বতন্ত্র আত্মার প্রকৃত রূপ কি, সেই সম্বন্ধে জানতে হবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য, তাঁদের বিভিন্ন প্রভাব এবং তাঁদের শক্তি আদি সম্বন্ধে জানতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের বর্ণনা অনুসারে সরাসরিভাবে এই *ভগবদ্গীতা* উপলব্ধি করতে হবে, তখন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে হবে, সকলের দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে জীবাত্মার সঙ্গে এক বলে যেন মনে না করি। এটি অনেকটা শক্তিমান ও শক্তিহীনকে সমান বলে মনে করারই সামিল।

শ্লোক ৫

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

ঋষিভিঃ—ঋষিগণ কর্তৃক; **বহুধা**—বহু প্রকারে; **গীতম্**—বর্ণিত হয়েছে; **ছন্দোভিঃ**—বৈদিক ছন্দের দ্বারা; **বিবিধৈঃ**—বিবিধ; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **ব্রহ্মসূত্র**—বেদান্তের; **পদৈঃ**—সূত্রের দ্বারা; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **হেতুমদ্ভিঃ**—যুক্তিযুক্ত; **বিনিশ্চিতৈঃ**—নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

দার্শনিক ঋষি কত করেছে বিচার ।
স্মৃতি ছন্দে কত বলে নাহি তার পার ॥

কিন্তু বেদান্ত বাক্যে যুক্তির সহিত।
যে বিচার করিয়াছে লাগি লোকহিত ॥
সেই সে বিচার জান সুসিদ্ধান্ত মত।
সকলের গ্রহণীয় ছাড়ি অন্য পথ ॥

অনুবাদ

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ বেদবাক্যের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেদান্তসূত্রে তা বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই তত্ত্বজ্ঞান বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তবুও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে, পণ্ডিত ও আচার্যেরা সর্বদাই পূর্বতন আচার্যদের নজির দিয়ে থাকেন। আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে অত্যন্ত বিতর্কমূলক দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ *বেদান্ত* শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে তিনি বিভিন্ন ঋষিদের মতের উল্লেখ করেছেন। সমস্ত ঋষিদের মধ্যে *বেদান্ত-সূত্রের* প্রণেতা ব্যাসদেব হচ্ছেন মহর্ষি এবং *বেদান্ত-সূত্রে* দ্বৈতবাদকে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনিও ছিলেন একজন মহর্ষি এবং তাঁর প্রণীত ধর্মশাস্ত্রে তিনি লিখেছেন, *অহং ত্বং চ তথান্যে*...."আমরা, আপনি, আমি এবং অন্য সমস্ত জীব—জড় দেহে থাকলেও জড়াতীত। এখন আমরা আমাদের বিভিন্ন কর্ম অনুসারে জড় জগতের তিনটি গুণের মধ্যে পতিত হয়েছি। তার ফলে, কেউ উচ্চ স্তরে আছে, আবার কেউ নিম্ন স্তরে। অজ্ঞানতার ফলে উচ্চ ও নিম্ন প্রকৃতি বিদ্যমান হয় এবং অগণিত জীবের মধ্যে তা প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু পরমাত্মা, যিনি অচ্যুত, তিনি কখনই তিন গুণের দ্বারা কলুষিত হন না এবং তিনি হচ্ছেন গুণাতীত।" তেমনই, আদি *বেদে*, বিশেষ করে *কঠ উপনিষদে* আত্মা, পরমাত্মা ও দেহের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। বহু মুনি-ঋষি এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরাশর মুনিকে তাঁদের মধ্যে প্রধান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

ছন্দোভিঃ শব্দটির দ্বারা বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রাদিকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, *যজুর্বেদের* একটি শাখা *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* প্রকৃতি, জীবসত্তা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, *ক্ষেত্র* বলতে বোঝায় কর্মের ক্ষেত্র এবং দুই ধরনের ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন—স্বতন্ত্র জীবাত্মা ও পরম আত্মা। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৯) বলা হয়েছে—*ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা*। পরমেশ্বর ভগবানের 'অন্নময়' নামে একটি শক্তির প্রকাশ হয়, যার ফলে জীব তার জীবন ধারণের জন্য অন্নের উপর নির্ভর করে। এটি পরমেশ্বর সম্বন্ধে একটি জড় উপলব্ধি। তারপর 'প্রাণময়', অর্থাৎ অন্নের মধ্যে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার পর প্রাণের লক্ষণের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করা। প্রাণময় লক্ষণের অতীত 'জ্ঞানময়' উপলব্ধি চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারপর ব্রহ্ম-উপলব্ধিকে বলা হয় 'বিজ্ঞানময়,' যার ফলে জীবের মন ও প্রাণের লক্ষণগুলি থেকে জীবকে স্বতন্ত্র বলে উপলব্ধি করা যায়। তার পরে পরম স্তর হচ্ছে 'আনন্দময়' অর্থাৎ সর্ব আনন্দময় প্রকৃতির উপলব্ধি। ব্রহ্ম-উপলব্ধির এই পাঁচটি স্তর আছে, যাকে বলা হয় *ব্রহ্ম পুচ্ছম্*। এর মধ্যে প্রথম তিনটি—অন্নময়, প্রাণময় ও জ্ঞানময় জীবের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে বলা হয় 'আনন্দময়'। *বেদান্ত-সূত্রেও* পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয়েছে *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*—পরমেশ্বর ভগবান স্বভাবতই আনন্দময়। তাঁর সেই দিব্য আনন্দ উপভোগ করার জন্য তিনি নিজে বিজ্ঞানময়, প্রাণময়, জ্ঞানময় ও অন্নময়রূপে প্রকাশিত হন। কর্ম করবার এই ক্ষেত্রে জীবকে ভোক্তা বলে মনে করা হয় এবং আনন্দময় তার থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ, জীব যদি আনন্দময়ের সেবায় ব্রতী হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনন্দ লাভের প্রয়াসী হয়, তা হলেই তাঁর অস্তিত্ব সার্থক হয়। পরম ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, জীবের অধস্তন ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতিরূপে পরমেশ্বর ভগবানের এই হচ্ছে প্রকৃত আলেখ্য। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য *বেদান্তসূত্র* কিংবা *ব্রহ্মসূত্রের* অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *ব্রহ্মসূত্রের* অনুশাসনগুলি কার্য-কারণ অনুসারে অতি সুচারুভাবে সাজানো আছে। কতকগুলি সূত্র হচ্ছে—*ন বিয়দ্ অশ্রুতেঃ* (২/৩/২), *নাত্মা শ্রুতেঃ* (২/৩/১৮) এবং *পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ* (২/৩/৪০)। প্রথম সূত্রটিতে কর্মক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে জীবসত্তার কথা বলা হয়েছে এবং তৃতীয়টিতে বিবিধ সত্তার সকল প্রকার অভিপ্রকাশের আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬-৭

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

মহাভূতানি—মহাভূতসমূহ; অহঙ্কারঃ—অহঙ্কার; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; অব্যক্তম্—অব্যক্ত; এব—অবশ্যই; চ—ও; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; দশৈকম্—একাদশ; চ—ও; পঞ্চ—পাঁচ; চ—ও; ইন্দ্রিয়গোচরাঃ—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; ইচ্ছা—ইচ্ছা; দ্বেষঃ—দ্বেষ; সুখম্—সুখ; দুঃখম্—দুঃখ; সংঘাতঃ—সমষ্টি; চেতনা—চেতনা; ধৃতিঃ—ধৈর্য; এতৎ—এই সমস্ত; ক্ষেত্রম্—ক্ষেত্র; সমাসেন—সংক্ষেপে; সবিকারম্—বিকারযুক্ত; উদাহৃতম্—বর্ণিত হল।

গীতার গান

ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, ব্যোম মহাভূত ।
অহঙ্কার, বুদ্ধি আর মন অব্যক্ত সম্ভূত ॥
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যাহা জানি ।
পায়ু, পাদ, পেট, লিঙ্গ আর যাহা পাণি ॥
সেই দশ বাহ্য—আর মন সে অন্তরে ।
একাদশ ইন্দ্রিয় সে শাস্ত্রের বিচারে ॥
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ যে বিষয় ।
চব্বিশ সে তত্ত্ব বুঝ ক্ষেত্র পরিচয় ॥
ইহাদের যে বিচার করে বিশ্লেষণে ।
ক্ষেত্রতত্ত্ব সেই বিজ্ঞ ভালরূপ জানে ॥
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ আর যে সঙ্ঘাত ।
স্থূল দেহ পরিমাণ পঞ্চ মহাভূত ॥
চেতনা শক্তি যে হয় জীবের আধার ।
তার সঙ্গে ধৃতি জান ক্ষেত্রের বিকার ॥
অতএব এই সব একত্রে সে ক্ষেত্র ।
স্থূল সূক্ষ্ম জড় বিদ্যা সেই যে সর্বত্র ॥

অনুবাদ

পঞ্চ-মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ দেহ, চেতনা ও ধৃতি—এই সমস্ত বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

তাৎপর্য

মহর্ষিদের প্রামাণ্য বাক্য, বৈদিক ছন্দ ও *বেদান্তসূত্র* থেকে এই জগতের মৌলিক উপাদানগুলি জানতে পারা যায়। প্রথমে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। এদের বলা হয় পঞ্চ-মহাভূত। তা ছাড়া আছে অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রধান (অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতির তিনটি গুণ)। তারপর আছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। তারপর পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। তারপর ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে আছে মন, যাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা যেতে পারে। সুতরাং, মনকে নিয়ে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা হচ্ছে একাদশ। তারপর আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা তন্মাত্র—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। এই চব্বিশটি তত্ত্বকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় কর্মক্ষেত্র। কেউ যদি এই চব্বিশটি বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণ করেন, তা হলে তিনি কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে খুব ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তারপর আছে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ, যা হচ্ছে স্থূল দেহের অন্তর্গত পঞ্চ-মহাভূতের পারস্পরিক ক্রিয়া বা অভিব্যক্তি। জীবনের লক্ষণ চেতনা ও ধৃতি হচ্ছে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্মদেহের প্রকাশ। এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলিও কর্মক্ষেত্রের অন্তর্গত।

পঞ্চ-মহাভূতগুলি হচ্ছে অহঙ্কারের স্থূল অভিব্যক্তি। সেগুলিই আবার অহঙ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে 'তামস-বুদ্ধি' অর্থাৎ বুদ্ধিরূপী অজ্ঞানতার জড়-জাগতিক অভিব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়। এটি আবার জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অব্যক্ত স্তররূপে অভিব্যক্ত হয়। জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত তিনটি গুণকে বলা হয় 'প্রধান'।

যদি কেউ এই চব্বিশটি তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে চান, তা হলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে *সাংখ্য-দর্শন* অধ্যয়ন করা কর্তব্য। *ভগবদ্গীতাতে* কেবল তার সারাংশ উল্লেখ করা হয়েছে।

দেহ হচ্ছে এই সব কয়টি উপাদানের অভিব্যক্তি এবং দেহের পরিবর্তন হয়। দেহের এই পরিবর্তন ছয় রকমের—দেহের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, স্থিতি হয়, বংশ বৃদ্ধি হয়, তারপর তার ক্ষয় হয় এবং অবশেষে তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই ক্ষেত্র হচ্ছে অস্থায়ী জড় বস্তু, তবে ক্ষেত্রের মালিক *ক্ষেত্রজ্ঞ* হচ্ছেন ভিন্ন।

শ্লোক ৮-১২

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥

অমানিত্বম্—মানশূন্যতা; **অদম্ভিত্বম্**—দম্ভহীনতা; **অহিংসা**—অহিংসা; **ক্ষান্তিঃ**—সহিষ্ণুতা; **আর্জবম্**—সরলতা; **আচার্যোপাসনম্**—সদ্গুরুর সেবা; **শৌচম্**—শৌচ; **স্থৈর্যম্**—স্থৈর্য; **আত্মবিনিগ্রহঃ**—আত্মসংযম; **ইন্দ্রিয়ার্থেষু**—ইন্দ্রিয়-বিষয়ে; **বৈরাগ্যম্**—বিরক্তি; **অনহঙ্কারঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **জন্ম**—জন্ম; **মৃত্যু**—মৃত্যু; **জরা**—বার্ধক্য; **ব্যাধি**—ব্যাধি; **দুঃখ**—দুঃখের; **দোষ**—দোষ; **অনুদর্শনম্**—দর্শন; **অসক্তিঃ**—আসক্তি-রহিত; **অনভিষ্বঙ্গঃ**—অভিনিবেশ রহিত; **পুত্র**—পুত্র; **দার**—পত্নী; **গৃহাদিষু**—গৃহ আদিতে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **চ**—ও; **সমচিত্তত্বম্**—সম-ভাবাপন্ন; **ইষ্ট**—বাঞ্ছিত; **অনিষ্ট**—অবাঞ্ছিত; **উপপত্তিষু**—লাভ করে; **ময়ি**—আমাতে; **চ**—ও; **অনন্যযোগেন**—অনন্য নিষ্ঠা সহকারে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **অব্যভিচারিণী**—অপ্রতিহতা; **বিবিক্ত**—নির্জন; **দেশ**—স্থান; **সেবিত্বম্**—প্রিয়তা; **অরতিঃ**—অরুচি; **জনসংসদি**—জনাকীর্ণ স্থানে; **অধ্যাত্ম**—অধ্যাত্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞানে; **নিত্যত্বম্**—নিত্যতা; **তত্ত্বজ্ঞান**—তত্ত্বজ্ঞানের; **অর্থ**—প্রয়োজন; **দর্শনম্**—অনুসন্ধান; **এতৎ**—এই সমস্ত; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ইতি**—এভাবে; **প্রোক্তম্**—কথিত হয়; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান; **যৎ**—যা; **অতঃ**—এর থেকে; **অন্যথা**—বিপরীত।

গীতার গান

অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, অহিংসা যে ক্ষান্তি ।
সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য, শান্তি ॥
আত্মার নিগ্রহ যাহা ইন্দ্রিয় বিষয়ে ।
বৈরাগ্য নিরহঙ্কার সকল আশয়ে ॥
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি দুঃখের দর্শন ।
অনাসক্তি স্ত্রী পুত্রেতে গৃহের প্রাঙ্গণ ॥

উদাসীন পরিবারে সুখেতে দুঃখেতে ।
নিত্য সমচিত্ত ইষ্ট অনিষ্ট মধ্যেতে ॥
আমাতে অনন্যভক্তি অব্যভিচারিণী ।
নির্জন স্থানেতে বাস গ্রাম্য নিবারণী ॥
অধ্যাত্ম জ্ঞানের করে নিত্যত্ব স্বীকার ।
তত্ত্বজ্ঞান লাগি করে দর্শন বিচার ॥
সেই সে জ্ঞানের চর্চা বিকারে নাশ ।
অজ্ঞানতমের নাম অন্যথা প্রকাশ ॥

অনুবাদ

অমানিত্ব, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্‌গুরুর সেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ আদির দোষ দর্শন, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্বদা সমচিত্তত্ব, আমার প্রতি অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থান প্রিয়তা, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান—এই সমস্ত জ্ঞান বলে কথিত হয় এবং এর বিপরীত যা কিছু তা সবই অজ্ঞান।

তাৎপর্য

যথার্থ জ্ঞান লাভের এই প্রক্রিয়াকে অনেক সময় অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভ্রান্তিবশত ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়া বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান আহরণের পন্থা। এই পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই কেবল পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এটি চব্বিশটি মৌলিক তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া নয়, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে ঐ উপাদানগুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া। চব্বিশটি তত্ত্বের দ্বারা গঠিত একটি পিঞ্জরের মতো দেহের মধ্যে দেহধারী আত্মা আবদ্ধ হয়ে আছে এবং এখানে বর্ণিত জ্ঞান অর্জনের পন্থাই হচ্ছে এর থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়। জ্ঞান লাভের যে সমস্ত পন্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি একাদশ শ্লোকের প্রথম ছত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। *ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী*—এই জ্ঞান পরিণামে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। সুতরাং কেউ যদি ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ না করে, অথবা লাভ করার

প্রয়াসী না হয়, তা হলে অন্য উনিশটি গুণের কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু কেউ যদি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে এই উনিশটি গুণ তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই বিকশিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) বলা হয়েছে, *যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।* যিনি ভগবৎ-সেবার পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, তাঁর মধ্যে জ্ঞানের সকল প্রকার সদ্‌গুণই বিকশিত হয়ে ওঠে। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সেবা করার যে নির্দেশ অষ্টম শ্লোকে দেওয়া হয়েছে, তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি যাঁরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের পক্ষেও এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সদ্‌গুরুর আনুগত্য স্বীকার করার মাধ্যমে পারমার্থিক জীবনের শুরু হয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে এখানে বলছেন যে, জ্ঞানের এই পন্থা হচ্ছে যথার্থ পন্থা। এ ছাড়া যদি অন্য আর কোন পন্থা অনুমান করা হয়, তা হলে তা নিছক বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে জ্ঞানের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে, তার বিষয়গুলি নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। *অমানিত্বের* অর্থ হচ্ছে যে, অপরের কাছ থেকে সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে আত্মতৃপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন না হওয়া। বৈষয়িক জীবনে আমরা অপরের কাছ থেকে মান-সম্মান পাওয়ার জন্য খুব আগ্রহী হই, কিন্তু যিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাঁর জড় শরীরটি তাঁর স্বরূপ নয়, তাঁর কাছে জড় দেহগত সম্মান ও অসম্মান উভয়ই নিরর্থক। জড়-জাগতিক এই মোহের প্রতি লালায়িত হওয়া উচিত নয়। মানুষ তার ধর্মের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে অত্যন্ত আগ্রহী এবং পরিণামে অনেক সময় দেখা যায় যে, ধর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সে কোন দলভুক্ত হয়ে পড়ে এবং যথাযথভাবে ধর্মের নীতিগুলিকে অনুসরণ না করে, সে নিজেকে ধর্মের কর্ণধার বলে প্রচার করতে থাকে। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভে কে কতটা উন্নতি সাধন করছে তা এই সমস্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে বিচার করা উচিত।

অহিংসা কথাটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে হত্যা না করা বা দেহ নষ্ট না করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অহিংসার অর্থ হচ্ছে অপরকে ক্লেশ না দেওয়া। অজ্ঞানতার প্রভাবে সাধারণ মানুষ জড়-জাগতিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তাই তারা নিরন্তর সংসার-দুঃখ ভোগ করছে। সুতরাং মানুষকে যদি পারমার্থিক জ্ঞানের স্তরে উন্নীত না করা হয়, তা হলে হিংসার আচরণ করা হয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে যথাসাধ্য তত্ত্বজ্ঞান দান করা, যার ফলে তারা দিব্যজ্ঞান লাভ করে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। সেটিই হচ্ছে অহিংসা।

ক্ষান্তি বা সহনশীলতার অর্থ হচ্ছে অপরের কাছ থেকে অসম্মান অথবা অপমান সহ্য করার ক্ষমতা। কেউ যখন পারমার্থিক উন্নতি সাধনে ব্রতী হন, তখন অনেকেই তাঁকে নানাভাবে অপমান বা অসম্মান করে থাকে। সেটিই স্বাভাবিক, কারণ জড় জগতের ধরনটাই এমন। এমন কি প্রহ্লাদের মতো একটি শিশু, যিনি পাঁচ বছর বয়সে পরমার্থ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন, তখন তাঁর বাবাই এই ভক্তির পথে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং নানাভাবে তাঁর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল, এমন কি নানাভাবে তাঁকে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ তার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। সুতরাং, পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে হলে নানা রকম প্রতিবন্ধক আসতে পারে, কিন্তু সেগুলি সহ্য করতে হবে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সরলতার অর্থ হচ্ছে কূটনীতি না করে নিষ্কপট হওয়া, যাতে শত্রুর কাছেও যথার্থ সত্য খুলে বলা যায়। সেই জন্য গুরু গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ না করলে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হতে হয় এবং সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করতে হয়, যাতে তাঁর প্রসন্নতা সাধনের মাধ্যমে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করা যায়। সদ্‌গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তিনি যদি তাঁর শিষ্যকে কৃপা করেন, তা হলে তাঁর শিষ্য সমস্ত শাস্ত্রবিধির অনুশীলন না করেই তৎক্ষণাৎ প্রভূত উন্নতি লাভ করতে পারেন। অথবা, যিনি নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবের সেবা করেছেন, পারমার্থিক বিধি-নিষেধগুলি তাঁর কাছে অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে।

পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য *শৌচ* অত্যন্ত প্রয়োজন। শৌচ দুই রকমের—বাইরের ও অন্তরের। বাহিরের শুচিতা হচ্ছে স্নান করা। কিন্তু অন্তরের শুচিতার জন্য সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে এবং **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া পূর্বকৃত কর্মের ফলে সঞ্চিত চিত্তের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে দেয়।

স্থৈর্য অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে দৃঢ় সংকল্প হওয়া। এই ধরনের দৃঢ় সংকল্প ছাড়া যথার্থ উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। *আত্মবিনিগ্রহ* মানে হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতির পথে যা ক্ষতিকর তা গ্রহণ না করা। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে যা বিরোধী তা বর্জন করে, এগুলি গ্রহণ করার অভ্যাস করা উচিত। সেটিই হচ্ছে যথার্থ বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়গুলি এত প্রবল যে, তারা সর্বদাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত নিরর্থক দাবিগুলি বরদাস্ত

করা উচিত নয়, কারণ সেগুলি অনাবশ্যক। ইন্দ্রিয়গুলিকে কেবল ততটুকুই সুখ দেওয়া উচিত যার ফলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে এবং পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয় হচ্ছে জিহ্বা। কেউ যদি জিহ্বাকে জয় করতে পারে, তা হলে অন্য ইন্দ্রিয়গুলি জয় করার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। জিহ্বার কাজই হচ্ছে স্বাদ গ্রহণ করা এবং স্পন্দন করা। তাই, তাকে দমন করবার বিধি হচ্ছে সর্বদাই কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুকে জয় করার পন্থা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর রূপ ছাড়া তাকে আর কিছু দেখতে না দেওয়া। তার ফলে দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু সংযত হয়। তেমনই, কান দুটিকে সর্বদা কৃষ্ণকথা শ্রবণে এবং নাককে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণে নিযুক্ত রাখতে হবে। এটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের পন্থা এবং এখানে বুঝতে পারা যায় যে, *ভগবদ্গীতা* কেবল ভক্তিযোগের বিজ্ঞানকথা ঘোষণা করছে। ভক্তি হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। *ভগবদ্গীতার* কিছু নির্বোধ ভাষ্যকারেরা *ভগবদ্গীতার* ভ্রান্ত ভাষ্য রচনা করে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতায়* ভগবদ্ভক্তি ছাড়া আর কোন বিষয়েরই উল্লেখ করা হয়নি।

অহঙ্কারের অর্থ হচ্ছে জড় শরীরটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা। কেউ যখন বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি তাঁর জড় শরীর নন, তাঁর স্বরূপ হচ্ছে তাঁর আত্মা, সেটিই হচ্ছে যথার্থ অহঙ্কার। অহঙ্কার থাকেই। মিথ্যা অহঙ্কার বর্জনীয়, কিন্তু যথার্থ অহঙ্কার বর্জনীয় নয়। বৈদিক শাস্ত্রে (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* (১/৪/১০) বলা হয়েছে, অহং *ব্রহ্মাস্মি*—আমি ব্রহ্ম, আমি আত্মা। এই 'আমি' হচ্ছে আত্মানুভূতি। এই আত্মানুভূতি আত্ম-উপলব্ধির মুক্ত অবস্থাতেও বর্তমান থাকে। 'আমি' সম্বন্ধে এই অনুভূতিকে বলা হয় অহঙ্কার, কিন্তু এই আত্মানুভূতি যখন বাস্তব বস্তুতে বা আত্মাতে প্রয়োগ হয়, তখন সেটিই হচ্ছে যথার্থ অহঙ্কার। অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা বলেন, আমাদের অহঙ্কার বর্জন করা উচিত। কিন্তু আমাদের এই অহঙ্কার আমরা ত্যাগ করতে পারি না, কারণ অহঙ্কার হচ্ছে আমাদের পরিচয়। তবে অবশ্যই জড় দেহ নিয়ে যে পরিচয়, তা পরিত্যাগ করতেই হবে।

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সমন্বিত যে দুঃখ-দুর্দশা, সেই কথা বুঝতে হবে। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে জন্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* জন্মের পূর্বে মাতৃজঠরে শিশুর অবস্থান যে কত দুঃখময়, তা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জন্ম যে কত ক্লেশদায়ক, তা পূর্ণরূপে জানতে হবে। মাতৃজঠরে কি পরিমাণ দুঃখ-দুর্দশা আমরা ভোগ করেছি, তা ভুলে যাওয়ার ফলেই আমরা জন্ম-মৃত্যুর

আবর্ত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন চেষ্টা করি না। তেমনই, মৃত্যুর সময়ে নানা রকম যন্ত্রণাভোগ করতে হয় এবং প্রামাণ্য শাস্ত্রাদিতে তারও বর্ণনা আছে। সেগুলি আলোচনা করা উচিত। আর জরা ও ব্যাধি যে কত যন্ত্রণাদায়ক, সেই সম্বন্ধে প্রতিটি জীবেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কেউই ব্যাধিগ্রস্ত হতে চায় না এবং কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না। কিন্তু তবুও এগুলির হাত থেকে নিস্তার নেই। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সমন্বিত জড় জীবন যে দুঃখময় তা বুঝতে না পারলে পারমার্থিক উন্নতি সাধনে প্রেরণা পাওয়া যায় না।

স্ত্রী, পুত্র, গৃহের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদের প্রতি কোন অনুভূতি থাকবে না। তাদের প্রতি স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যদি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের অনুকূল না হয়, তা হলে তাদের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। গৃহকে আনন্দময় করে তোলবার শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন। কেউ যদি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তা হলে তিনি অনায়াসে তাঁর গৃহকে অতি মনোরম সুখের আলয়ে পরিণত করতে পারেন। কারণ, কৃষ্ণভক্তির এই পন্থা অতি সরল। কেবলমাত্র প্রয়োজন **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা, কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা, *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্র আলোচনা করা এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অর্চনা করা। এই চারটি বিধি অনুশীলন করলে অনায়াসে সুখী হওয়া যায়। পরিবারের প্রতিটি লোককে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত। পরিবারের সকলের কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় একত্রে বসে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই চারটি নিয়ম পালন করার মাধ্যমে কেউ যদি তাঁর পরিবারকে কৃষ্ণভাবনাময় করে গড়ে তুলতে পারেন, তা হলে তাঁকে গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে হয় না। কিন্তু তা যদি তাঁর পারমার্থিক উন্নতির অনুকূল না হয়, উপযোগী না হয়, তা হলে সেই গৃহ ত্যাগ করা উচিত। কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য অথবা কৃষ্ণসেবার জন্য সব কিছু উৎসর্গ করা উচিত, ঠিক যেমন অর্জুন করেছিলেন। অর্জুন তাঁর আত্মীয় পরিজনদের হত্যা করতে নারাজ ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সেই আত্মীয় পরিজনেরা তাঁর কৃষ্ণভক্তির প্রতিবন্ধক, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ শিরোধার্য করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং তাদের হত্যা করলেন। সর্ব অবস্থাতেই মানুষকে সাংসারিক জীবনের সুখ ও দুঃখ থেকে অনাসক্ত থাকা উচিত। কারণ, এই জগতে কেউই সম্পূর্ণভাবে সুখী হতে পারে না, তেমনই আবার কেউ সম্পূর্ণভাবে দুঃখীও হতে পারে না।

সুখ ও দুঃখ হচ্ছে জড় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। *ভগবদ্গীতার* উপদেশ অনুসারে এগুলিকে সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত। সুখ ও দুঃখ আসে যায় এবং তাদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সুতরাং, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া, তা হলে এই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই প্রতি সম-ভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। সাধারণত, যখন আমরা আমাদের কাম্য বস্তু অর্জন করি, তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং যখন আমরা অবাঞ্ছিত কোন কিছু প্রাপ্ত হই, তখন আমরা দুঃখিত হই। কিন্তু আমরা যদি যথাযথভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত থাকি, তা হলে এই বিষয়গুলি আমাদের বিচলিত করতে পারবে না। এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে আমাদেরকে ভক্তিযোগে নিরন্তর ভগবানের সেবা করতে হবে। অবিচলিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার অর্থ হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তির অনুশীলন করা, যা নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই পদ্ধতি মেনে চলা উচিত।

কেউ যখন পারমার্থিক জীবন লাভ করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই বৈষয়িক লোকেদের সঙ্গে আর মেলামেশা করতে চাইবেন না। অসাধুসঙ্গ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অসাধুসঙ্গ বর্জন করে নির্জন বাসের প্রতি কতটা অনুরাগ এসেছে, তার মাধ্যমে নিজেকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। খেলাধুলা, সিনেমা, সামাজিক অনুষ্ঠান আদিতে ভক্তের স্বাভাবিকভাবেই কোন রুচি থাকে না। কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে, এগুলি কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র। অনেক গবেষক ও দার্শনিক আছেন, যাঁরা যৌন বিজ্ঞান অথবা সেই ধরনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* উপদেশ অনুসারে সেই সমস্ত গবেষণা ও দার্শনিক অনুমানগুলির কোন মূল্য নেই। সেগুলি এক রকম নিরর্থক প্রয়াস মাত্র। *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে, তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা করা উচিত। নিজেকে জানার জন্য গবেষণা করা উচিত। সেই নির্দেশই এখানে দেওয়া হয়েছে।

আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভক্তিযোগের পন্থা বিশেষভাবে বাস্তব-সম্মত। ভক্তিযোগ বলতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক বুঝতে হবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা কখনই এক হতে পারে না—অন্তত ভক্তিমার্গে। পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার এই সেবা নিত্য। সেই কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং ভক্তিযোগ নিত্য। এই তত্ত্বজ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন হওয়া উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) এই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।* "যাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা জানেন যে, অদ্বয় পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিনরূপে উপলব্ধ হন।" পরম-তত্ত্বের

চরম উপলব্ধি হচ্ছেন ভগবান। সুতরাং, সেই চরম স্তরে উন্নীত হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা উচিত এবং ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেটিই হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা।

অমানিত্ব থেকে শুরু করে পরমতত্ত্ব পরম পুরুষ ভগবানকে উপলব্ধি করার স্তর পর্যন্ত এই পন্থাটি একটি সিঁড়ির মতো, যেন একতলা থেকে শুরু হয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন এই সিঁড়িতে বহু লোক আছেন, যাঁরা একতলা, দুতলা অথবা তিনতলা আদিতে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ তলায় পৌঁছানো যাচ্ছে, যা হচ্ছে কৃষ্ণ-উপলব্ধি, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা জ্ঞানের নিম্নপর্যায়েই অবস্থিত। কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে চায়, তা হলে তার সে আশা ব্যর্থ হবে। এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, অমানিত্ব ব্যতিরেকে উপলব্ধি সত্যিই সম্ভব নয়। নিজেকে ভগবান বলে মনে করা মিথ্যা অহঙ্কারের চরম প্রকাশ। প্রকৃতির কঠোর শাসনে জীব যদিও প্রতিনিয়তই পদদলিত হচ্ছে, তবুও অজ্ঞানতার প্রভাবে সে মনে করছে, "আমি ভগবান।" সেই জন্যই জ্ঞানের সূচনা হচ্ছে *অমানিত্ব*। সকলেরই উচিত নম্র হওয়া এবং সর্ব অবস্থাতেই নিজেকে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করা। পরমেশ্বর ভগবানের আধিপত্য স্বীকার না করে বিদ্রোহী হওয়ার ফলেই আমরা জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হয়ে পড়েছি। এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করে, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত।

শ্লোক ১৩

জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

জ্ঞেয়ম্—জ্ঞাতব্য বিষয়; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি এখন বলব; **যৎ**—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **অমৃতম্**—অমৃত; **অশ্নুতে**—লাভ হয়; **অনাদি**—আদিহীন; **মৎপরম্**—আমার আশ্রিত; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **ন**—নয়; **সৎ**—কারণ; **তৎ**—তা; **ন**—নয়; **অসৎ**—কার্য; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

জ্ঞানের জ্ঞাতব্য যাহা তাহা বলি শুন ।
জানিতে সে তত্ত্ব হবে অমৃতের পান ॥

সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আমার আশ্রিত ।
অনাদি সে সৎ আর অসৎ অতীত ॥

অনুবাদ

আমি এখন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলব, যা জেনে অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি এবং আমার আশ্রিত। তাকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তা কার্য ও কারণের অতীত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞকে জানবার পন্থাও ব্যাখ্যা করেছেন। এখন এখানে তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন। আত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জানবার মাধ্যমেই জীবনে অমৃতের আস্বাদন করা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জীব নিত্য। এখানেও সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। জীবের জন্ম-তারিখ খুঁজে পাওয়া যায় না। পরমেশ্বর ভগবানের থেকে কিভাবে জীবাত্মার প্রকাশ হল, তারও কোন ইতিহাস নেই। তাই তা অনাদি। বৈদিক শাস্ত্রে তার সত্যতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ* (*কঠ উপনিষদ* ১/২/১৮)। দেহের জ্ঞাতার কখনও জন্ম হয় না, কখনও মৃত্যুও হয় না এবং সে পূর্ণ জ্ঞানময়।

পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধেও বৈদিক শাস্ত্রে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/১৬) বলা হয়েছে, *প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ*—প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের নিয়ন্তা। স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন*। জীব নিত্যকাল ধরে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করে চলেছে। সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর উপদেশাবলীতে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই এই শ্লোকে যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হয়েছে, তা জীবাত্মা সম্বন্ধীয়। জীবাত্মাকে যখন ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তা হচ্ছে *বিজ্ঞান-ব্রহ্ম*, যার বিপরীত হচ্ছে *আনন্দ-ব্রহ্ম*। *আনন্দ-ব্রহ্ম* হচ্ছেন পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১৪

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

সর্বতঃ—সর্বত্র; **পাণি**—হস্ত; **পাদম্**—পদ; **তৎ**—তা; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **অক্ষি**—চক্ষু; **শিরঃ**—মস্তক; **মুখম্**—মুখ; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **শ্রুতিমৎ**—কর্ণবিশিষ্ট; **লোকে**—জগতে; **সর্বম্**—সব কিছু; **আবৃত্য**—পরিব্যাপ্ত করে; **তিষ্ঠতি**—স্থিত আছেন।

গীতার গান

সর্বস্থানে হস্তপদ নহে নিরাকার ।
সর্বস্থানে চক্ষু শির কত মুখ তার ॥
সর্বত্র শ্রবণ সর্ব আবরণ স্থান ।
তিনি ছাড়া ত্রিভুবনে নাহি কিছু আন ॥

অনুবাদ

তাঁর হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্বত্রই এবং তিনি সর্বত্রই কর্ণযুক্ত। জগতে সব কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে তিনি বিরাজমান।

তাৎপর্য

সূর্য যেমন অনন্ত কিরণ বিকিরণ করে বিরাজমান, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানও তেমনই তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপে বিরাজমান। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবই তাঁকে আশ্রয় করে আছে। তাঁর সেই সর্বব্যাপী রূপের মধ্যে অসংখ্য মস্তক, পদ, হস্ত, চক্ষু এবং অসংখ্য জীবাত্মা রয়েছে। সবই পরমাত্মার মধ্যে ও উপরে বিরাজ করছে। তাই পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু জীবাত্মা কখনও বলতে পারে না যে, তার হাত, পা, চোখ আদি সর্বব্যাপ্ত। তা কখনও সম্ভব নয়। যদি সে তা মনে করেও, তার অজ্ঞানতার ফলে সে এখন বুঝতে পারছে না যে, তার হস্ত পদ সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু যখন সে যথার্থ জ্ঞান লাভ করবে, তখন অনুভব করতে পারবে যে, তার এই চিন্তাধারা পরস্পর-বিরোধী। তার অর্থ হচ্ছে যে, জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে জীব পরম সত্তা নয়। পরমেশ্বর জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান সীমা ছাড়িয়ে তাঁর হাত বর্ধিত করতে পারেন, কিন্তু জীবাত্মা তা পারে না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলছেন যে, যদি কেউ তাঁকে ফুল, ফল অথবা জল নিবেদন করেন, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন। ভগবান যদি দূরে থাকেন, তা হলে কি করে তিনি তা গ্রহণ করেন? সেটিই হচ্ছে ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা—এমন কি যদিও তিনি এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে তাঁর নিজ ধামে রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর হস্ত প্রসারিত করে তাঁর উদ্দেশ্যে

নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারেন। এমনই হচ্ছে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৭) বলা হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—যদিও তিনি সর্বদাই তাঁর চিন্ময় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত লীলা বিলাস করছেন, তবুও তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। জীবাত্মা কখনই দাবি করতে পারে না যে, সে সর্বত্রই বিরাজমান। তাই এই শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান জীবাত্মা নন।

শ্লোক ১৫

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

সর্ব—সমস্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **গুণ**—গুণের; **আভাসম্**—প্রকাশক; **সর্ব**—সমস্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **বিবর্জিতম্**—রহিত; **অসক্তম্**—আসক্তি রহিত; **সর্বভৃৎ**—সকলের পালক; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **নির্গুণম্**—জড় গুণরহিত; **গুণভোক্তৃ**—সমস্ত গুণের ঈশ্বর; **চ**—ও।

গীতার গান

তাঁহা হতে ইন্দ্রিয়াদি হয়েছে প্রকাশ ।
জড়েন্দ্রিয় নাহি তাঁর সর্বগুণাভাস ॥
অনাসক্ত সর্বভৃৎ তিনি সে নির্গুণ ।
সকল গুণের ভোক্তা তিনি চিরন্তন ॥

অনুবাদ

সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, তবুও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। যদিও তিনি সকলের পালক, তবুও তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত, তবুও তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আধার, কিন্তু তা বলে তাদের মতো জড় ইন্দ্রিয় তাঁর নেই। প্রকৃতপক্ষে, জীবাত্মারও চিন্ময় ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তারা জড় গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই, জড়ের মাধ্যমে চেতন

ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ প্রকাশ হতে দেখা যায়। পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি এই রকম আচ্ছাদিত নয়। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রাকৃত এবং তাই তাদের বলা হয় নির্গুণ। গুণ হচ্ছে প্রকৃতির বৃত্তি, কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি জড় আবরণ থেকে মুক্ত। আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক আমাদের মতো নয়। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়জাত কর্মের উৎস যদিও তিনি, কিন্তু তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি দিব্য ও কলুষমুক্ত। সেই কথা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/১৯) *অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা*— এই শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের জড়-জাগতিক কলুষযুক্ত কোন হাত নেই, কিন্তু তবুও তাঁর হাত আছে এবং সেই হাত দিয়ে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। ভগবানের জড় চক্ষু নেই, কিন্তু তাঁর চক্ষু আছে—তা না হলে তিনি দেখতে পান কি করে? তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সব কিছু দেখতে পান। তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং অতীতে আমরা কি করেছি, এখন আমরা কি করছি এবং আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে, তা সবই তিনি জানেন। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে— তিনি সব কিছু জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভগবানের আমাদের মতো পা নেই, কিন্তু তিনি সর্বত্র মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারেন, কারণ তাঁর পা অপ্রাকৃত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান নির্বিশেষ নন, নিরাকার নন, ব্যক্তিত্বহীন নন। তাঁর চোখ আছে, পা আছে, হাত আছে এবং সব কিছুই আছে। যেহেতু আমরা ভগবানের বিভিন্নাংশ, তাই আমরাও এই সমস্ত অঙ্গগুলি অর্জন করেছি। কিন্তু তাঁর হাত, পা, চোখ ও ইন্দ্রিয়গুলি কখনই জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হয় না।

ভগবদ্গীতায় আরও বলা হয়েছে যে, যখন পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন। তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হন না, কারণ তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর। বৈদিক শাস্ত্রে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর সমগ্র সত্তা চিন্ময়। তাঁর রূপ নিত্য—তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্যময়। তিনি হচ্ছেন সমস্ত সম্পদের মালিক এবং সমস্ত শক্তির অধীশ্বর। তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। এগুলি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কয়েকটি লক্ষণ। তিনি সমস্ত জীবের পালনকর্তা এবং তাদের সমস্ত কর্মের সাক্ষী। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জড়াতীত। আমরা যদিও তাঁর মস্তক, মুখমণ্ডল, হস্ত অথবা পদ দেখতে পাই না, তবুও তাঁর এগুলি আছে

এবং আমরা যখন চিন্ময় স্তরে উন্নীত হই, তখন আমরা ভগবানের রূপ দর্শন করতে পারি। জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কলুষিত হয়ে পড়েছে, তাই আমরা তাঁর রূপ দেখতে পাই না। সেই জন্য নির্বিশেষবাদীরা, যারা এখনও জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রয়েছে, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ১৬

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

বহিঃ—বাইরে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **চ**—ও; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **অচরম্**—স্থাবর; **চরম্**—জঙ্গম; **এব**—ও; **চ**—এবং; **সূক্ষ্মত্বাৎ**—সূক্ষ্মতা হেতু; **তৎ**—তা; **অবিজ্ঞেয়ম্**—অবিজ্ঞেয়; **দূরস্থম্**—দূরে অবস্থিত; **চ**—ও; **অন্তিকে**—নিকটে; **চ**—এবং; **তৎ**—তা।

গীতার গান

সকল ভূতের তিনি অন্তরে বাহিরে ।
তাঁহা হতে হয় সব চর বা অচর ॥
অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাই অবিজ্ঞেয় ।
যুগপৎ বহু দূরে নিকটেতেও হয় ॥

অনুবাদ

সেই পরমতত্ত্ব সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান। তাঁর থেকেই সমস্ত চরাচর; অত্যন্ত সূক্ষ্মতা হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। যদিও তিনি বহু দূরে অবস্থিত, কিন্তু তবুও তিনি সকলের অত্যন্ত নিকটে।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রতিটি জীবের অন্তরে ও বাইরে বিরাজ করছেন। তিনি চিন্ময় ও জড় উভয় জগতে রয়েছেন। যদিও তিনি অনেক অনেক দূরে, তবুও তিনি আমাদের অতি নিকটেই। এগুলি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা। *আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ* (*কঠ উপনিষদ* ১/২/২১)। আর যেহেতু তিনি সর্বদাই চিদানন্দময়, তাই আমরা

বুঝতে পারি না কিভাবে তিনি তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য উপভোগ করছেন। এই জড় ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পাই না বা বুঝতে পারি না। তাই বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আমাদের জড় মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু ভক্তি সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় নির্মল হয়েছে, তিনি নিরন্তর তাঁকে দর্শন করতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যে ভক্ত প্রেমভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তিনি নিরন্তর তাঁকে দর্শন করতে পারেন। আর *ভগবদ্গীতাতে* (১১/৫৪) তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল তাঁকে দর্শন করা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়। *ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ।*

শ্লোক ১৭

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

অবিভক্তম্—অবিভক্ত; **চ**—ও; **ভূতেষু**—সর্বভূতে; **বিভক্তম্**—বিভক্ত; **ইব**—মতো; **চ**—ও; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **ভূতভর্তৃ**—সর্বভূতের পালক; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **জ্ঞেয়ম্**—জানবে; **গ্রসিষ্ণু**—গ্রাসকারী; **প্রভবিষ্ণু**—প্রভুত্বকারী; **চ**—ও।

গীতার গান

অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের মত ।
অখণ্ড সমষ্টি তিনি ব্যষ্টিরূপে স্থিত ॥
সর্বভূত ভর্তা তিনি সব জন্মদাতা ।
তিনিই সবার পুনঃ সংহারের কর্তা ॥

অনুবাদ

পরমাত্মাকে যদিও সমস্ত ভূতে বিভক্তরূপে বোধ হয়, কিন্তু তিনি অবিভক্ত। যদিও তিনি সর্বভূতের পালক, তবুও তাঁকে সংহার-কর্তা ও সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে।

তাৎপর্য

পরমাত্মা রূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তা হলে তার অর্থ কি তিনি বিভক্ত হয়েছেন? না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এই প্রসঙ্গে

সূর্যের উদাহরণ দেওয়া হয়—মধ্যাহ্নকালীন সূর্য তার কক্ষপথে অবস্থিত থাকে। কিন্তু কেউ যদি পাঁচ হাজার মাইল পরিধি জুড়ে সকলকে জিজ্ঞেস করেন, "সূর্য কোথায়?" তা হলে সকলেই বলবে যে, তার মাথার উপর জ্বল জ্বল করছে। বৈদিক শাস্ত্রে এই উদাহরণটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, যদিও তিনি অবিভক্ত, তবুও মনে হয় যেন তিনি বিভক্তের মতো। বৈদিক শাস্ত্রে এই রকমও বলা হয়েছে যে, এক বিষ্ণু তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সর্বত্রই বিরাজমান, ঠিক যেমন সূর্য অনেক জায়গায় অনেকের কাছে প্রতিভাত হয়। আর পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের পালনকর্তা, প্রলয়কালে তিনি সব কিছু গ্রাস করেন। সেই কথা একাদশ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যখন ভগবান বলেছেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমবেত সমস্ত যোদ্ধাদের গ্রাস করবার জন্য তিনি এসেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, কালরূপেও তিনি গ্রাস করেন। তিনি বিনাশকর্তা—সকলকে তিনি ধ্বংস করেন। সৃষ্টির সময় তিনি সব কিছুই তাদের আদি অবস্থা থেকে বিকাশ সাধন করেন এবং বিনাশের সময় তিনি তাদের গ্রাস করেন। বৈদিক শ্লোকে সেই সত্যকে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত জীবের উৎস এবং আশ্রয়। সৃষ্টির পরে সব কিছুই তাঁর সর্ব শক্তিমত্তাকে আশ্রয় করে স্থিত হয় এবং বিনাশের পরে সব কিছুই আবার তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিতে তাঁর কাছে ফিরে যায়। সেই সম্বন্ধে *বেদে* বলা হয়েছে—*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব*। (*তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ৩/১)।

শ্লোক ১৮

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

জ্যোতিষাম্—সমস্ত জ্যোতিষ্কের; **অপি**—ও; **তৎ**—তা; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পরম্**—অতীত; **উচ্যতে**—বলা হয়; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞেয়ম্**—জ্ঞেয়; **জ্ঞানগম্যম্**—জ্ঞানগম্য; **হৃদি**—হৃদয়ে; **সর্বস্য**—সকলের; **বিষ্ঠিতম্**—অবস্থিত।

গীতার গান

সমস্ত জ্যোতির তিনি পরম আধার ।
চিন্ময় তাঁহার জ্যোতি জড় পর আর ॥

জ্ঞানময় রূপ তাঁর জ্ঞানগম্য জ্ঞেয় ।
সকলের হৃদিমাঝে তিনি অধিষ্ঠেয় ॥

অনুবাদ

তিনি সমস্ত জ্যোতিষ্কের পরম জ্যোতি। তাঁকে সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্ত স্বরূপ বলা হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

তাৎপর্য

পরমাত্মা বা পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি সমস্ত জ্যোতিষ্কের জ্যোতির উৎস। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, চিৎ-জগৎকে আলোকিত করার জন্য সূর্য অথবা চন্দ্রের প্রয়োজন হয় না, কারণ সেই জগৎ পরমেশ্বরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জড়া প্রকৃতিতে সেই ব্রহ্মজ্যোতি বা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা জড়া প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই, এই জড় জগৎকে আলোকিত করবার জন্য সূর্য, চন্দ্র ও বৈদ্যুতিক শক্তি আদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু চিৎ-জগতে তাদের কোন প্রয়োজন হয় না। বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর জ্যোতিচ্ছটায় সব কিছুই উদ্ভাসিত। তাই এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি জড় জগতে অবস্থান করেন না। তিনি অবস্থান করেন চিৎ-জগতে, যা এই জগৎ থেকে অনেক অনেক দূরে চিদাকাশে অবস্থিত। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৩/৮)। তিনি সূর্যের মতো নিত্য জ্যোতির্ময়, কিন্তু তিনি এই তমসাচ্ছন্ন জড় জগৎ থেকে বহু বহু দূরে রয়েছেন।

তাঁর জ্ঞান দিব্য। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ঘনীভূত দিব্যজ্ঞান হচ্ছে ব্রহ্ম। যিনি চিৎ-জগতে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাঁকে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান দিব্যজ্ঞান দান করেন। একটি বৈদিক মন্ত্রে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/১৮) বলা হচ্ছে—*তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে*। কেউ যদি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তা হলে তাকে অবশ্যই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। পরম জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি*। "কেবলমাত্র তাঁকে জানার ফলেই মানুষ জন্ম-মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করতে পারে।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৩/৮)

পরম নিয়ন্তারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। তাঁর হাত, পা সর্বত্রই রয়েছে, কিন্তু জীবাত্মা সম্বন্ধে সেই কথা বলা যায় না। সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ

দুজন—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সেই কথা স্বীকার করতেই হবে। জীবাত্মার হাত, পা কোন নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হাত, পা সর্বত্রই রয়েছে। সেই সম্বন্ধে *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/১৭) বলা হয়েছে—*সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ।* সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান বা পরমাত্মা হচ্ছেন সর্ব জীবের প্রভু, তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। সুতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মা যে সর্ব অবস্থাতেই ভিন্ন, সেই কথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

শ্লোক ১৯

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

ইতি—এভাবেই; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র (দেহ); **তথা**—ও; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞেয়ম্**—জ্ঞেয়; **চ**—ও; **উক্তম্**—বলা হল; **সমাসতঃ**—সংক্ষেপে; **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **এতৎ**—এই সমস্ত; **বিজ্ঞায়**—বিদিত হয়ে; **মদ্ভাবায়**—আমার ভাব; **উপপদ্যতে**—লাভ করেন।

গীতার গান

এই কহিনু তত্ত্ব ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয় ।
বিজ্ঞান তাহার নাম পণ্ডিতের প্রিয় ॥
এ বিজ্ঞান বুঝিয়া সে মোর ভক্ত হয় ।
তত্ত্ব শুদ্ধি জ্ঞান হয় ভক্তির আশ্রয় ॥

অনুবাদ

এভাবেই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্তই কেবল এই সমস্ত বিদিত হয়ে আমার ভাব লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ক্ষেত্র (শরীর), জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করেছেন। এই জ্ঞান হচ্ছে তিনটি বিষয়ের—জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও জ্ঞান আহরণের পন্থা। যুক্তভাবে এদের বলা হয় বিজ্ঞান। ভগবানের অনন্য ভক্ত সরাসরিভাবে শুদ্ধ জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু অন্যদের পক্ষে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অদ্বৈতবাদীরা বলে থাকেন যে, পরম স্তরে এই তিনটি

বিষয় এক হয়ে যায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা সেই কথা স্বীকার করেন না। জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিকাশের অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকে নিজেকে উপলব্ধি করা। আমরা জড় চেতনার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি, কিন্তু আমরা যখনই আমাদের সমস্ত চেতনা কৃষ্ণোন্মুখী করে তুলি এবং শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তখনই আমরা যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হই। পক্ষান্তরে বলা যায়, জ্ঞান হচ্ছে যথার্থভাবে ভগবদ্ভক্তি উপলব্ধি করার প্রারম্ভিক স্তর। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

এখন, আলোচনার সারসংক্ষেপ করতে গেলে, বোঝবার চেষ্টা করতে হবে যে, *মহাভূতানি* থেকে শুরু করে *চেতনা ধৃতিঃ* পর্যন্ত ৬ ও ৭ শ্লোকে জড় উপাদানগুলি ও জীবন-লক্ষণের কয়েকটি অভিব্যক্তির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলির সমন্বয়ে দেহ অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র গঠিত হয়। আর *অমানিত্বম্* থেকে *তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্* পর্যন্ত ৮ থেকে ১২ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপী উভয় ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধি অর্জনের উপযোগী জ্ঞান আহরণের পন্থা বিবৃত হয়েছে। তার পরে *অনাদি মৎপরম্* থেকে আরম্ভ করে *হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্* পর্যন্ত ১৩ থেকে ১৮ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান অর্থাৎ পরমাত্মার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এভাবেই তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে—ক্ষেত্র (শরীর), জ্ঞান উপলব্ধির পন্থা এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এখানে বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে যে, কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরাই এই তিনটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন। সুতরাং, এই সব ভক্তদের কাছে *ভগবদ্গীতা* অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁরাই পরম লক্ষ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভাব লাভ করতে পারেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, আর কেউ নয়, কেবলমাত্র ভক্ত-জনেরাই *ভগবদ্গীতা* বুঝতে পারেন এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২০

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

প্রকৃতিম্—জড়া প্রকৃতি; **পুরুষম্**—পুরুষ; চ—ও; **এব**—অবশ্যই; **বিদ্ধি**—জানবে; **অনাদী**—আদিহীন; **উভৌ**—উভয়; **অপি**—ও; **বিকারান্**—বিকার; **চ**—ও; **গুণান্**—প্রকৃতির তিনটি গুণ; চ—ও; এব—অবশ্যই; **বিদ্ধি**—জানবে; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতি; **সম্ভবান্**—উদ্ভূত।

গীতার গান

প্রকৃতি পুরুষ হয় অনাদি সে সিদ্ধ ।
অনাদি কাল হতে উভয় সংবৃদ্ধ ॥
বিকারাদি গুণ যত প্রাকৃত সম্ভব ।
প্রাকৃত পুরুষ যেই তার অনুভব ॥

অনুবাদ

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি বলে জানবে। তাদের বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে দেহ (কর্মক্ষেত্র) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা, পরমাত্মা উভয়ই) সম্বন্ধে জানা যায়। দেহ হচ্ছে কর্মক্ষেত্র এবং তা জড় উপাদান দিয়ে তৈরি। দেহে আবদ্ধ হয়ে কর্মফল ভোগ করছে যে স্বতন্ত্র আত্মা, সেই হচ্ছে পুরুষ বা জীব। জীবাত্মাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অপর ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন পরমাত্মা। আমাদের অবশ্য জানতে হবে যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই পরম পুরুষ ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ। জীব হচ্ছে তাঁর শক্তিতত্ত্ব এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর স্বাংশ-প্রকাশ।

জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়েই নিত্য, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি থেকেই জড়া প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে এবং জীবও তেমনই। কিন্তু জীব হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তিসম্ভূত। সৃষ্টির পূর্বে তারা উভয়েই ছিল। জড়া প্রকৃতি নিহিত ছিল পরমেশ্বর ভগবান মহাবিষ্ণুর মধ্যে এবং মহাবিষ্ণুর ইচ্ছার ফলে মহৎ-তত্ত্বের মাধ্যমে আবার তার প্রকাশ হয়। তেমনই, জীবেরাও তাঁর মধ্যে আছে, কিন্তু যেহেতু তারা বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, তাই তারা ভগবানের সেবাবিমুখ। তাই, তাদের চিদাকাশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু জড়া প্রকৃতিতে আসার ফলে এই সমস্ত জীবকে আবার জড় জগতে কর্ম করবার সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তারা চিৎ-জগতে প্রবেশ করবার জন্য নিজেদের তৈরি করে নিতে পারে। সেটিই হচ্ছে এই জড় সৃষ্টির রহস্য। প্রকৃতপক্ষে জীব হচ্ছে মূলত ভগবানের চিন্ময় বিভিন্ন অংশ। কিন্তু তার বিদ্রোহীসুলভ প্রকৃতির জন্য সে এই জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তিজাত এই সমস্ত জীব যে কেন এবং কিভাবে এই জড় জগতের সংস্পর্শে এল তা নিয়ে

মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান অবশ্য জানেন কেন এবং কিভাবে তা ঘটল। শাস্ত্রে ভগবান বলেছেন যে, যারা জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট, তারা জীবন ধারণের জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। কিন্তু এই কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটছে তা সবই জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত। জীবের সমস্ত রূপান্তর ও বৈচিত্র্য সবই দৈহিক। আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত জীবই এক রকম।

শ্লোক ২১

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥

কার্য—কার্য; **কারণ**—কারণ; **কর্তৃত্বে**—কর্তৃত্ব বিষয়ে; **হেতুঃ**—হেতু; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতিকে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **পুরুষঃ**—জীবকে; **সুখ**—সুখ; **দুঃখানাম্**—দুঃখের; **ভোক্তৃত্বে**—ভোগ বিষয়ে; **হেতুঃ**—হেতু; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

কার্য বা কারণ হয় প্রকৃতির দান ।
ভোগের কারণ সেই পুরুষেই হন ॥

অনুবাদ

সমস্ত জড়ীয় কার্য ও কারণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, তেমনিই জড়ীয় সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয়ে জীবকে হেতু বলা হয়।

তাৎপর্য

জীবের ভিন্ন ভিন্ন শরীর ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ হয় জড়া প্রকৃতির প্রভাবে। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির জীব আছে এবং তা প্রকৃতিরই সৃষ্টি। জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন শরীরে তখন সে বিভিন্ন রকমের সুখ ও দুঃখ অনুভব করে। তার এই সুখ ও দুঃখের কারণ তার জড় দেহ এবং সেই অনুভূতিগুলি তার নিজের নয়। তার স্বরূপে সে যে নিত্য আনন্দময়, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাই সেটি হচ্ছে তার স্বাভাবিক

অবস্থা। কিন্তু জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে জীব জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। চিৎ-জগতে এই সমস্ত বন্ধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। চিৎ-জগৎ হচ্ছে চিরপবিত্র, কিন্তু জড় জগতে সকলেই তাদের দেহগত ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এই দেহটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের পরিণাম। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার যন্ত্র। তাই দেহ ও যন্ত্রতুল্য ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির দান। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্ম এবং বাসনা অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। জীবের কামনা ও কর্ম অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাকে বিভিন্ন আবাসনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত আবাসনগুলি অর্জনের জন্য জীব নিজেই দায়ী এবং সেই অনুসারে সে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে থাকে। কোন বিশেষ জড় শরীর প্রাপ্ত হলেই জীব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে, কারণ তার দেহটি জড় পদার্থ বলেই জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তাকে পরিচালিত হতে হয়। তখন সেই নিয়ম পরিবর্তন করার কোন শক্তি জীবের থাকে না। যেমন, কোন জীবকে কুকুরের দেহে রাখা হল। যখনই তাকে কুকুরের দেহে রাখা হল, তখন তাকে কুকুরের মতোই আচরণ করতে হবে। অন্য কোন রকম আচরণ সে আর তখন করতে পারে না। অথবা কোন জীবকে যদি শূকরের দেহে রাখা হয়, তখন সে শূকরের মতো বিষ্ঠা খেতে আর সেভাবেই কাজ করতে বাধ্য হয়। তেমনই, কোন জীবকে যদি দেবতা শরীরে রাখা হয়, তখন তাকে তার সেই দেহ অনুসারে আচরণ করতে হয়। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই পরমাত্মা জীবাত্মার সঙ্গে রয়েছেন। *বেদে* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ৩/১/১) তার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—*দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।* পরমেশ্বর ভগবান জীবের প্রতি এতই দয়াশীল যে, তিনি সর্বদাই তার পরম বন্ধুর মতো পরমাত্মা রূপে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

শ্লোক ২২

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

পুরুষঃ—জীব; **প্রকৃতিস্থঃ**—জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে; **হি**—অবশ্যই; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **প্রকৃতিজান্**—প্রকৃতিজাত; **গুণান্**—গুণসমূহ; **কারণম্**—কারণ; **গুণসঙ্গঃ**—প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে; **অস্য**—এই জীবের; **সদসদ্**—ভাল ও মন্দ; **যোনি**—যোনিতে; **জন্মসু**—জন্ম হয়।

গীতার গান

প্রাকৃত হইয়া জীব ভুঞ্জে সেই গুণ ।
প্রকৃতির গুণ সব প্রকৃতির দান ॥
প্রাকৃত গুণের সঙ্গ উচ্চনীচ যোনি ।
সদসদ্ জন্ম হয় অন্য নাহি গণি ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে জীব প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।

তাৎপর্য

জীব কিভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয় তা বোঝার জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পোশাক পরিবর্তন করার মতো জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। জড় অস্তিত্বের প্রতি আসক্তিই হচ্ছে এই পোশাক পরিবর্তনের কারণ। জীব যতক্ষণ এই ভ্রান্ত প্রকৃতির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। জড় জগতের উপর আধিপত্য করার দুরাশার ফলে সে এই রকম অবাঞ্ছিত অবস্থায় পতিত হয়। জাগতিক কামনা-বাসনার প্রভাবে সে কখনও দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করে, কখনও মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং কখনও পশু, পাখি, জলচর প্রাণী, পতঙ্গ, সাধুসন্ত অথবা পোকা-মাকড় অথবা ছাড়পোকা রূপে জন্মগ্রহণ করে। সর্বক্ষণই এই দেহান্তর ঘটে চলেছে আর সর্ব অবস্থাতেই জীব মনে করছে যে, সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিয়ন্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ব অবস্থাতেই সে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন।

কিভাবে জীব বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার বিভিন্ন শরীর প্রাপ্তির কারণ হচ্ছে, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে তার আসঙ্গ। তাই প্রকৃতির তিনটি গুণের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে গুণাতীত অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। তাকেই বলা হয় কৃষ্ণচেতনা। কৃষ্ণচেতনায় অধিষ্ঠিত না হলে তার জড় চেতনা তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে বাধ্য করবে, কারণ অনাদি কাল ধরে তার হৃদয়ে জড় কামনা-বাসনাগুলি রয়ে গেছে। তাই তার এই চেতনার পরিবর্তন করতে হবে। সেই পরিবর্তন সম্ভব হয় কেবল নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে। তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানে

দেওয়া হয়েছে—অর্জুন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করেছেন। জীব যদি এই শ্রবণের পন্থা অবলম্বন করে, তা হলে সে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার চির-পুরাতন বাসনা ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং জড় জগতের উপর তার আধিপত্য করার বাসনা যত কমতে থাকে, সেই অনুপাতে সে দিব্য আনন্দ অনুভব করে থাকে। একটি বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গ লাভে তার জ্ঞান যতই বর্ধিত হয়, ততই সে নিত্য আনন্দময় জীবন আস্বাদন করে থাকে।

শ্লোক ২৩

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

উপদ্রষ্টা—সাক্ষী; **অনুমন্তা**—অনুমোদনকারী; **চ**—ও; **ভর্তা**—পালক; **ভোক্তা**—ভোগকর্তা; **মহেশ্বরঃ**—পরমেশ্বর; **পরমাত্মা**—পরমাত্মা; **ইতি**—এভাবে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **উক্তঃ**—বলা হয়; **দেহে**—শরীরে; **অস্মিন্**—এই; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **পরঃ**—পরম।

গীতার গান

সে জীবের বদ্ধরূপে পরমাত্মা সঙ্গে।
উপদেষ্টা অনুমন্তা হন তিনি রঙ্গে ॥
মহেশ্বর তিনি ভোক্তা পুরুষে পরম।
জীবের উদ্ধার লাগি তিনি সঙ্গে হন ॥

অনুবাদ

এই শরীরে আর একজন পরম পুরুষ রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।

তাৎপর্য

এখানে বলা হচ্ছে যে, পরমাত্মা যিনি সর্বক্ষণ জীবের সঙ্গে থাকেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ। তিনি একজন সাধারণ জীব নন। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞকে এক বলে মনে করেন, তাই তাঁদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার

মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য ভগবান এখানে বলেছেন যে, তিনি পরমাত্মা রূপে প্রতিটি দেহে বিরাজ করেন। জীবাত্মা থেকে তিনি পৃথক; তিনি *পর* অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত। জীবাত্মা কোন বিশেষ ক্ষেত্রের কার্যকলাপ উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু পরমাত্মা সীমিত ভোক্তা বা দেহের কর্মফলের ভোক্তারূপে থাকেন না, তিনি বিরাজ করেন সাক্ষী, পর্যবেক্ষক, অনুমোদনকারী ও পরম ভোক্তারূপে। তাঁর নাম হচ্ছে পরমাত্মা, জীবাত্মা নয়। তিনি প্রপঞ্চাতীত। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে আত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। পরমাত্মার হস্ত ও পদ সর্বত্রই আছে, কিন্তু জীবের তা নেই। যেহেতু পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে থেকে জীবাত্মার ভোগ বাসনাগুলি মঞ্জুর করেন। পরমাত্মার অনুমোদন ব্যতীত জীবাত্মা কিছুই করতে পারে না। জীবাত্মা হচ্ছে ভুক্ত বা প্রতিপালিত এবং ভগবান হচ্ছেন ভোক্তা বা প্রতিপালক। অসংখ্য জীব আছে এবং তিনি তাদের পরম সুহৃদরূপে তাদের অন্তরে বিরাজ করেন।

প্রতিটি স্বতন্ত্র জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সনাতন বিভিন্নাংশ এবং তারা উভয়েই একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু জীবের মধ্যে ভগবানের অনুমোদন প্রত্যাহার করার প্রবণতা রয়েছে এবং সে স্বাধীনভাবে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা করে। যেহেতু তার এই প্রবণতা রয়েছে, তাই তাকে বলা হয় পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। জীব ভগবানের জড়া শক্তি নতুবা তাঁর পরা শক্তিতে অবস্থান করতে পারে। যখন সে জড়া শক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাকে তাঁর পরা প্রকৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তার পরম বন্ধু পরমাত্মা রূপে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ভগবান জীবকে পরা প্রকৃতিতে নিয়ে যাবার জন্য সর্বদাই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু জীব তার যৎপরোনাস্তি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে প্রতিনিয়ত পরম চিন্ময় জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করছে। তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলেই জীব এই জড়া প্রকৃতিতে সংসার-দুঃখ ভোগ করছে। ভগবান তাই সর্বক্ষণ তার অন্তরে থেকে এবং বাইরে থেকে উপদেশ দিচ্ছেন। বাইরে থেকে তিনি *ভগবদ্গীতা* রূপে উপদেশ দিচ্ছেন এবং অন্তর থেকে তিনি জীবের দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করার চেষ্টা করছেন যে, এই জড় জগতে তার কোন কর্ম আনন্দ দানের পক্ষে উপযোগী নয়। তিনি বলছেন, "এই সব কিছু পরিত্যাগ করে আমার প্রতি বিশ্বাসভাজন হও, তা হলেই তুমি সুখী হতে পারবে।" এভাবেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অর্পণ করে সৎ-চিৎ-আনন্দময় জীবনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন।

শ্লোক ২৪

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

যঃ—যিনি; **এবম্**—এভাবেই; **বেত্তি**—জানেন; **পুরুষম্**—পুরুষকে; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতিকে; **চ**—এবং; **গুণৈঃ**—গুণ; **সহ**—সহ; **সর্বথা**—সর্বতোভাবে; **বর্তমানঃ**—বিদ্যমান হয়ে; **অপি**—ও; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **অভিজায়তে**—জন্মগ্রহণ করেন।

গীতার গান

সেই সে জ্ঞানের দ্বারা পুরুষ প্রকৃতি ।
পুরুষের যে প্রাকৃত গুণের স্বীকৃতি ॥
যে বুঝিল বর্তমান হইয়া সর্বথা ।
পুনর্জন্ম নাহি তার নহে সে অন্যথা ॥

অনুবাদ

যিনি এভাবেই পুরুষকে এবং গুণাদি সহ জড়া প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি জড় জগতে বর্তমান হয়েও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারলে মুক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং এই জগতে পুনরাবর্তিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। এটিই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞানের পরিণতি। জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীব যে ঘটনাচক্রে এই জড় জগতের বন্ধনে পতিত হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রভাবে, সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের সঙ্গ করার ফলে মানুষ তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত *ভগবদ্গীতার* যথাযথ তাৎপর্য উপলব্ধি করে ভগবৎ-চেতনা বা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা। তা হলে তাকে আর জড় জগতের বন্ধনে ফিরে আসতে হয় না। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তখন তিনি সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করবার জন্য চিন্ময় জগতে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ২৫

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

ধ্যানেন—ধ্যানের দ্বারা; **আত্মনি**—অন্তরে; **পশ্যন্তি**—দর্শন করেন; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **অন্যে**—অন্যেরা; **সাংখ্যেন যোগেন**—সাংখ্য-যোগের দ্বারা; **কর্মযোগেন**—কর্মযোগের দ্বারা; **চ**—ও; **অপরে**—অন্যেরা।

গীতার গান

ভক্তগণ চিদাশ্রয়ে সদা ধ্যানে রত ।
প্রেমচক্ষে পরমাত্মাকে দর্শন সতত ॥
সাংখ্যযোগী জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করে ।
কর্মযোগী ভগবানে কর্মার্পণ করে ॥

অনুবাদ

কেউ কেউ পরমাত্মাকে অন্তরে ধ্যানের দ্বারা দর্শন করেন, কেউ সাংখ্য-যোগের দ্বারা দর্শন করেন এবং অন্যেরা কর্মযোগের দ্বারা দর্শন করেন।

তাৎপর্য

ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে, আত্মজ্ঞান লাভের অনুসন্ধানী বদ্ধ জীবাত্মাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যারা নাস্তিক, অজ্ঞাবাদী এবং সন্দেহবাদী, তারা সর্বতোভাবে তত্ত্বজ্ঞানশূন্য। কিন্তু যারা পারমার্থিক বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, তাদের বলা হয় অন্তর্দর্শী ভক্ত, দার্শনিক ও নিষ্কাম কর্মী। যারা সর্বদা অদ্বৈতবাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে, তাঁদেরও নাস্তিক ও অজ্ঞাবাদী বলে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তেরাই কেবল পারমার্থিক উপলব্ধির উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। কারণ তাঁরা জানেন যে, এই জড় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চিন্ময় ভগবৎ-ধাম রয়েছে, যেখানে পরম পুরুষ ভগবান নিত্য বিরাজমান এবং তিনি পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করে প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান। তিনিই হচ্ছেন সর্বব্যাপী ভগবান। অবশ্য অনেক অধ্যাত্মবাদী আছেন, যাঁরা জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরাও বিশ্বাসীদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা জড় জগৎকে চব্বিশটি তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করেন এবং

তাঁরা জীবাত্মাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করেন। যখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, জীবাত্মার প্রকৃতি হল জড়াতীত, তখন তাঁরা এটিও বুঝতে পারেন যে, জীবাত্মার ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সেই ভগবান হচ্ছেন ষড়বিংশতি তত্ত্ব। এভাবেই ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে তাঁরাও ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন। যাঁরা নিষ্কাম কর্মী বা কর্মযোগী, তাঁরাও ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। কালক্রমে তাঁরাও কৃষ্ণভাবনায় ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হবার সুযোগ পান। এখানে বলা হয়েছে যে, কিছু মানুষ আছেন যাঁদের চিত্তবৃত্তি নির্মল এবং তাঁরা ধ্যানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা যখন হৃদয়ে পরমাত্মাকে খুঁজে পান, তখন তাঁরা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তেমনই, অনেকে আছেন, যাঁরা জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। কেউ আবার হঠযোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবানকে জানতে চান এবং কেউ আবার শিশুসুলভ কার্যকলাপের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন।

শ্লোক ২৬

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে ।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্যে—অন্যেরা; **তু**—কিন্তু; **এবম্**—এভাবেই; **অজানন্তঃ**—না জেনে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অন্যেভ্যঃ**—অন্যদের কাছ থেকে; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **তে**—তাঁরা; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অতিতরন্তি**—অতিক্রম করেন; **এব**—অবশ্যই; **মৃত্যুম্**—মৃত্যুময় সংসার; **শ্রুতিপরায়ণাঃ**—শ্রবণ-পরায়ণ হয়ে।

গীতার গান

অন্য সাধারণ লোক বুঝে না সে কিছু ।
শ্রবণান্তর উপাসনা তারা করে কিছু ॥
তারাও ত্বরিয়া যায় এ সংসার হতে ।
যদি শ্রুতিপরায়ণ সাধুর সঙ্গেতে ॥

অনুবাদ

অন্য কেউ কেউ এভাবেই না জেনে অন্যদের কাছ থেকে শ্রবণ করে উপাসনা করেন। তাঁরাও শ্রবণ-পরায়ণ হয়ে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি আধুনিক সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ বর্তমান সমাজে বাস্তবিকপক্ষে পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে কোন রকম শিক্ষাই দেওয়া হয় না। কিছু কিছু লোককে নাস্তিক অথবা অজ্ঞাবাদী অথবা দার্শনিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন রকম দার্শনিক জ্ঞানই নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, কোন মানুষ যদি পুণ্যাত্মা হন, তা হলে শ্রবণ করার মাধ্যমে তিনি পরমার্থ সাধনের পথে একটি সুযোগ পেতে পারেন। এই শ্রবণের পন্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি বর্তমান জগতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করে গেছেন, তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ যদি কেবল সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তা হলে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারেন, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তাঁরা যদি অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করেন। তাই বলা হয়েছে যে, সকলেরই উচিত আত্মজ্ঞানী পুরুষের কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করা এবং তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করা। তখন তাঁরা আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা শুরু করবেন। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, এই কলিযুগে কাউকেই তার অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে না। তবে অনুমানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার সব রকম চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হবে। যাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের সেবক হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি অসীম সৌভাগ্যের ফলে কোন শুদ্ধ ভক্তের চরণাশ্রয় লাভ করেন, তাঁর মুখারবিন্দ থেকে আত্মজ্ঞান শ্রবণ করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তের পর্যায়ে উন্নীত হবেন। এই শ্লোকে শ্রবণ করার পন্থা বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এই শ্রবণের পন্থা খুবই যথাযথ। সাধারণ মানুষ যদিও তথাকথিত দার্শনিকদের মতো দক্ষ নাও হন, তবুও শ্রদ্ধা ভরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মুখারবিন্দ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার ফলে তাঁরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ২৭

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

যাবৎ—যা কিছু; **সংজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **স্থাবর**—স্থাবর; **জঙ্গমম্**—জঙ্গম; **ক্ষেত্র**—দেহ; **ক্ষেত্রজ্ঞ**—ক্ষেত্রজ্ঞের; **সংযোগাৎ**—সংযোগ থেকে; **তৎ**—তা; **বিদ্ধি**—জানবে; **ভরতর্ষভ**—হে ভারতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

স্থাবর জঙ্গম যত জন্মেছে জন্মাবে ।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ প্রভাবে ॥

অনুবাদ

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! স্থাবর ও জঙ্গম যা কিছু অস্তিত্ব আছে, তা সবই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে জানবে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়েই সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল, তাদের সম্বন্ধে এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল জড়া প্রকৃতি ও জীবের সমন্বয় মাত্র। প্রকৃতিতে গাছপালা, পাহাড় ও পর্বতের মতো অনেক কিছু আছে, যা স্থাবর বা গতিশীল নয় এবং অনেক কিছু আছে যা জঙ্গম বা গতিশীল। তারা সকলেই জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি জীবাত্মার সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পরা প্রকৃতি জীবাত্মার সংস্পর্শ ছাড়া কোন কিছুরই বিকাশ হতে পারে না। জড়া প্রকৃতির সঙ্গে পরা প্রকৃতির যে সম্পর্ক তা নিত্যকাল ধরে চলে আসছে এবং তাদের সমন্বয় সম্পাদিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে। তাই, তিনি উৎকৃষ্টা ও অনুৎকৃষ্টা উভয় প্রকৃতিরই নিয়ন্তা। তিনি জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং উৎকৃষ্টা পরা প্রকৃতিকে তিনিই জড়া প্রকৃতিতে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর ফলে এই সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং সক্রিয় হয়েছে।

শ্লোক ২৮

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

সমম্—সমভাবে; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবে; **তিষ্ঠন্তম্**—অবস্থিত; **পরমেশ্বরম্**—পরমাত্মাকে; **বিনশ্যৎসু**—বিনাশশীলদের মধ্যে; **অবিনশ্যন্তম্**—অবিনাশী; **যঃ**—যিনি; **পশ্যতি**—দর্শন করেন; **সঃ**—তিনি; **পশ্যতি**—যথার্থ দর্শন করেন।

গীতার গান

সে সব ভূতেতে সমস্থিত ভগবান।
দর্শন করিতে পারে কোন ভাগ্যবান ॥
ভগবান অবিনশ্যৎ বস্তু তাহার ভিতরে।
বিনশ্যৎ ধর্ম তিনি স্বীকার না করে ॥

অনুবাদ

যিনি সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত বিনাশশীল দেহের মধ্যেও অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।

তাৎপর্য

সাধুসঙ্গের প্রভাবে যিনি দেহ, দেহী বা জীবাত্মা ও জীবাত্মার বন্ধু—এই তিনটি তত্ত্বের সমন্বয় দর্শন করতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছেন। যে পারমার্থিক বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞাতার সঙ্গ করে না, সে এই তিনটি জিনিস দেখতে পায় না। যারা তেমন সঙ্গ লাভ করে না, তারা অজ্ঞ হয়েই থাকে। তারা কেবল দেহটিই দর্শন করে এবং দেহটির যখন বিনাশ হয়ে যায়, তখন মনে করে যে, সব কিছুই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি তা নয়। দেহের বিনাশ হলেও আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বর্তমান থাকেন এবং তাঁরা অনাদি কাল ধরে অসংখ্য স্থাবর ও জঙ্গম শরীরে ভ্রমণ করতে থাকেন। *পরমেশ্বর* এই সংস্কৃত শব্দটিকে কখনও কখনও 'জীবাত্মা' বলে অনুবাদ করা হয়, কারণ আত্মা হচ্ছে দেহের প্রভু এবং দেহের বিনাশের পরে সে অন্য একটি রূপ গ্রহণ করে। এভাবেই সে হচ্ছে প্রভু। কিন্তু *পরমেশ্বর* শব্দটিকে 'পরমাত্মা' বলে অন্যেরা ব্যাখ্যা করে থাকেন। দুটি ক্ষেত্রেই, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই থাকেন। তাঁদের বিনাশ হয় না। এভাবেই যিনি দর্শন করতে পারেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে তা বুঝতে পারেন।

শ্লোক ২৯

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

সমম্—সমভাবে; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **হি**—অবশ্যই; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সমবস্থিতম্**—সমভাবে অবস্থিত; **ঈশ্বরম্**—পরমাত্মাকে; **ন**—করেন না; **হিনস্তি**—অধঃপতন; **আত্ম** া।—মনের দ্বারা; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **ততঃ**—সেই হেতু; **যাতি**—লাভ করেন; **পরাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি।

গীতার গান

সকলের মধ্যে সম থাকেন ঈশ্বর ।
দেখিতে সমর্থ হয় যেই তৎপর ॥
যে আত্মাকে অধঃপাত কভু নাহি করে ।
কুপথগামী সে দুষ্ট মন দ্বারে ॥

অনুবাদ

যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কখনও মনের দ্বারা নিজেকে অধঃপতিত করেন না। এভাবেই তিনি পরম গতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

জীবাত্মা তার জড়-জাগতিক অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার চিন্ময় অবস্থা থেকে ভিন্নতর অবস্থান লাভ করে। কিন্তু কেউ যখন বুঝতে পারে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পরমাত্মা অংশ-প্রকাশরূপে সর্বত্র বিরাজিত, অর্থাৎ কেউ যখন সর্বভূতে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, তখন আর তিনি বিনাশী মনোভাব নিয়ে নিজেকে অধঃপতিত করেন না এবং তাই তিনি তখন ধীরে ধীরে চিন্ময় জগতের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মন সাধারণত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক ক্রিয়াকলাপে আসক্ত থাকে, কিন্তু সেই মন যখন ভগবন্মুখী হয়, তখন পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ৩০

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

প্রকৃত্যা—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **ক্রিয়মাণানি**—ক্রিয়মাণ; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে; **যঃ**—যিনি; **পশ্যতি**—দর্শন করেন;

তথা—এবং; আত্মানম্—আত্মাকে; অকর্তারম্—অকর্তা; সঃ—তিনি; পশ্যতি—যথাযথভাবে দর্শন করেন।

গীতার গান

প্রকৃতি প্রদত্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ।
প্রকৃতিই সাধে কর্ম জীবের সে সারা ॥
কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীব কিছু নাহি করে ।
যাঁহার দর্শন সেই সে দেখিতে পারে ॥

অনুবাদ

যিনি দর্শন করেন যে, দেহের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং আত্মা হচ্ছে অকর্তা, তিনিই যথাযথভাবে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

এই দেহটি পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং দেহের মাধ্যমে জীব যে সমস্ত কার্যকলাপ করে, সেগুলি সে নিজে করে না। সুখ অথবা দুঃখের জন্য সে যা-ই করুক, প্রকৃতপক্ষে তার দেহের গঠন অনুসারে সেটি করতে সে বাধ্য হয়। আত্মা কিন্তু সর্বদাই এই সমস্ত দৈহিক কার্যকলাপের ঊর্ধ্বে। কারও অতীত বাসনা অনুসারে তার দেহটি দেওয়া হয়েছে। কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য জীব তার জড় দেহ প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা সে কর্ম করে। বস্তুত বলা যায় যে, দেহটি হচ্ছে একটি যন্ত্র, যা জীবের মনোবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য ভগবান বানিয়েছেন। বাসনার ফলে দুঃখ অথবা সুখ ভোগ করবার জন্য জীব নানা রকম সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু জীবের এই দিব্যদৃষ্টি যখন বিকশিত হয়, তখন সে তার দেহের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে পৃথকরূপে দর্শন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যাঁর আছে, তিনি হচ্ছেন আসল দ্রষ্টা।

শ্লোক ৩১

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

যদা—যখন; ভূত—জীবগণের; পৃথগ্‌ভাবম্—পৃথক অস্তিত্ব; একস্থম্—একই

প্রকৃতিতে অবস্থিত; **অনুপশ্যতি**—দর্শন করেন; **ততঃ এব**—তা থেকে; **চ**—ও; **বিস্তারম্**—বিস্তার; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মভাব; **সম্পদ্যতে**—লাভ করেন; **তদা**—তখন।

গীতার গান

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে যেবা একত্ব দর্শনে ।
সর্বভূতের পৃথক ভাব সমর্থ সে মনে ॥
সৃষ্টি স্থিতি বিস্তার সেই যেবা জানে ।
সমর্থ সে জন দৃষ্টি ব্রহ্ম সম্পাদনে ॥

অনুবাদ

যখন বিবেকী পুরুষ জীবগণের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে একই প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং একই প্রকৃতি থেকেই তাদের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

কেউ যখন দর্শন করতে পারেন যে, জীব তার কামনা বাসনার ফলে নানা রকম জড় দেহ প্রাপ্ত হয় এবং আত্মার থেকে জড় দেহ পৃথক, তখনই তিনি যথাযথভাবে দর্শন করেন। জড়-জাগতিক জীবনে আমরা দেখি যে, কেউ দেবতা, কেউ মানুষ, কেউ কুকুর, কেউ বেড়াল ইত্যাদি। কিন্তু এটি হচ্ছে জড় দর্শন—যথার্থ দর্শন নয়। জীবন সম্বন্ধে জড় ধারণার ফলেই এই জড় বিভেদ প্রতিভাত হয়। জড় দেহের বিনাশ হয়ে যাবার পর, আত্মা একই থাকে। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আত্মা নানা প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। কেউ যখন তা দর্শন করতে পারেন, তখন তিনি দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হন। এভাবেই মানুষ, পশু, বড়, ছোট আদি পার্থক্য থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর চেতনা তখন পরিশুদ্ধ হয় এবং তিনি তখন তাঁর চিন্ময় স্বরূপে কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। তখন তিনি কিভাবে সব কিছু দর্শন করেন, তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৩২

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

অনাদিত্বাৎ—অনাদিত্ব হেতু; **নির্গুণত্বাৎ**—নির্গুণত্ব হেতু; **পরম**—জড়া প্রকৃতির অতীত; **আত্মা**—আত্মা; **অয়ম্**—এই; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **শরীরস্থঃ অপি**—শরীরে থেকেও; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **ন করোতি**—কিছুই করে না; **ন লিপ্যতে**—লিপ্ত হয় না।

গীতার গান

ব্রহ্মজ্ঞানী জীব নিত্য পরম অব্যয় ।
নির্গুণ অনাদি তত্ত্ব নির্লিপ্ত সে রয় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মভাব অবস্থায় জীব তখন দর্শন করেন যে, অব্যয় এই আত্মা অনাদি, নির্গুণ ও জড়া প্রকৃতির অতীত। হে কৌন্তেয়! জড় দেহে অবস্থান করলেও আত্মা কোন কিছু করে না এবং কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না।

তাৎপর্য

জড় দেহের জন্ম হওয়ার ফলে মনে হয় যেন জীবের জন্ম হল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব শাশ্বত, সনাতন, তার জন্ম হয় না এবং জড় দেহে স্থিত হলেও সে গুণাতীত ও শাশ্বত। তাই, তার কখনও বিনাশও হয় না। স্বভাবত সে হচ্ছে আনন্দময়। সে নিজে কোন রকম জড় কার্যে নিযুক্ত হয় না; তাই জড় শরীরের সংস্পর্শে আসার ফলে যে সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়, তা তাকে আবদ্ধ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৩

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যথা—যেমন; **সর্বগতম্**—সর্বব্যাপ্ত; **সৌক্ষ্ম্যাৎ**—সূক্ষ্মতা হেতু; **আকাশম্**—আকাশ; **ন**—না; **উপলিপ্যতে**—লিপ্ত হয়; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত; **দেহে**—শরীরে; **তথা**—তেমন; **আত্মা**—আত্মা; **ন**—না; **উপলিপ্যতে**—লিপ্ত হয়।

গীতার গান

**যেমন সর্বগত ব্যোম,	সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুপম,**
সর্বত্র সম্ভব বিচরণ ।

তথাপি সে লিপ্ত নহে, নিজের স্বতন্ত্র রহে,
সেইরূপ আত্ম বিচরণ ॥
সর্বত্র ব্যাপিয়া দেহে, কূটস্থ পৃথক রহে,
মহাভূতে নহে সে মিলন ।
তথা ব্রহ্মভূত জীব, আত্মতত্ত্বে হয়ে শিব,
দেহধর্মে লিপ্ত নাহি হন ॥

অনুবাদ

আকাশ যেমন সর্বগত হয়েও সূক্ষ্মতা হেতু অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তেমনই ব্রহ্ম দর্শন-সম্পন্ন জীবাত্মা দেহে অবস্থিত হয়েও দেহধর্মে লিপ্ত হন না।

তাৎপর্য

জল, কাদা, বিষ্ঠা আদি সব কিছুতেই বায়ু প্রবেশ করে, কিন্তু তা হলেও কোন কিছুর সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হয় না। তেমনই, জীবাত্মা যদিও নানা রকম শরীরে অবস্থান করে, তবুও তার সূক্ষ্ম প্রকৃতির প্রভাবে সে সব কিছু থেকে পৃথক থাকে। তাই, জীবাত্মা যে কিভাবে এই শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এই শরীরের বিনাশের পর সে যে কিভাবে এই শরীর থেকে চলে যায়, তা জড় চক্ষু দিয়ে দর্শন করা সম্ভব নয়। জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে কেউই তা বিশ্লেষণ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৪

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

যথা—যেমন; **প্রকাশয়তি**—প্রকাশ করে; **একঃ**—এক; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **লোকম্**—জগৎকে; **ইমম্**—এই; **রবিঃ**—সূর্য; **ক্ষেত্রম্**—এই দেহকে; **ক্ষেত্রী**—আত্মা; **তথা**—সেই রকম; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **প্রকাশয়তি**—প্রকাশ করে; **ভারত**—হে ভারত।

গীতার গান

সূর্য যথা প্রকাশয়ে অখিল জগৎ ।
এক দেশে একা থাকি সম্রাট মহৎ ॥

হে ভারত সেইরূপ ক্ষেত্রী প্রকাশয় ।
একা একস্থানে থাকি ক্ষেত্র দেহময় ॥

অনুবাদ

হে ভারত! এক সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই রকম ক্ষেত্রী আত্মাও সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

চেতনা সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ আছে। এখানে *ভগবদ্গীতায়* সূর্য ও সূর্যরশ্মির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সূর্য যেমন এক জায়গায় অবস্থিত, কিন্তু তার রশ্মি সারা জগৎকে আলোকিত করছে, তেমনই অণুসদৃশ জীবাত্মা যদিও শরীরের হৃদয়ে অবস্থিত, তবুও চেতনার দ্বারা সে সমস্ত শরীরকে আলোকিত করছে। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, সূর্যরশ্মি বা আলোক যেমন সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনই চেতনা হচ্ছে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। দেহে যখন আত্মা থাকে, তখন সারা শরীর জুড়ে চেতনা থাকে, কিন্তু দেহ থেকে আত্মা যখনই চলে যায়, তখন আর চেতনা থাকে না। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এটি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সুতরাং, জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে চেতনার উদ্ভব হয় না। চেতনা হচ্ছে জীবাত্মার লক্ষণ। জীবের চেতনা যদিও পরম চেতনার সঙ্গে গুণগতভাবে এক, তবুও তা পরম নয়। কারণ একটি দেহের চেতনা অন্য দেহের চেতনার অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু জীবের বন্ধুরূপে যে পরমাত্মা প্রতিটি জীবের দেহে বিরাজ করছেন, তিনি সমস্ত শরীর সম্বন্ধে সচেতন। সেটিই হচ্ছে বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্যের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৫

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ক্ষেত্র—দেহ; **ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ**—ক্ষেত্রজ্ঞের; **এবম্**—এভাবে; **অন্তরম্**—ভেদ; **জ্ঞানচক্ষুষা**—জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা; **ভূত**—জীবের; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতি থেকে; **মোক্ষম্**—মুক্তি; **চ**—ও; **যে**—যাঁরা; **বিদুঃ**—জানেন; **যান্তি**—প্রাপ্ত হন; **তে**—তাঁরা; **পরম্**—পরম পদ।

গীতার গান

ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞান চক্ষে ।
দেখিবার শক্তি হয় সে যাহার পক্ষে ॥
এক ক্ষেত্রজ্ঞ সে জীব অন্য পরমাত্মা ।
উভয়ের ক্ষেত্রে বাস ক্ষেত্র বিশেষাত্মা ॥
তার মোক্ষ জড়নিষ্ঠ প্রবৃত্তি হইতে ।
সুখে বাস পরব্যোমে জড় দেহ অন্তে ॥

অনুবাদ

যাঁরা এভাবেই জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জানেন এবং জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে জীবগণের মুক্ত হওয়ার পন্থা জানেন, তাঁরা পরম গতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মূল কথা হচ্ছে যে, ক্ষেত্র (শরীর), ক্ষেত্রজ্ঞ (শরীরের মালিক) ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত মুক্তি লাভের পন্থা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তবেই পরম গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।

যে মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে, তাঁকে সর্ব প্রথমে সাধুসঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে এবং এভাবেই ধীরে ধীরে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করবেন। যদি কেউ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হন এবং সেটিই হচ্ছে তাঁর পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রমোন্নতির উপায়। সদ্গুরু তাঁর শিষ্যকে নানা রকম সদুপদেশ দান করে জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করেন। যেমন, *ভগবদ্গীতায়* আমরা দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন।

এই দেহ যে জড় পদার্থ তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়; চব্বিশটি বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়ে তার বিশ্লেষণ করা যায়। দেহ হচ্ছে তার স্থূল প্রকাশ। তার সূক্ষ্ম প্রকাশ হচ্ছে মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া। এই সমস্ত তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। কিন্তু এদের ঊর্ধ্বে রয়েছে আত্মা ও পরমাত্মা। আত্মা ও পরমাত্মা হচ্ছেন দুজন। জড় জগতের সমস্ত ক্রিয়া সাধিত হচ্ছে আত্মা ও চব্বিশটি তত্ত্বের

সংযোগের ফলে। যিনি আত্মা ও জড় উপাদানের সমন্বয়কে জড় জগতের কারণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন এবং পরমাত্মার অবস্থান দর্শন করতে পারেন, তিনি চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এগুলি গভীরভাবে মনোনিবেশ ও উপলব্ধি করবার বিষয় এবং সকলেরই উচিত সদ্‌গুরুর কৃপার প্রভাবে এই অধ্যায়কে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—'প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; পরম্—অপ্রাকৃত; ভূয়ঃ—পুনরায়; প্রবক্ষ্যামি—আমি বলব; জ্ঞানানাম্—সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; উত্তমম্—শ্রেষ্ঠ; যৎ—যা; জ্ঞাত্বা—জেনে; মুনয়ঃ—মুনিগণ; সর্বে—সমস্ত; পরাম্—পরম; সিদ্ধিম্—সিদ্ধি; ইতঃ—এই জগৎ থেকে; গতাঃ—লাভ করেছিলেন।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

আবার পরম জ্ঞান বলিব তোমারে ।
জ্ঞানচর্চা যত আছে উত্তম সবারে ॥
যে জ্ঞানেতে মুনি জ্ঞানী হইয়া সর্বত ।
পূর্ব ইতিহাস ছিল সিদ্ধি পারঙ্গত ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—পুনরায় আমি তোমাকে সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান সম্বন্ধে বলব, যা জেনে মুনিগণ এই জড় জগৎ থেকে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত পরমতত্ত্ব বা পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে ভগবান স্বয়ং অর্জুনকে ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও জ্ঞান দান করছেন। দার্শনিক অনুমানের মাধ্যমে কেউ যদি এই অধ্যায়ের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বিনীতভাবে জ্ঞান আহরণ করার মাধ্যমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে। আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির গুণের সাথে সঙ্গ করার ফলে জীবাত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এখন এই অধ্যায়ে ভগবান বর্ণনা করছেন, প্রকৃতির সেই গুণগুলি কি, তারা কিভাবে ক্রিয়া করে, তারা কিভাবে জীবকে বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং কিভাবে তারা মুক্তি দান করে। এই অধ্যায়ে প্রদত্ত জ্ঞানকে পূর্ববর্তী সমস্ত অধ্যায়ে প্রদত্ত জ্ঞান থেকে শ্রেয় বলে পরমেশ্বর ভগবান ঘোষণা করছেন। এই জ্ঞান উপলব্ধি করার মাধ্যমে বহু মহর্ষি সিদ্ধি লাভ করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করেছেন। ভগবান এখন সেই জ্ঞানই আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। অন্যান্য যে সমস্ত জ্ঞানের পন্থা তিনি এ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন, তা থেকে এই জ্ঞান অনেক অনেক গুণে শ্রেয় এবং এই জ্ঞান লাভ করে অনেকেই সিদ্ধি লাভ করেছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, এই চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারবে।

শ্লোক ২

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

ইদম্—এই; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **উপাশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **মম**—আমার; **সাধর্ম্যম্**—একই প্রকৃতি; **আগতাঃ**—লাভ করে; **সর্গে অপি**—সৃষ্টিকালেও; **ন**—

না; উপজায়ন্তে—জন্মগ্রহণ করে; প্রলয়ে—প্রলয় কালে; ন—না; ব্যথন্তি—ব্যথিত হয়; চ—ও।

গীতার গান

এই জ্ঞান লাভ করি নির্গুণ জ্ঞানেতে ।
অবস্থিত হয় লোক নির্গুণ আমাতে ॥
তাহার না হয় জন্ম পুনঃ সৃষ্টির সময় ।
কিংবা দুঃখ নাহি তার যখন প্রলয় ॥

অনুবাদ

এই জ্ঞান আশ্রয় করলে জীব আমার পরা প্রকৃতি লাভ করে। তখন আর সে সৃষ্টির সময়ে জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হয় না।

তাৎপর্য

পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে গুণগতভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা যায়। কিন্তু তাই বলে জীবাত্মা তখন তার ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে ফেলে না। বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, মুক্ত জীবাত্মারা যাঁরা চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গেছেন, তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হয়ে তাঁর শ্রীচরণ-কমল দর্শন করেন। সুতরাং, মুক্তির পরেও ভগবদ্ভক্তেরা তাঁদের ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে ফেলেন না।

সাধারণত, এই জড় জগতে আমরা যে জ্ঞান আহরণ করি, তা জড় জগতের তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত। কিন্তু যে জ্ঞান প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত নয়, তাকে বলা হয় দিব্যজ্ঞান। কেউ যখন সেই দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হন, তিনি তখন পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত হন। চিদাকাশ সম্বন্ধে যাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা মনে করে যে, জড় রূপের দ্বারা সম্পাদিত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়ার পরে চিন্ময় সত্তা সব রকম বৈচিত্র্যহীন নিরাকার হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিৎ-জগৎও জড় জগতের মতো বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। যারা এই সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারাই মনে করে যে, চিন্ময় অস্তিত্ব জড় বৈচিত্র্যের ঠিক বিপরীত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করলে জীব তার চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হয়। সেখানে তার সমস্ত কার্যকলাপ হয়ে ওঠে চিন্ময়। এই চিন্ময় অবস্থাকে বলা হয়

ভক্তজীবন। চিৎ-জগতের পরিবেশ সম্বন্ধে বলা হয় যে, তা সমস্ত কলুষমুক্ত এবং সেখানে সকলেই গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত। এই প্রকার জ্ঞান আহরণ করতে হলে অবশ্যই দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত হতে হবে। এভাবেই যিনি তাঁর দিব্য গুণাবলীর বিকাশ সাধন করেন, তিনি এই জড় জগতের সৃষ্টি অথবা বিনাশ কোনটির দ্বারাই প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ৩

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

মম—আমার; যোনিঃ—গর্ভাধানের স্থান; মহৎ—সমগ্র জড় প্রকাশ; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; তস্মিন্—তাতে; গর্ভম্—সৃষ্টির বীজ; দধামি—অর্পণ করি; অহম্—আমি; সম্ভবঃ—উৎপত্তি; সর্বভূতানাম্—সমস্ত জীবের; ততঃ—তা থেকে; ভবতি—হয়; ভারত—হে ভারত।

গীতার গান

জগতের মাতৃযোনি জড়া মহৎ-তত্ত্ব ।
সেই ব্রহ্মে গর্ভাধান করি সে মহত্ত্ব ॥
হে ভারত তাই জন্মে সর্বভূত যত ।
জগতের ভূত সৃষ্টি হয় সেই মত ॥

অনুবাদ

হে ভারত! প্রকৃতি সংজ্ঞক ব্রহ্ম আমার যোনিস্বরূপ এবং সেই ব্রহ্মে আমি গর্ভাধান করি, যার ফলে সমস্ত জীবের জন্ম হয়।

তাৎপর্য

জড় জগৎ সম্বন্ধে একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা দেহ ও আত্মার সমন্বয়ের ফলেই সব কিছু ঘটছে। জড়া প্রকৃতি ও জীবাত্মার সমন্বয় ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই সাধিত হয়। মহৎ-তত্ত্বই হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ, এবং যেহেতু জড় প্রকাশের মূল উপাদানে রয়েছে প্রকৃতির তিনটি গুণ, তাই তাকে কখনও কখনও ব্রহ্ম বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবান মহৎ-তত্ত্বকে গর্ভবতী করেন

এবং তার ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়। বৈদিক শাস্ত্রে (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/১/৯) এই মহৎ-তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে—*তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে*। পরম পুরুষ সেই ব্রহ্মের গর্ভে জীবাত্মাসমূহকে সঞ্চারিত করেন। মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু আদি চব্বিশটি উপাদানের সব কয়টি হচ্ছে *মহদ্ ব্রহ্ম* নামক জড়া প্রকৃতি। সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, এই জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে রয়েছে পরা প্রকৃতি বা *জীবভূত*। পরম পুরুষ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে জড়া প্রকৃতিতে পরা প্রকৃতি মিশ্রিত হয়েছে এবং তাই এই জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত জীবের জন্ম হয়েছে।

কাঁকড়াবিছে চালের গাদায় ডিম পাড়ে, তাই অনেক সময় বলা হয় যে, চাল থেকে কাঁকড়াবিছের জন্ম হয়। কিন্তু চাল থেকে কখনই কাঁকড়াবিছের জন্ম হয় না। প্রকৃতপক্ষে মা বিছা সেই ডিমগুলি পেড়েছিল। তেমনই, জড়া প্রকৃতি জীবের জন্মের কারণ নয়। পরম পুরুষ ভগবান বীজ প্রদান করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন জড়া প্রকৃতি থেকে সমস্ত জীব উদ্ভূত হল। এভাবেই প্রতিটি জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, যাতে তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সেই জীব সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে পারে। এই জড় জগতে সমস্ত জীবের প্রকাশের কারণ হচ্ছেন ভগবান।

শ্লোক ৪

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

সর্বযোনিষু—সকল যোনিতে; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **মূর্তয়ঃ**—মূর্তিসমূহ; **সম্ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **যাঃ**—যে সমস্ত; **তাসাম্**—তাদের সকলের; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **মহৎ যোনিঃ**—মহৎ-তত্ত্বরূপী যোনি; **অহম্**—আমি; **বীজপ্রদঃ**—বীজ প্রদানকারী; **পিতা**—পিতা।

গীতার গান

অতএব সর্বযোনি যত মূর্তি ধরে ।
হে কৌন্তেয় জান তাহা আমার আধারে ॥
ব্রহ্ম মহত্তত্ত্ব হয় সবার জননী ।
আমি বীজপ্রদ পিতা জগৎ সরণী ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপী যোনিই তাদের জননী-স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পিতা। জীব হচ্ছে জড়া প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির সমন্বয়। এই ধরনের জীব কেবল এই গ্রহেই দৃষ্ট হয় না, অন্যান্য গ্রহে, এমন কি সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকেও জীব আছে। জীবাত্মা সর্বত্রই রয়েছে। মাটির নীচেও জীব রয়েছে, এমন কি জলে এবং আগুনেও জীব রয়েছে। এই সমস্ত প্রকাশ সম্ভব হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে যে, মাতৃরূপী জড়া প্রকৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ বীজ প্রদান করেছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে যে, পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জীবাত্মাকে জড় জগতের গর্ভে সঞ্চারিত করা হয় এবং সৃষ্টির সময়ে তারা বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্ব; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**—তম; **ইতি**—এই; **গুণাঃ**—গুণসমূহ; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতি; **সম্ভবাঃ**—জাত; **নিবধ্নন্তি**—আবদ্ধ করে; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **দেহে**—এই শরীরে; **দেহিনম্**—জীবকে; **অব্যয়ম্**—নিত্য।

গীতার গান

সত্ত্ব, রজো, তম, গুণ প্রকৃতিসম্ভব ।
ত্রিগুণেতে বদ্ধ জীব হয়ে যায় সব ॥
এই দেহ সে বন্ধন নিগূঢ় আকার ।
জীব অব্যয় সে বদ্ধ যে প্রকার ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! জড়া প্রকৃতি থেকে জাত সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ এই দেহের মধ্যে অবস্থিত অব্যয় জীবকে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

জীবাত্মা যেহেতু চিন্ময়, তাই জড়া প্রকৃতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তবুও জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে সে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কবলিত হয়ে কর্ম করছে। জীব যেহেতু তাদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, তাই তাদের সেই প্রকৃতি অনুসারে তারা সেই কর্ম করতে বাধ্য হয়। নানা রকম সুখ ও দুঃখের সেটিই হচ্ছে কারণ।

শ্লোক ৬

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

তত্র—সেই গুণসমূহের মধ্যে; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **নির্মলত্বাৎ**—জড় জগতে সবচেয়ে নির্মল হওয়ার ফলে; **প্রকাশকম্**—প্রকাশকারী; **অনাময়ম্**—পাপশূন্য; **সুখ**—সুখ; **সঙ্গেন**—সঙ্গের দ্বারা; **বধ্নাতি**—আবদ্ধ করে; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **সঙ্গেন**—সঙ্গের দ্বারা; **চ**—ও; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

গীতার গান

তার মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল আধার ।
পাপশূন্য প্রকাশক তত্ত্ব সে আত্মার ॥
জ্ঞানচর্চা করি সত্ত্বে বন্ধন তাহার ।
সেই শুদ্ধ সঙ্গ মানে শ্রেষ্ঠ চমৎকার ॥

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ! এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ার ফলে প্রকাশকারী ও পাপশূন্য এবং সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গের দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীব নানা রকমের। তার মধ্যে কেউ সুখী, কেউ আবার খুব কর্মচঞ্চল এবং কেউ আবার অসহায়। প্রকৃতিতে জীবদের বন্ধনদশার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত মানসিক অভিপ্রকাশ। তারা যে কিভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে আবদ্ধ হয়, তা *ভগবদ্গীতার* এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমেই হচ্ছে

সত্ত্বগুণ। জড় জগতে সত্ত্বগুণের বিকাশ সাধনের পরিণতি হচ্ছে যে, তিনি অন্য গুণের দ্বারা প্রভাবিত জীবদের থেকে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন হন। যে মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তিনি জড় জগতের দুঃখকষ্ট দ্বারা ততটা প্রভাবিত হন না এবং তিনি জড়-জাগতিক জ্ঞান আহরণ করতে উৎসুক। এই ধরনের মানুষ হচ্ছেন 'ব্রাহ্মণ', যাঁর সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই স্তরের আনন্দানুভূতির কারণ হচ্ছে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত জীব সাধারণত পাপকর্ম থেকে অনেকটা মুক্ত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সত্ত্বগুণের অর্থ হচ্ছে উন্নত জ্ঞান এবং অধিকতর সুখানুভূতি।

এখানে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, জীব যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি মোহাচ্ছন্ন হয়ে মনে করেন যে, তিনি খুব জ্ঞানী এবং অন্যদের থেকে শ্রেয়। এভাবেই তিনি জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। সেই সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা। তাঁরা নিজেদের জ্ঞানের গর্বে মত্ত এবং যেহেতু তাঁরা সাধারণত তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তোলেন, তাই তাঁরা এক ধরনের জড় সুখ অনুভব করেন। বদ্ধ জীবনের এই উন্নত সুখানুভূতি তাঁদের জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণের বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। সেই হেতু, তাঁরা সত্ত্বগুণে কর্ম করার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই কর্ম করার দিকে তাঁদের আকর্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাঁদের প্রকৃতির গুণজাত কোন একটি জড় দেহ ধারণ করতেই হয়। তাই, মুক্তি লাভ করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করবার কোন সম্ভাবনাই তাঁদের নেই। তাঁরা হয়ত দার্শনিক, বিজ্ঞানী বা কবি হয়ে বারবার জন্মাতে পারেন, তবু জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশদায়ক বন্ধনে তাঁদের বারবার আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু জড়া প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা মনে করেন যে, সেই ধরনের জীবনযাত্রা সুখদায়ক।

শ্লোক ৭

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

রজঃ—রজোগুণ; **রাগাত্মকম্**—বাসনা অথবা অনুরাগাত্মক; **বিদ্ধি**—জানবে; **তৃষ্ণা**—আকাঙ্ক্ষা; **সঙ্গ**—আসক্তি-জনিত; **সমুদ্ভবম্**—উৎপন্ন; **তৎ**—তা; **নিবধ্নাতি**—আবদ্ধ করে; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **কর্মসঙ্গেন**—সকাম কর্মের আসক্তির দ্বারা; **দেহিনম্**—জীবকে।

গীতার গান

রজোগুণ তৃষ্ণাময় শুধু ভোগ চায় ।
আজীবন কর্ম করি করে হায় হায় ॥
কর্ম করে যত পারে বদ্ধ তাতে হয় ।
অসম্ভব কর্ম চেষ্টা সুখে দুঃখে রয় ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং তা তৃষ্ণা ও আসক্তি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে এবং সেই রজোগুণই জীবকে সকাম কর্মের আসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

রজোগুণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। পুরুষের প্রতি স্ত্রী আকৃষ্ট হয় এবং স্ত্রীর প্রতি পুরুষ আকৃষ্ট হয়। তাকে বলা হয় রজোগুণ। মানুষের মধ্যে যখন রজোগুণ বর্ধিত হয়, তখন তার জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। সে তখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য রজোগুণে অধিষ্ঠিত মানুষ সমাজে অথবা জাতিতে প্রতিষ্ঠা কামনা করে এবং স্ত্রী-পুত্র-গৃহ সমন্বিত একটি সুখী পরিবার কামনা করে। এগুলি হচ্ছে রজোগুণের প্রভাব। মানুষ যখন এই সব আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তাই এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে এই ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার স্ত্রী, পুত্র ও সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তার সম্মান বজায় রাখার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সুতরাং, সমস্ত জড় জগৎটিই প্রায় রজোগুণে অধিষ্ঠিত। আধুনিক সভ্যতাকে রজোগুণের পরিপ্রেক্ষিতেই উন্নত বলে গণ্য করা হয়। পুরাকালে সত্ত্বগুণের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতির মান নির্ণয় করা হত। যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরাই যদি মুক্তি লাভ করতে না পারেন, তা হলে যারা রজোগুণের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের কি অবস্থা?

শ্লোক ৮

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

তমঃ—তমোগুণ; **তু**—কিন্তু; **অজ্ঞানজম্**—অজ্ঞানজাত; **বিদ্ধি**—জানবে; **মোহনম্**—মোহনকারী; **সর্বদেহিনাম্**—সমস্ত জীবের; **প্রমাদ**—প্রমাদ; **আলস্য**—আলস্য; **নিদ্রাভিঃ**—নিদ্রার দ্বারা; **তৎ**—তা; **নিবধ্নাতি**—আবদ্ধ করে; **ভারত**—হে ভারত।

গীতার গান

তমো সে অজ্ঞানরূপ নিগূঢ় বন্ধন ।
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা তাহার মোহন ॥

অনুবাদ

হে ভারত! অজ্ঞানজাত তমোগুণকে সমস্ত জীবের মোহনকারী বলে জানবে। সেই তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সংস্কৃত *তু* শব্দটির প্রয়োগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে যে, তমোগুণ দেহধারী আত্মার অতি অদ্ভুত একটি গুণ। এই তমোগুণ হচ্ছে সত্ত্বগুণের সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্ত্বগুণে জ্ঞান অনুশীলনের ফলে জানতে পারা যায় কোন্‌টি কি, কিন্তু তমোগুণ হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন সকলেই উন্মাদ এবং যে উন্মাদ সে বুঝতে পারে না কোন্‌টি কি। উন্নতি সাধন করার পরিবর্তে সে অধঃপতিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রে তমোগুণের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *বস্তুযথাত্ম্যজ্ঞানাবরকং বিপর্যয়জ্ঞানজনকং তমঃ*—তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারা যায় না। যেমন সকলেই জানে যে, তার পিতামহ মারা গেছেন এবং তাই সেও একদিন মারা যাবে, কারণ মানুষ মরণশীল। তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিরাও একদিন মারা যাবে। সুতরাং সকলেরই মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু তবুও মানুষ তার সনাতন আত্মাকে উপেক্ষা করে উন্মাদের মতো দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে চলেছে। এটিই হচ্ছে উন্মত্ততা। তাদের এই উন্মত্ততার ফলে তারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রতি অত্যন্ত নিস্পৃহ। এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত অলস। পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য যখন তাদের সাধুসঙ্গ করতে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তাতে খুব একটা উৎসাহী হয় না। তারা এমন কি রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত মানুষদের মতোও ততটা সক্রিয় নয়। এভাবেই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষদের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে যে, তারা যতটা প্রয়োজন তার থেকে বেশি ঘুমায়। ছয় ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট, কিন্তু তমোগুণে আচ্ছন্ন যে মানুষ, সে কম করে দশ থেকে বারো ঘণ্টা ঘুমায়।

এই ধরনের মানুষ সর্বদাই বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং তারা মাদকদ্রব্য ও নিদ্রার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এগুলি হচ্ছে তমোগুণের দ্বারা আবদ্ধ মানুষের লক্ষণ।

শ্লোক ৯

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **সুখে**—সুখে; **সঞ্জয়তি**—আবদ্ধ করে; **রজঃ**—রজোগুণ; **কর্মণি**—সকাম কর্মে; **ভারত**—হে ভারত; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **আবৃত্য**—আবৃত করে; **তু**—কিন্তু; **তমঃ**—তমোগুণ; **প্রমাদে**—প্রমাদে; **সঞ্জয়তি**—আবদ্ধ করে; **উত**—বলা হয়।

গীতার গান

সত্ত্বগুণ সুখে বাঁধে রজোগুণ কাজে।
তমোগুণ প্রমাদেতে বন্ধনে বিরাজে ॥

অনুবাদ

হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ জীবকে সকাম কর্মে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ প্রমাদে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

যে মানুষ সাত্ত্বিক, তিনি দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক আদিরূপে কর্ম বা জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখায় নিযুক্ত থেকে, তাঁর বুদ্ধিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভ করেন। রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত সকাম কর্মে লিপ্ত মানুষ যতটা সম্ভব সম্পদ আহরণ করেন এবং সৎকার্যে অর্থ ব্যয় করেন। তিনি কখনও কখনও হাসপাতাল খোলবার চেষ্টা করেন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান আদিতে দান করেন। এগুলি হচ্ছে রজোগুণের লক্ষণ। আর তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে রাখে। তমোগুণে যাই করা হোক না কেন, তাতে মানুষের নিজের মঙ্গল হয় না এবং অন্যদেরও মঙ্গল হয় না।

শ্লোক ১০

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

রজঃ—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণকে; **চ**—ও; **অভিভূয়**—পরাভূত করে; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **ভবতি**—প্রবল হয়; **ভারত**—হে ভারত; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণকে; **চ**—ও; **এব**—এভাবেই; **তমঃ**—তমোগুণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণকে; **তথা**—সেভাবেই।

গীতার গান

রজোগুণ পরাজয়ে সত্ত্বের প্রাধান্য ।
সত্ত্বতম পরাজয়ে রজ হয় গণ্য ॥
রজো সত্ত্ব পরাজয়ে তমের প্রাধান্য ।
সেই সে পর্যায় হয় গুণের সামান্য ॥

অনুবাদ

হে ভারত! রজ ও তমোগুণকে পরাভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করে রজোগুণ প্রবল হয় এবং সেভাবেই সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করে তমোগুণ প্রবল হয়।

তাৎপর্য

যখন রজোগুণের প্রাধান্য হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণ পরাভূত হয়। সত্ত্বগুণের যখন প্রাধান্য হয়, তখন তম ও রজোগুণ পরাভূত হয়। আর যখন তমোগুণের প্রাধান্য হয়, তখন রজ ও সত্ত্বগুণ পরাভূত হয়। এই প্রতিযোগিতা সব সময়ে চলছে। তাই, যিনি কৃষ্ণভাবনার পথে উন্নতি সাধন করতে সংকল্পবদ্ধ, তাঁকে এই তিনটি গুণই অতিক্রম করতে হবে। মানুষের আচরণে, তার কার্যকলাপে, আহার-বিহার আদিতে কোন না কোন গুণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হবে। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে তিনি অনুশীলনের মাধ্যমে সত্ত্বগুণকে বিকশিত করে রজ ও তমোগুণকে পরাভূত করতে পারেন। তেমনই, আবার রজোগুণ বিকশিত করে সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করা যায় অথবা তমোগুণকে বিকশিত করে সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করা যায়। যদিও প্রকৃতিতে এই তিনটি গুণ রয়েছে, তবুও কেউ যদি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন, তা হলে তিনি সত্ত্বগুণের দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হতে পারেন এবং সেই সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, যাকে বলা হয় *বাসুদেব* স্থিতি, অর্থাৎ যে অবস্থায় ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ বিশেষ আচরণ প্রকাশের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় কোন্ মানুষ কোন্ গুণে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ১১

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

সর্বদ্বারেষু—সব কয়টি দ্বারে; **দেহে অস্মিন্**—এই দেহে; **প্রকাশঃ**—প্রকাশ; **উপজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যদা**—যখন; **তদা**—তখন; **বিদ্যাৎ**—জানবে; **বিবৃদ্ধম্**—বর্ধিত হয়েছে; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **ইতি**—এভাবে; **উত**—বলা হয়।

গীতার গান

জ্ঞানের প্রভাবে যদা শরীরে প্রকাশ ।
সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে সত্ত্বগুণের বিকাশ ॥

অনুবাদ

যখন এই দেহের সব কয়টি দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়েছে বলে জানবে।

তাৎপর্য

দেহে নয়টি দ্বার রয়েছে—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখ, উপস্থ ও পায়ু। যখন প্রতিটি দ্বারে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সেই মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলে যথাযথভাবে দর্শন করা যায়, যথাযথভাবে শ্রবণ করা যায় এবং যথাযথভাবে স্বাদ গ্রহণ করা যায়। মানুষ তখন অন্তরে ও বাইরে নির্মল হন। প্রতিটি দ্বারেই তখন সুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং সেটিই হচ্ছে সাত্ত্বিক অবস্থা।

শ্লোক ১২

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা ।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

লোভঃ—লোভ; **প্রবৃত্তিঃ**—প্রবৃত্তি; **আরম্ভঃ**—উদ্যম; **কর্মণাম্**—কর্মসমূহে; **অশমঃ**—দুর্দমনীয়; **স্পৃহা**—বাসনা; **রজসি**—রজোগুণ; **এতানি**—এই সমস্ত; **জায়ন্তে**—উৎপন্ন হয়; **বিবৃদ্ধে**—বর্ধিত হলে; **ভরতর্ষভ**—হে ভরত-বংশশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

লোকপূজা প্রতিষ্ঠাদি কর্মের আকাঙ্ক্ষা ।
রজোগুণে বৃদ্ধি হয় নাহি অন্যাপেক্ষা ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ বর্ধিত হলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম ও দুর্দমনীয় স্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

তাৎপর্য

রজোগুণ-সম্পন্ন মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি কখনই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তিনি সর্বদাই তাঁর অবস্থার উন্নতি সাধন করবার আকাঙ্ক্ষা করেন। যখন তিনি কোন গৃহ নির্মাণ করেন, তখন তিনি একটি প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ করার চেষ্টা করেন, যেন তিনি চিরকাল সেই বাড়িতেই থাকতে পারবেন। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারে তাঁর প্রচণ্ড আসক্তি জাগে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন শেষ নেই। তিনি সর্বদাই তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকতে, তাঁর বাড়িতে বাস করতে এবং চিরকাল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চান। তাঁর এই কামনা-বাসনার কখনই নিবৃত্তি হয় না। এই সমস্ত লক্ষণগুলি রজোগুণের বৈশিষ্ট্য বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১৩

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

অপ্রকাশঃ—অজ্ঞান-অন্ধকার; **অপ্রবৃত্তিঃ**—নিষ্ক্রিয়তা; **চ**—এবং; **প্রমাদঃ**—উন্মত্ততা; **মোহঃ**—মোহ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **তমসি**—তমোগুণ; **এতানি**—এই সমস্ত; **জায়ন্তে**—উৎপন্ন হয়; **বিবৃদ্ধে**—বর্ধিত হলে; **কুরুনন্দন**—হে কুরুনন্দন।

গীতার গান

অপ্রকাশ অপ্রবৃত্তি মোহ তমোর লক্ষণ ।
বিবিধ গুণের কার্য হে কুরুনন্দন ॥

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বর্ধিত হলে অজ্ঞান-অন্ধকার, নিষ্ক্রিয়তা, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে আলোকোন্মেষ না হলে জ্ঞানের অনুপস্থিতি ঘটে। তামসিক মানুষ বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কখনই কর্ম করে না; সে নিজের খেয়াল-খুশি মতো উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে আচরণ করে। যদিও তার কাজ করার ক্ষমতা আছে, তবুও সে কোন রকম প্রচেষ্টা করে না। তাকে বলা হয় মোহ। যদিও তার চেতনা আছে, তবুও তার জীবন নিষ্ক্রিয়। এগুলি হচ্ছে তমোগুণ-সম্পন্ন মানুষের লক্ষণ।

শ্লোক ১৪

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন; **সত্ত্বে**—সত্ত্বগুণ; **প্রবৃদ্ধে**—বর্ধিত হলে; **তু**—কিন্তু; **প্রলয়ম্**—প্রলয়; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **দেহভৃৎ**—দেহধারী জীব; **তদা**—তখন; **উত্তমবিদাম্**—মহর্ষিদের; **লোকান্**—লোকসমূহ; **অমলান্**—নির্মল; **প্রতিপদ্যতে**—লাভ করেন।

গীতার গান

প্রবৃদ্ধ যে সত্ত্বগুণে দেহের প্রলয় ।
নিষ্পাপ উত্তম লোক তাঁর প্রাপ্তি হয় ॥

অনুবাদ

যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কালে দেহধারী জীব দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি মহর্ষিদের নির্মল উচ্চতর লোকসমূহ লাভ করেন।

তাৎপর্য

সাত্ত্বিক লোকেরা ব্রহ্মলোক বা জনলোক আদি উচ্চতর গ্রহলোকে গমন করেন এবং সেখানে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। এখানে *অমলান্* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে 'রজ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত'। জড় জগৎ পাপময়, কিন্তু সত্ত্বগুণ হচ্ছে জড় জগতের সবচেয়ে নিষ্পাপ অবস্থা। নানা রকম জীবের জন্য নানা রকম গ্রহলোক আছে। সত্ত্বগুণে যাঁদের মৃত্যু হয়, তাঁরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হন, যেখানে মহাঋষি ও মহান ভক্তেরা বাস করেন।

শ্লোক ১৫

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

রজসি—রজোগুণে; **প্রলয়ম্**—মৃত্যু; **গত্বা**—প্রাপ্ত হলে; **কর্মসঙ্গিষু**—কর্মাসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে; **জায়তে**—জন্ম হয়; **তথা**—তেমনই; **প্রলীনঃ**—মৃত্যু হলে; **তমসি**—তমোগুণে; **মূঢ়যোনিষু**—পশুযোনিতে; **জায়তে**—জন্ম হয়।

গীতার গান

প্রবৃদ্ধ সে রজোগুণে দেহের নির্বাণ ।
কর্মীর সঙ্গেতে হয় তার অনুষ্ঠান ॥
প্রবৃদ্ধ যে তমোগুণে শরীর ছাড়য় ।
মূঢ় পশুযোনি মধ্যে তার জন্ম হয় ॥

অনুবাদ

রজোগুণে মৃত্যু হলে কর্মাসক্ত মনুষ্যকুলে জন্ম হয়, তেমনই তমোগুণে মৃত্যু হলে পশুযোনিতে জন্ম হয়।

তাৎপর্য

কিছু লোক মনে করে যে, মনুষ্য-জীবন লাভ করলে আর অধঃপতন হয় না। এই ধারণা ভ্রান্ত। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে জীবন যাপন করে, তা হলে মৃত্যুর পরে তার আত্মা অধঃপতিত হয়ে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থা থেকে তাঁকে আবার ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এক শরীর থেকে আর এক শরীর প্রাপ্ত হতে হতে অবশেষে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হতে হবে। তাই, মনুষ্য-শরীরের গুরুত্ব যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁদের উচিত সাত্ত্বিক আচরণ করা এবং সাধুসঙ্গে এই গুণগুলি অতিক্রম করে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া। সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। তা না হলে মানুষ যে আবার মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই।

শ্লোক ১৬

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

কর্মণঃ—কর্মের; **সুকৃতস্য**—সুকৃতি-সম্পন্ন; **আহুঃ**—বলা হয়; **সাত্ত্বিকম্**—সাত্ত্বিক; **নির্মলম্**—নির্মল; **ফলম্**—ফলকে; **রজসঃ**—রাজসিক কর্মের; **তু**—কিন্তু; **ফলম্**—ফলকে; **দুঃখম্**—দুঃখ; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান; **তমসঃ**—তামসিক কর্মের; **ফলম্**—ফলকে।

গীতার গান

সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম ফল সে নির্মল।
রাজসিক কর্মে হয় দুঃখই প্রবল ॥
তামসিক কর্ম যত হয় অচেতন।
অজ্ঞানতা ফল সেই পশুতে গণন ॥

অনুবাদ

সুকৃতি-সম্পন্ন সাত্ত্বিক কর্মের ফলকে নির্মল, রাজসিক কর্মের ফলকে দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফলকে অজ্ঞান বা অচেতন বলা হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণে পুণ্যকর্ম করার ফলে মন পবিত্র হয়। তাই, সব রকমের মোহ থেকে মুক্ত মুনি-ঋষিরা সর্বদাই আনন্দময়। কিন্তু রাজসিক কর্ম কেবল ক্লেশদায়ক। জড় সুখের জন্য যে প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন, তা পরিণামে ব্যর্থ হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি কেউ গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি করতে চায়, তা হলে সেটি তৈরি করবার জন্য বহু মানুষকে বহু রকম ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। বাড়িটি যে তৈরি করছে তাকে কত কষ্ট করে প্রচুর অর্থ যোগাড় করতে হয়। যাদের দিয়ে সে বাড়ি তৈরির কাজ করছে, তাদের কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়। এই জড় জগতে সমস্ত কর্মের পিছনেই রয়েছে ক্লেশ। এভাবেই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, রজোগুণের প্রভাবে যে কার্যই করা হোক না কেন, তাতে সুনিশ্চিতভাবে বিপুল দুঃখ জড়িয়ে রয়েছে। তাতে হয়ত তথাকথিত একটুখানি মানসিক সুখ থাকতে পারে—"এই বাড়িটি আমার অথবা এই ধনসম্পদ আমার"—কিন্তু এটি যথার্থ সুখ নয়।

তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে কর্ম করে, সে অজ্ঞান এবং তার সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপ সে বর্তমানে দুঃখভোগ করে এবং ভবিষ্যতে পশুজন্ম প্রাপ্ত হয়। পশুজীবন সর্বদাই দুঃখময়, কিন্তু মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন থাকার ফলে পশুরা সেটি

অবশ্য বুঝতে পারে না। তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকার ফলেই মানুষ নিরীহ পশুদের হত্যা করে। পশুঘাতক জানে না যে, ভবিষ্যতে সেই পশুগুলি উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়ে তাদের হত্যা করবে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। মানব-সমাজে কেউ যদি কোন মানুষকে হত্যা করে, তা হলে তার ফাঁসি হয়। সেটিই হচ্ছে রাষ্ট্রের নিয়ম। অজ্ঞতার ফলে মানুষ বুঝতে পারে না যে, পরমেশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি পূর্ণ রাজ্য আছে। প্রতিটি প্রাণীই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তান এবং একটি পিঁপড়ে হত্যা করা হলেও তিনি সেটি বরদাস্ত করেন না। সেই জন্য আমাদের মাশুল দিতে হবে। তাই, রসনা তৃপ্তির জন্য পশুহত্যা করা নিকৃষ্টতম অজ্ঞতা। মানুষের পক্ষে পশুহত্যা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ মানুষের জন্য ভগবান কত সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি পশুমাংস আহারে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে কর্ম করছে এবং তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছে। সব রকম পশুহত্যার মধ্যে গোহত্যা হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম কার্য, কারণ দুধ দান করে গরু আমাদের সব রকমের আনন্দ দান করে। গোহত্যা হচ্ছে সব রকমের পাপকর্মের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ। বৈদিক শাস্ত্রে (*ঋক্ বেদ* ৯/৪/৬৪) *গোভিঃ প্রীণিতমৎসরম্* কথাটি ইঙ্গিত করে যে, গরুর দুধের দ্বারা সর্বতোভাবে প্রীতি লাভ করবার পরেও যে মানুষ গোহত্যা করতে চায়, সে অত্যন্ত গভীরভাবে তমসাচ্ছন্ন। বৈদিক শাস্ত্রে একটি প্রার্থনায় বলা হয়েছে—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

"হে ভগবান! তুমি গাভী ও ব্রাহ্মণদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তুমি সমগ্র মানব-সমাজ ও সমগ্র জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী।" (*বিষ্ণু পুরাণ* ১/১৯/৬৫) এই প্রার্থনায় গাভী ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতীক এবং গাভী হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান খাদ্যের প্রতীক। গাভী ও ব্রাহ্মণ এই দুই প্রকার প্রাণীদের সব রকম প্রতিরক্ষা বিধান করা উচিত। সেটিই হচ্ছে সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। আধুনিক মানব-সমাজে পারমার্থিক জ্ঞানকে অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং গোহত্যার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে যে, মানব-সমাজ বিপথগামী হচ্ছে এবং তার নিজের উৎসন্নের পথটি ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত হচ্ছে। যে সভ্যতা মানুষকে পরবর্তী জীবনে পশুতে পরিণত হওয়ার পথে পরিচালিত করে, সেটি অবশ্যই মানব-সভ্যতা নয়। বর্তমান মানব-সভ্যতা অবশ্যই রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দ্রুত গতিতে বিপথগামী হচ্ছে। এটি অত্যন্ত

ভয়ংকর যুগ এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে, মানব-সমাজকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের অতি সাবলীল পন্থা প্রচলন করতে যত্নশীল হওয়া।

শ্লোক ১৭

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বাৎ—সত্ত্বগুণ থেকে; **সংজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **রজসঃ**—রজোগুণ থেকে; **লোভঃ**—লোভ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **প্রমাদ**—প্রমাদ; **মোহৌ**—মোহ; **তমসঃ**—তমোগুণ থেকে; **ভবতঃ**—উৎপন্ন হয়; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও।

গীতার গান

সত্ত্বগুণে জ্ঞানলাভ রজোগুণে লোভ ।
তমোগুণে মোহলাভ প্রমাদ বিক্ষোভ ॥

অনুবাদ

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

বর্তমান সভ্যতা যেহেতু জীবের পক্ষে খুব একটা উপযোগী নয়, তাই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজে সত্ত্বগুণের বিকাশ হবে। যখন সত্ত্বগুণ বিকশিত হয়, তখন মানুষ বস্তুকে যথাযথভাবে দর্শন করতে সক্ষম হবে। তামসিক পর্যায়ে মানুষ হয়ে যায় পশুর মতো এবং বস্তুকে স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারে না। যেমন, তামসিক মানুষ বুঝতে পারে না যে, পশুহত্যা করার মাধ্যমে তারাও পরবর্তী জীবনে সেই পশুর দ্বারাই নিহত হবার দুর্ভাগ্য অর্জন করছে। কারণ মানুষেরা প্রকৃত জ্ঞান অনুশীলনের শিক্ষা পায় না, তাই তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বন্ধ করার জন্য মানুষদের সত্ত্বগুণের বিকাশ করার শিক্ষা অতি আবশ্যক। তারা যখন যথাযথভাবে সত্ত্বগুণের শিক্ষা লাভ করবে, তখন তারা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে শান্ত হবে। মানুষ তখন সুখী ও সমৃদ্ধশালী হবে। এমন কি অধিকাংশ

মানুষ যদি সুখী ও সমৃদ্ধশালী না হয়, যদি সমাজের কিছুসংখ্যক লোকও কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়, তা হলেও সারা জগৎ জুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। তা না করে সমগ্র জগৎ যদি রজ ও তমোগুণের দাসত্ব বরণ করে নেয়, তা হলে শান্তি ও সমৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। রজোগুণে মানুষ লোভী হয় এবং তাদের ইন্দ্রিয়সুখ বাসনার কোন সীমা থাকে না। সেটি যে কেউ উপলব্ধি করতে পারে যে, এমন কি প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের নানা রকম বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও মানুষের আজ না আছে সুখ, না আছে মনের শান্তি। সেটি থাকা সম্ভব নয়, কারণ তারা রজোগুণে অধিষ্ঠিত। কেউ যদি যথার্থ সুখ পেতে চায়, সেই ব্যাপারে টাকা তাকে সাহায্য করতে পারবে না; কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে তাকে সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে হবে। কেউ যখন রাজসিক কর্মে নিয়োজিত থাকে, তখন সে যে কেবল মানসিক অশান্তিই ভোগ করে তাই নয়, তার পেশা এবং বৃত্তিও অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয়। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে তার পদমর্যাদা বজায় রাখবার জন্য তাকে কত রকমের পরিকল্পনা ও উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। এই সমস্তই ক্লেশদায়ক। তমোগুণে মানুষ উন্মাদ হয়ে ওঠে। তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিদারুণ দুঃখভোগ করে তারা মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এভাবেই তারা অজ্ঞতার আরও গভীরতম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

শ্লোক ১৮

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

ঊর্ধ্বম্—ঊর্ধ্বে; **গচ্ছন্তি**—গমন করে; **সত্ত্বস্থাঃ**—সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ; **মধ্যে**—মধ্যে; **তিষ্ঠন্তি**—অবস্থান করে; **রাজসাঃ**—রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ; **জঘন্য**—ঘৃণ্য; **গুণ**—গুণ; **বৃত্তিস্থাঃ**—বৃত্তিসম্পন্ন; **অধঃ**—নিম্নে; **গচ্ছন্তি**—গমন করে; **তামসাঃ**—তামসিক ব্যক্তিগণ।

গীতার গান

সত্যলোকাবধি লোক যায় সত্ত্বগুণে ।
রজোগুণ দ্বারা নরলোকে অবস্থান ॥
তমোগুণে অধঃপাত নরকে গমন ।
বিবিধ গুণের সেই ফল নিরূপণ ॥

অনুবাদ

সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উর্ধ্বে উচ্চতর লোকে গমন করে, রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মধ্যে নরলোকে অবস্থান করে এবং জঘন্য গুণসম্পন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে প্রকৃতির তিনটি গুণে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলগুলি আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জগতের উর্ধ্বে স্বর্গলোক আছে, যেখানে সকলেই অত্যন্ত উন্নত। সত্ত্বগুণের মাত্রা অনুসারে জীব এই উচ্চতর লোকসমূহের ভিন্ন ভিন্ন লোকে উন্নীত হয়। সর্বোচ্চলোক হচ্ছে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক, যেখানে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান পুরুষ ব্রহ্মা বাস করেন। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, ব্রহ্মলোকের অতি আশ্চর্যজনক জীবনযাত্রার কোন হিসেব-নিকেশ আমরা করতে পারি না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ অবস্থা সত্ত্বগুণ আমাদের সেই স্তরে উন্নীত করতে পারে।

রজোগুণ হচ্ছে মিশ্রিত। এটি সত্ত্ব ও তমোগুণের অন্তর্বর্তী। মানুষ কখনও সর্বতোভাবে নির্মল হতে পারে না। কিন্তু সে যদি সম্পূর্ণভাবে রজোগুণে থাকে, তা হলে সে কেবল একজন রাজা অথবা একজন ধনী ব্যক্তিরূপে এই পৃথিবীতে অবস্থান করবে। কিন্তু মিশ্রিত হওয়ার ফলে মানুষ নিম্নগামী হতে পারে। এই জগতে রাজসিক বা তামসিক মানুষেরা যন্ত্রের সাহায্যে জোর করে উচ্চতর লোকে যেতে পারে না। রজোগুণের প্রভাবে পরবর্তী জীবনে উন্মাদ হয়ে যাবারও সম্ভাবনা থাকে।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট তমোগুণকে এখানে জঘন্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফল অত্যন্ত বিপজ্জনক। এটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতির সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুণ। মনুষ্য-জন্মের নীচে পক্ষী, পশু, সরীসৃপ, বৃক্ষ আদি আশি লক্ষ প্রজাতি রয়েছে এবং তমোগুণের প্রভাব অনুসারে মানুষ সেই সমস্ত জঘন্য অবস্থায় পতিত হয়। এখানে *তামসাঃ* কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে উচ্চতর গুণে উন্নীত না হয়ে যারা সর্বদাই তমোগুণে অধিষ্ঠিত থাকে। তাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

রাজসিক ও তামসিক মানুষেরা যাতে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে পারে, তার একটি সুযোগও আছে। সেই প্রক্রিয়া হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন। কিন্তু যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, সে অবশ্যই নিকৃষ্ট গুণে আচ্ছন্ন হয়েই থাকবে।

শ্লোক ১৯

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

ন—না; **অন্যম্**—অন্য; **গুণেভ্যঃ**—গুণসমূহ থেকে; **কর্তারম্**—কর্তাকে; **যদা**—যখন; **দ্রষ্টা**—দ্রষ্টা; **অনুপশ্যতি**—দেখেন; **গুণেভ্যঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ থেকে; **চ**—এবং; **পরম্**—গুণাতীত; **বেত্তি**—জানেন; **মদ্ভাবম্**—আমার পরা প্রকৃতি; **সঃ**—তিনি; **অধিগচ্ছতি**—লাভ করেন।

গীতার গান

গুণ ভিন্ন অন্য কর্তা নাহি ত্রিভুবনে ।
সূক্ষ্ম দর্শন যার গুণ নিরূপণে ॥
গুণাতীত মোর ভক্তি আমার সে ভাব ।
স্বরূপেতে শুদ্ধ জীব প্রাপ্ত সে স্বভাব ॥

অনুবাদ

জীব যখন দর্শন করেন যে, প্রকৃতির গুণসমূহ ব্যতীত কর্মে অন্য কোন কর্তা নেই এবং জানতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত গুণের অতীত, তখন তিনি আমার পরা প্রকৃতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের কাছ থেকে জড়া প্রকৃতির গুণগুলি সম্বন্ধে যথার্থভাবে অবগত হওয়ার ফলে গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া যায়। প্রকৃত গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং এই দিব্যজ্ঞান তিনি অর্জুনকে দান করেছেন। তেমনই, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তাঁদের কাছ থেকেই প্রকৃতির গুণের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম সম্বন্ধীয় এই বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করা উচিত। তা না হলে জীবন বিপথগামী হবে। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে জীব তার চিন্ময় স্বরূপ, জড় দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বদ্ধ অবস্থা ও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। এই সমস্ত গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে সে অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যখন তার যথার্থ স্বরূপ দর্শন করতে পারে, তখন সে পারমার্থিক জীবন লাভ করার সুযোগ পেয়ে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, জীব তার বিভিন্ন কর্মের কর্তা নয়। জড়া প্রকৃতির কোন বিশেষ গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন বিশেষ শরীরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সে কর্ম করতে বাধ্য হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে কোন মতেই অবগত হতে পারে না। সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভ করার ফলে সে তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং তার ফলে সে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে। কৃষ্ণভক্ত জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত হন না। সপ্তম অধ্যায়ে ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যিনি আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত। তাই যিনি যথাযথভাবে সব কিছু দর্শন করতে পারেন, তিনি ধীরে ধীরে জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২০

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

গুণান্—গুণকে; **এতান্**—এই; **অতীত্য**—অতিক্রম করে; **ত্রীন্**—তিন; **দেহী**—জীব; **দেহ**—দেহে; **সমুদ্ভবান্**—উৎপন্ন; **জন্ম**—জন্ম; **মৃত্যু**—মৃত্যু; **জরা**—জরা; **দুঃখৈঃ**—দুঃখ থেকে; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **অমৃতম্**—অমৃত; **অশ্নুতে**—ভোগ করেন।

গীতার গান

গুণাতীত হতে দেহী গুণদেহ ছাড়ে ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ বাঁধে না তাঁহারে ॥

অনুবাদ

দেহধারী জীব এই তিন গুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে অমৃত ভোগ করেন।

তাৎপর্য

এই জড় শরীরে থাকা সত্ত্বেও শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে কিভাবে গুণাতীত অবস্থায় থাকতে পারা যায় তা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। সংস্কৃত *দেহী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'দেহধারী'। এই জড় দেহ থাকলেও দিব্যজ্ঞান লাভ করার ফলে মানুষ প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। এমন কি এই দেহের

মধ্যে তিনি দিব্য জীবনের চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, কারণ এই দেহ ত্যাগ করার পর তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে ফিরে যাবেন। কিন্তু এমন কি এই দেহের মধ্যে তিনি দিব্য আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভক্তিযোগে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়াই হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষণ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সেই কথা ব্যাখ্যা করা হবে। কোন মানুষ যখন জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

শ্লোক ২১

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **কৈঃ**—কি কি; **লিঙ্গৈঃ**—লক্ষণ দ্বারা; **ত্রীন্**—তিন; **গুণান্**—গুণ; **এতান্**—এই; **অতীতঃ**—অতীত; **ভবতি**—হন; **প্রভো**—হে প্রভু; **কিম্**—কি রকম; **আচারঃ**—আচরণ; **কথম্**—কিভাবে; **চ**—ও; **এতান্**—এই; **ত্রীন্**—তিন; **গুণান্**—গুণ; **অতিবর্ততে**—অতিক্রম করেন।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

কি লক্ষণ কহ প্রভো গুণাতীত হলে।
আচরণ কিবা হয় ত্রিগুণ জিতিলে ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু! যিনি এই তিন গুণের অতীত, তিনি কি কি লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত হন? তাঁর আচরণ কি রকম? এবং তিনি কিভাবে এই তিন গুণ অতিক্রম করেন?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নগুলি খুবই যুক্তিসঙ্গত। তিনি জানতে চাইছেন, যে মানুষ ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির গুণগুলি থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁর লক্ষণ কি? প্রথমে

তিনি এই ধরনের দিব্য পুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন। কিভাবে জানতে পারা যাবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন? দ্বিতীয় প্রশ্নে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি কি রকম জীবন যাপন করেন এবং তাঁর কাজকর্ম কি রকম। সেগুলি কি নিয়ন্ত্রিত না অনিয়ন্ত্রিত? তারপর অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, কি উপায়ে দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার সরাসরি উপায় সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত না অবগত হওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই লক্ষণগুলি প্রদর্শন করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং, অর্জুনের এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভগবান নিজেই সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছেন।

শ্লোক ২২-২৫

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রকাশম্**—প্রকাশ; **চ**—ও; **প্রবৃত্তিম্**—প্রবৃত্তি; **চ**—ও; **মোহম্**—মোহ; **এব চ**—ও; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডুপুত্র; **ন দ্বেষ্টি**—দ্বেষ করেন না; **সংপ্রবৃত্তানি**—আবির্ভূত হলে; **ন**—না; **নিবৃত্তানি**—নিবৃত্ত হলে; **কাঙ্ক্ষতি**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **উদাসীনবৎ**—উদাসীনের মতো; **আসীনঃ**—অবস্থিত; **গুণৈঃ**—গুণসমূহের দ্বারা; **যঃ**—যিনি; **ন**—না; **বিচাল্যতে**—বিচলিত হন; **গুণাঃ**—গুণসমূহ; **বর্তন্তে**—স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হন; **ইতি এবম্**—এভাবেই জেনে; **যঃ**—যিনি; **অবতিষ্ঠতি**—অবস্থান করেন; **ন**—না; **ইঙ্গতে**—চঞ্চল হন; **সম**—সমভাবাপন্ন; **দুঃখ**—দুঃখ; **সুখঃ**—সুখ; **স্বস্থঃ**—আত্মস্বরূপে অবস্থিত; **সম**—সমভাবাপন্ন; **লোষ্ট্র**—মাটির ঢেলা; **অশ্ম**—পাথর; **কাঞ্চনঃ**—স্বর্ণ; **তুল্য**—সম-ভাবাপন্ন;

প্রিয়—প্রিয়; অপ্রিয়ঃ—অপ্রিয়; ধীরঃ—ধৈর্যশীল; তুল্য—তুল্যজ্ঞান; নিন্দা—নিন্দা; আত্মসংস্তুতিঃ—নিজের প্রশংসা; মান—সম্মান; অপমানয়োঃ—অসম্মান; তুল্যঃ—সম-ভাবাপন্ন; তুল্যঃ—সমজ্ঞান-সম্পন্ন; মিত্র—বন্ধু; অরি—শত্রু; পক্ষয়োঃ—দলে; সর্ব—সমস্ত; আরম্ভ—প্রচেষ্টা; পরিত্যাগী—পরিত্যাগী; গুণাতীতঃ—জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; সঃ—তিনি; উচ্যতে—কথিত হন।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

প্রকাশ প্রবৃত্তি আর মোহন যে তিন।
গুণের প্রভাব সেই হয় ভিন্ন ভিন্ ॥
তাহাতে যে দ্বেষাকাঙ্ক্ষা ছাড়িল জীবনে।
গুণাতীত হয় সেই বুঝ ত্রিভুবনে ॥
গুণকার্যে উদাসীন মতো যে আসীন।
বিচলিত নহে তাহে প্রবৃদ্ধ প্রবীণ ॥
অনাসক্ত গুণকার্যে যেবা হয় ধীর।
সম দুঃখ সুখ স্বস্থঃ লোষ্ট্র স্বর্ণ স্থির ॥
তুল্য প্রিয়াপ্রিয় তার তুল্য নিন্দাস্তুতি।
তুল্য মান অপমান শত্রু মিত্র অতি ॥
ভোগ ত্যাগাদিতে নহে সে আসক্ত।
গুণাতীত হয় সেই নির্গুণেতে যুক্ত ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পাণ্ডব! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হলে দ্বেষ করেন না এবং সেগুলি নিবৃত্ত হলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনের মতো অবস্থিত থেকে গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না, কিন্তু গুণসমূহ স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, এভাবেই জেনে অবস্থান করেন এবং তার দ্বারা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন না; যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত এবং সুখ ও দুঃখে সম-ভাবাপন্ন; যিনি মাটির ঢেলা, পাথর ও স্বর্ণে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন; যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সম-ভাবাপন্ন; যিনি ধৈর্যশীল এবং নিন্দা, স্তুতি, মান ও অপমানে সম-ভাবাপন্ন; যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমভাব-সম্পন্ন এবং যিনি সমস্ত কর্মোদ্যম পরিত্যাগী—তিনিই গুণাতীত বলে কথিত হন।

তাৎপর্য

অর্জুন তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং ভগবান একে একে সেগুলির উত্তর দিচ্ছেন। এই শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি কারও প্রতি দ্বেষযুক্ত নন এবং তিনি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। জীব যখন জড় দেহে আবদ্ধ হয়ে এই জড় জগতে অবস্থান করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে এই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের কোনও একটির নিয়ন্ত্রণাধীন। সে যখন দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকেও মুক্ত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারছে, ততক্ষণ তাকে গুণের প্রভাবের প্রতি উদাসীন থাকতে হবে। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় তাকে নিযুক্ত হতে হবে, যাতে জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয়ের কথা সে আপনা থেকেই ভুলে যেতে পারে। কেউ যখন তার জড় দেহের চেতনায় যুক্ত থাকে, তখন সে কেবল তার ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কর্ম করে। কিন্তু সেই চেতনা যখন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়তর্পণ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। এই জড় দেহের কোন প্রয়োজন নেই এবং এই জড় দেহের আদেশ পালন করারও কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। দেহে অবস্থিত প্রকৃতির গুণগুলি কর্ম করে যাবে, কিন্তু চিন্ময় সত্তারূপে আত্মা এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে পৃথক। তিনি পৃথক হন কিভাবে? তিনি জড় দেহটিকে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা এই দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন না। এভাবেই গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই মুক্ত হন। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁকে কোন রকম চেষ্টা করতে হয় না।

পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ দেহ সম্বন্ধীয় তথাকথিত সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এই ধরনের মিথ্যা সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কৃষ্ণভাবনায় বিভোর হয়ে তিনি তাঁর কর্ম করে যান এবং মানুষ তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করল না অসম্মান করল, তার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করবার পক্ষে যা অনুকূল, তা তিনি গ্রহণ করেন। তা ছাড়া পাথর হোক বা সোনাই হোক, তার কোন জড় বস্তুর দরকার হয় না। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেন, তাঁদের সকলকেই তিনি প্রিয় বন্ধু বলে মনে করেন এবং তাঁর তথাকথিত শত্রুকেও তিনি ঘৃণা করেন না। তিনি সকলের প্রতি সম-ভাবাপন্ন এবং সব কিছুই

তিনি সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। কারণ, তিনি ভাল মতেই জানেন যে, জড়-জাগতিক জীবনে তাঁর কিছুই করবার নেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি তাকে প্রভাবিত করে না। কারণ, তিনি সামাজিক উত্থান ও গোলযোগের অনিত্যতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত। তাঁর নিজের জন্য তিনি কোন প্রচেষ্টা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন, কিন্তু তাঁর নিজের জন্য তিনি কোন কিছু করেন না। এই রকম আচরণের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারা যায়।

শ্লোক ২৬

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

মাম্—আমাকে; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **অব্যভিচারেণ**—ঐকান্তিক; **ভক্তিযোগেন**—ভক্তিযোগ দ্বারা; **সেবতে**—সেবা করেন; **সঃ**—তিনি; **গুণান্**—প্রকৃতির গুণকে; **সমতীত্য**—অতিক্রম করে; **এতান্**—এই সমস্ত; **ব্রহ্মভূয়ায়**—ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত; **কল্পতে**—হন।

গীতার গান

ত্রিগুণের অতিক্রমে যে কার্য করয় ।
সেই সে আমার ভক্তি জানহ নিশ্চয় ॥
যে অব্যভিচারী ভক্তি আমাতে করয় ।
জড় গুণ অতিক্রমে ব্রহ্মভূত হয় ॥

অনুবাদ

যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি হচ্ছে অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন—নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার উপায় কি তার উত্তর। পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে। তাই, জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে বিচলিত হওয়া উচিত

নয়। তাঁর চেতনাকে এই সমস্ত কার্যকলাপে মনোনিবেশ না করে শ্রীকৃষ্ণের সেবামূলক কার্যে নিযুক্ত করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সেবামূলক কাজকে বলা হয় ভক্তিযোগ—শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্বদাই কর্ম করা। কৃষ্ণভক্তি বলতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবাই বোঝায় না, রাম, নারায়ণ আদি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বাংশ-প্রকাশের সেবাও বোঝায়। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য স্বাংশ-প্রকাশ আছে। যিনি তাঁদের যে কোন একটি রূপের সেবা করেন, তিনি নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এটিও জেনে রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণের সব কয়টি রূপই সম্পূর্ণরূপে গুণাতীত এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। ভগবানের এই সমস্ত প্রকাশ সর্ব শক্তিসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ এবং তাঁরা সব রকম দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত। সুতরাং, কেউ যখন দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁর স্বাংশ-প্রকাশের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন, যদিও জড়া প্রকৃতির গুণগুলি অতিক্রম করা অসম্ভব, তবুও তিনি অনায়াসে তাদের অতিক্রম করতে পারেন। সপ্তম অধ্যায়ে সেই কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন। কৃষ্ণভাবনায় বা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মতো হওয়া। ভগবান বলছেন যে, তাঁর স্বরূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় এবং জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্নাংশ, ঠিক যেমন সোনার কণা সোনার খনির অংশ। এভাবেই জীবের চিন্ময় স্বরূপ গুণগতভাবে সোনার মতো, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মতো গুণসম্পন্ন। জীব ও ভগবানের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে। তা না হলে ভক্তিযোগের কোন প্রশ্নই হতে পারে না। ভক্তিযোগের অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান আছেন, ভগবানের ভক্ত আছেন এবং ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেম বিনিময়ের ক্রিয়াকলাপও আছে। তাই, পরম পুরুষোত্তম ভগবান ও জীব এই দুজন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যই বর্তমান। তা না হলে ভক্তিযোগের কোন অর্থই হয় না। যে অপ্রাকৃত স্তরে ভগবান রয়েছেন, সেই স্তরে যদি উন্নীত না হওয়া যায়, তা হলে ভগবানের সেবা করা সম্ভব নয়। রাজার সচিব হতে হলে তাঁকে উপযুক্ত গুণ অর্জন করতে হয়। এভাবেই সেই গুণ হচ্ছে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া অথবা সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি*। ব্রহ্মে পর্যবসিত হওয়ার মাধ্যমে পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ, গুণগতভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হতে হবে। ব্রহ্মস্তর প্রাপ্ত হলে, একজন স্বতন্ত্র আত্মারূপে জীব তার শাশ্বত ব্রহ্ম পরিচয় হারিয়ে ফেলে না।

শ্লোক ২৭

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মণঃ—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির; **হি**—অবশ্যই; **প্রতিষ্ঠা**—আশ্রয়; **অহম্**—আমি; **অমৃতস্য**—অমৃতের; **অব্যয়স্য**—অব্যয়; **চ**—ও; **শাশ্বতস্য**—নিত্য; **চ**—এবং; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **সুখস্য**—সুখের; **ঐকান্তিকস্য**—ঐকান্তিক; **চ**—ও।

গীতার গান

ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি অমৃত শাশ্বত ।
আনন্দ যে সনাতন আমাতে নিহিত ॥
আমার আশ্রয়ে সেই সকল সুলভ ।
অতএব মোর ভক্তি হয় সুদুর্লভ ॥

অনুবাদ

আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অব্যয় অমৃতের, শাশ্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আমিই আশ্রয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মের স্বরূপ হচ্ছে অমরত্ব, অবিনশ্বরত্ব, নিত্যত্ব ও আনন্দ। পরমার্থ উপলব্ধির প্রথম স্তর হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধি, দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে পরমাত্মার উপলব্ধি এবং পরম-তত্ত্বের চরম স্তরের উপলব্ধি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি। তাই, পরমাত্মা ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম এই উভয় তত্ত্বই হচ্ছে পরম পুরুষ ভগবানের অধীন তত্ত্ব। সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তির প্রকাশ। ভগবান তাঁর পরা শক্তির কণিকাসমূহের দ্বারা অনুৎকৃষ্টা জড়া প্রকৃতিকে সক্রিয় করেন এবং সেটিই হচ্ছে জড়া প্রকৃতিতে চেতনের প্রকাশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীব যখন পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন শুরু করেন, তখন তিনি জড় অস্তিত্ব থেকে ধীরে ধীরে পরম-তত্ত্বের ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হন। জীবের এই ব্রহ্মভূত অবস্থা হচ্ছে আত্মজ্ঞানের প্রথম স্তর। এই স্তরে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জড় অবস্থার অতীত, কিন্তু তিনি পূর্ণরূপে ব্রহ্ম-উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি যদি চান, তা হলে তিনি এই ব্রহ্মভূত অবস্থাতেই থাকতে পারেন এবং তারপর ধীরে ধীরে পরমাত্মা উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং তারপর পরম

পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে তার অনেক নিদর্শন আছে। চতুঃসন বা চার কুমারেরা প্রথমে নির্বিশেষ ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন। যিনি ব্রহ্মের নিরাকার নির্বিশেষ উপলব্ধির ঊর্ধ্বে উন্নীত হতে পারেননি, তাঁর সর্বদাই অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্তরে উপনীত হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি আর অগ্রসর না হন, পরম পুরুষ ভগবানের তথ্য তিনি যদি না জানেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর চিত্ত পূর্ণরূপে নির্মল হয়নি। সুতরাং, ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়ার পরেও পতনের সম্ভাবনা থাকে। বৈদিক শাস্ত্রে এটিও বলা হয়েছে, *রসো বৈ সঃ রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি*—"কেউ যখন পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত রসের আধার বলে জানতে পারেন, তখন তিনি দিব্য আনন্দময় হতে পারেন।" (*তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ২/৭/১) পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং ভক্ত যখন তাঁর সমীপবর্তী হন, তখন এই ষড়ৈশ্বর্যের বিনিময় হয়। রাজার সেবক রাজার সঙ্গে প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন, তেমনই ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলে শাশ্বত আনন্দ, অক্ষয় সুখ ও নিত্য জীবন লাভ করা যায়। তাই, ব্রহ্ম-উপলব্ধি অথবা নিত্যত্ব অথবা অবিনশ্বরত্ব ভক্তিযুক্ত ভগবানের সেবার অন্তর্বর্তী। ভক্তিযোগে যিনি ভগবানের সেবা করছেন, তিনি এই সব কয়টি গুণেরই অধিকারী।

জীব যদিও প্রকৃতিগতভাবে ব্রহ্ম, তবুও জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য করবার বাসনা তার রয়েছে এবং তার ফলে সে অধঃপতিত হয়। তার স্বরূপে জীব জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। কিন্তু জড় প্রকৃতির সংস্রবে আসার ফলে সে সত্ত্ব, রজ ও তম—প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই তিনটি গুণের সংসর্গের ফলে জড় জগতের উপর আধিপত্য করবার বাসনার উদয় হয়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হবার ফলে সে তৎক্ষণাৎ গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয় এবং জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বিধি-বহির্ভূত বাসনা দূর হয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তির পন্থা, যা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদির মাধ্যমে শুরু হয়, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি উপলব্ধির জন্য অনুমোদিত নবধা ভক্তির অঙ্গ ভক্তসঙ্গে অনুশীলন করা উচিত। এই প্রকার সঙ্গ করার ফলে, সদ্‌গুরুর প্রভাবে ধীরে ধীরে আধিপত্য করার জড় বাসনাগুলি দূর হয়। তখন ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে নিযুক্ত হওয়া যায়। এই অধ্যায়ের বাইশ থেকে শুরু করে শেষ শ্লোক পর্যন্ত সব কয়টি শ্লোকে এই পন্থার অনুশীলন করার উপদেশ দেওয়া

হয়েছে। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করা অত্যন্ত সরল। এতে কেবল সর্বদা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে হয়, শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করতে হয়, ভগবানের চরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে হয়, ভগবান যে সমস্ত স্থানে তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাস করেছেন, সেই স্থানগুলি দর্শন করতে হয়, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন লীলাসমূহ পাঠ করতে হয়, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে প্রীতিমূলক ভাবের আদান-প্রদান করতে হয়, সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—জপ-কীর্তন করতে হয় এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিগুলিতে উপবাস পালন করতে হয়। এই পন্থা অনুশীলন করার ফলে জড় কার্যকলাপের বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া যায়। এভাবেই যিনি ব্রহ্মজ্যোতিতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, তিনি গুণগতভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ বৈশিষ্ট্য বিষয়ক 'গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ঊর্ধ্বমূলম্—ঊর্ধ্বমূল; অধঃ—নিম্নমুখী; শাখম্—শাখাবিশিষ্ট; অশ্বত্থম্—অশ্বত্থ বৃক্ষ; প্রাহুঃ—বলা হয়েছে; অব্যয়ম্—নিত্য; ছন্দাংসি—বৈদিক মন্ত্রসমূহ; যস্য—যার; পর্ণানি—পত্রসমূহ; যঃ—যিনি; তম্—সেই; বেদ—জানেন; সঃ—তিনি; বেদবিৎ—বেদজ্ঞ।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

বেদবাণী কর্মকাণ্ডী সংসার আশ্রয় ।
নানা যোনি প্রাপ্ত হয় কভু মুক্ত নয় ॥
সংসার যে বৃক্ষ সেই অশ্বত্থ অব্যয় ।
ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখা নাহি তার ক্ষয় ॥
পুষ্পিত বেদের ছন্দ সে ব্রহ্মের পত্র ।
মোহিত সে বেদবাক্য জগৎ সর্বত্র ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখা-বিশিষ্ট একটি অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষটিকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের গুরুত্ব আলোচনা করার পর কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তা হলে *বেদের* অর্থ কি? এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, *বেদ* অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। সুতরাং যিনি কৃষ্ণভাবনাময়, যিনি ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই *বেদের* পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করেছেন।

জড় জগতের বন্ধনকে এখানে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে সকাম কর্মে রত, তার কাছে এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির কোন শেষ নেই। সে এক ডাল থেকে আর এক ডালে, সেখান থেকে অন্য এক ডালে, আবার আর এক ডালে, এভাবেই সে ঘুরে বেড়ায়। এই জড় জগৎরূপী বৃক্ষটির কোন অন্ত নেই এবং যে এই বৃক্ষটির প্রতি আসক্ত, তার পক্ষে মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। মানুষকে ঊর্ধ্বমুখী করবার জন্য যে বৈদিক ছন্দ, তাকে এই বৃক্ষের পাতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৃক্ষের মূলটি ঊর্ধ্বমুখী, কারণ তার শুরু হয়েছে যেখানে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত সেখান থেকে, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ গ্রহলোক থেকে। কেউ যখন মায়াময় এই অব্যয় বৃক্ষটির সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন, তখন তিনি তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

মুক্ত হওয়ার এই পন্থাটিকে ভালভাবে উপলব্ধি করা উচিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার নানা রকম পন্থা বর্ণিত হয়েছে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, ভক্তিযোগে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এখন, ভক্তিযোগের মূল তত্ত্ব হচ্ছে জড়-জাগতিক কর্মে অনাসক্তি এবং ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার প্রতি আসক্তি। এই অধ্যায়ের শুরুতে জড় জগতের প্রতি আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করার পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় অস্তিত্বের মূল ঊর্ধ্বমুখী। তার অর্থ হচ্ছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোকে মহৎ-তত্ত্বের জড়-জাগতিক অস্তিত্ব থেকে তার শুরু হয়। সেখান থেকে গ্রহমণ্ডলরূপী বিভিন্ন শাখা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফল হচ্ছে জীবের কর্মফল, যেমন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

এখন এই জগতে এমন কোন গাছের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, যার শাখা নিম্নমুখী আর মূল ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু সেটি আছে। সেই গাছ দেখতে পাওয়া যায় একটি জলাশয়ের ধারে। আমরা দেখতে পাই যে, জলাশয়ের তীরের বৃক্ষগুলির শাখা নিম্নমুখী ও মূল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে জলে প্রতিবিম্বিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই জড় জগতের বৃক্ষটি হচ্ছে চিৎ-জগতের বাস্তব বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব। জলে যেমন বৃক্ষের ছায়া পড়ে, তেমনই চিৎ-জগতের ছায়া পড়ে আমাদের কামনার উপর। প্রতিবিম্বিত জড় আকাশে বস্তুর অবস্থিতির কারণ হচ্ছে কামনা-বাসনা। এই জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে যে মুক্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই বৃক্ষটি সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে হবে। তা হলে তার বন্ধন সে ছিন্ন করতে পারে।

এই বৃক্ষটি বাস্তব বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব হওয়ার ফলে, তার অবিকল প্রতিরূপ। চিৎ-জগতে সব কিছুই আছে। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, জড় জগৎরূপী বৃক্ষের মূল হচ্ছে ব্রহ্ম এবং সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী, সেই মূল থেকে প্রকৃতি ও পুরুষ, তারপর প্রকৃতির তিনটি গুণ, তারপর পঞ্চ-মহাভূত, তারপর দশেন্দ্রিয়, মন আদির প্রকাশ হয়। এভাবেই তারা সমস্ত জড় জগৎকে চব্বিশটি উপাদানে বিভক্ত করে। ব্রহ্ম যদি সমস্ত প্রকাশের কেন্দ্র হন, তা হলে এই জড় জগতের প্রকাশ হচ্ছে কেন্দ্র থেকে ১৮০ ডিগ্রী বা একটি অর্ধবৃত্ত এবং অপর ১৮০ ডিগ্রী বা অপর অর্ধাংশ হচ্ছে চিৎ-জগৎ। জড় জগৎ যদি বিকৃত প্রতিবিম্ব হয়, তা হলে চিৎ-জগতে অবশ্যই সেই একই ধরনের বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু তা রয়েছে বাস্তবভাবে। 'প্রকৃতি' হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এবং 'পুরুষ' হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রকাশ যেহেতু জড়, তাই তা অনিত্য, অস্থায়ী। প্রতিবিম্ব অস্থায়ী, কেন না কখনও কখনও তাকে দেখা যায়, আবার কখনও কখনও তাকে দেখা যায় না। কিন্তু তার উৎস, যেখান থেকে প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, তা নিত্য। জড় আকাশে সেই বৃক্ষের জড় প্রতিবিম্বটি কেটে বাদ দিতে হবে। যখন বলা হয় যে, কেউ *বেদ* সম্বন্ধে জানেন, তখন অনুমান করা হয় যে, এই জড় জগতের আসক্তি কিভাবে ছিন্ন করা যায়, তা তিনি জানেন। এই পন্থা যিনি জানেন, তিনি হচ্ছেন যথার্থ বেদজ্ঞ। *বেদের* কর্মকাণ্ডের প্রতি যে আকৃষ্ট, বুঝতে হবে সে বৃক্ষটির সবুজ পত্রের প্রতি আকৃষ্ট। *বেদের* যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে অবগত নয়। *বেদের* উদ্দেশ্য পরম পুরুষ নিজেই বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে প্রতিবিম্ব বৃক্ষটি কেটে বাদ দিয়ে চিৎ-জগতের বাস্তব বৃক্ষটি লাভ করা।

শ্লোক ২

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

অধঃ—নিম্নমুখী; চ—এবং; ঊর্ধ্বম্—ঊর্ধ্বমুখী; প্রসৃতাঃ—বিস্তৃত; তস্য—তার; শাখাঃ—শাখাসমূহ; গুণ—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা; প্রবৃদ্ধাঃ—পরিবর্ধিত; বিষয়—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; প্রবালাঃ—পল্লব; অধঃ—অধোমুখী; চ—এবং; মূলানি—মূলসমূহ; অনুসন্ততানি—প্রসারিত; কর্ম—কর্মের প্রতি; অনুবন্ধীনি—আবদ্ধ; মনুষ্যলোকে—নরলোকে।

গীতার গান

বৃক্ষের সে শাখাগুলি ঊর্ধ্ব অধঃগতি।
গুণের বশেতে যার যথা বিধিমতি ॥
সে বৃক্ষের শাখা যত বিষয়ের ভোগ।
নিজ কর্ম অনুসারে যত ভবরোগ ॥
বদ্ধজীব ঘুরে সেই বৃক্ষ ডালে ডালে।
মনুষ্যলোক সে ভুঞ্জে নিজ কর্মফলে ॥

অনুবাদ

এই বৃক্ষের শাখাসমূহ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা পুষ্ট হয়ে অধোদেশে ও ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহই এই শাখাগণের পল্লব। এই বৃক্ষের মূলগুলি অধোদেশে প্রসারিত এবং সেগুলি মনুষ্যলোকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ।

তাৎপর্য

সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটির বর্ণনা সম্বন্ধে এখানে পুনরায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তার ডালপালাগুলি চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তার নিম্নাংশে মানুষ, পশু, গরু, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল আদি বৈচিত্র্যময় জীবের বিভিন্ন প্রকাশ হয়েছে। এরা অধোমুখী শাখাগুলিতে অবস্থিত এবং ঊর্ধ্বমুখী শাখাগুলিতে রয়েছে দেবতা, গন্ধর্ব আদি উচ্চ

প্রজাতির জীবসমূহ। বৃক্ষ যেমন জলের দ্বারা পুষ্ট হয়, তেমনই এই বৃক্ষটি পুষ্ট হয় জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা। কখনও কখনও আমরা দেখি যে, জলের অভাবে কোন কোন জমি অনুর্বর, আবার কোন কোন জমি খুব উর্বর, তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রজাতির প্রকাশ হয়।

সেই বৃক্ষের পল্লবগুলি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বিকাশের ফলে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা নানা রকম ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে ডালপালার ডগা, যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি উপভোগের প্রতি আসক্ত। তার পল্লবগুলি হচ্ছে শব্দ, রূপ, স্পর্শ আদি ইন্দ্রিয়-বিষয় বা তন্মাত্র। তার শাখামূলগুলি হচ্ছে নানা রকম সুখ ও দুঃখজাত আসক্তি ও বিরক্তি। সর্বদিকে বিস্তৃত গৌণ মূলগুলি থেকে ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্যকর্ম করার প্রবণতা উদয় হয়। মুখ্য মূলটি আসছে ব্রহ্মলোক থেকে এবং অন্যান্য মূলগুলি রয়েছে মনুষ্য গ্রহলোকগুলিতে। উচ্চতর লোকে গিয়ে পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করার পর সে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং পুনরায় ফলাশ্রয়ী কর্মের মাধ্যমে উন্নীত হতে চায়। এই মনুষ্যলোক হচ্ছে জীবের কর্মক্ষেত্র।

শ্লোক ৩-৪

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

ন—না; **রূপম্**—রূপ; **অস্য**—এই বৃক্ষের; **ইহ**—এই জগতে; **তথা**—ও; **উপলভ্যতে**—উপলব্ধ হয়; **ন**—না; **অন্তঃ**—শেষ; **ন**—না; **চ**—ও; **আদিঃ**—শুরু;

ন—না; চ—ও; সংপ্রতিষ্ঠা—সম্যক স্থিতি; অশ্বত্থম্—অশ্বত্থ বৃক্ষ; এনম্—এই; সুবিরূঢ়—সুদৃঢ়; মূলম্—মূল; অসঙ্গশস্ত্রেণ—বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা; দৃঢ়েন—তীব্র; ছিত্ত্বা—ছেদন করে; ততঃ—তারপর; পদম্—পদ; তৎ—সেই; পরিমার্গিতব্যম্—অন্বেষণ করা কর্তব্য; যস্মিন্—যেখানে; গতাঃ—গমন করলে; ন—না; নিবর্তন্তি—ফিরে আসতে হয়; ভূয়ঃ—পুনরায়; তম্—তাঁকে; এব—অবশ্যই; চ—ও; আদ্যম্—আদি; পুরুষম্—পুরুষের প্রতি; প্রপদ্যে—শরণ গ্রহণ কর; যতঃ—যাঁর থেকে; প্রবৃত্তিঃ—প্রবর্তন; প্রসৃতা—বিস্তৃত হয়েছে; পুরাণী—স্মরণাতিত কাল থেকে।

গীতার গান

ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য সে সীমা নাহি পায়।
অনন্ত আকাশে তার আদি অন্ত নয় ॥
কিবা রূপ সে বৃক্ষের তাহা নাহি বুঝে।
অনন্তকালের মধ্যে জীব যুদ্ধ যুঝে ॥
সে অশ্বত্থ বৃক্ষ হয় সুদৃঢ় যে মূল।
সে মূল কাটিতে হয় শত শত ভুল ॥
অনাসক্তি এক অস্ত্র সে মূল কাটিতে।
সেই সে যে দৃঢ় অস্ত্র সংসার জিনিতে ॥
কাটিয়া সে বৃক্ষমূল সত্যের সন্ধান।
ভাগ্যক্রমে যার হয় তাতে অবস্থান ॥
সে যায় বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে নাহি আসে।
এ বৃক্ষের মূল যথা সে পুরুষ পাশে ॥
সে আদি পুরুষে অদ্য কর যে প্রপত্তি।
জন্মাদি সে যাহা হতে প্রকৃতি প্রবৃত্তি ॥

অনুবাদ

এই বৃক্ষের স্বরূপ এই জগতে উপলব্ধ হয় না। এর আদি, অন্ত ' স্থিতি যে কোথায় তা কেউই বুঝতে পারে না। তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা দৃঢ়মূল এই বৃক্ষকে ছেদন করে সত্য বস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য, যেখানে গমন করলে, পুনরায় ফিরে আসতে হয় না। স্মরণাতীত কাল হতে যাঁর থেকে সমস্ত কিছু প্রবর্তন ও বিস্তৃত হয়েছে, সেই আদি পুরুষের প্রতি শরণাগত হও।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রকৃত রূপ এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারা যায় না। যেহেতু তার মূল ঊর্ধ্বমুখী, তাই প্রকৃত বৃক্ষটির বিস্তার হচ্ছে অপর দিকে। সে বৃক্ষটি যে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত তা কেউ দেখতে পায় না এবং বৃক্ষটির শুরু যে কোথায় তাও কেউ দেখতে পায় না। তবুও তার কারণ খুঁজে বার করতে হবে। "আমি আমার পিতার পুত্র, আমার পিতা অমুক ব্যক্তির পুত্র ইত্যাদি।" এভাবেই অনুসন্ধান করতে করতে মানুষ ব্রহ্মাতে এসে পৌঁছায়। ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে। এভাবেই অবশেষে যখন কেউ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে পৌঁছায়, তখনই তার এই গবেষণার শেষ হয়। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সাধুদের সঙ্গের মাধ্যমে এই বৃক্ষটির উৎস পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অনুসন্ধান করতে হবে। তার ফলে যথার্থ জ্ঞানের প্রভাবে ধীরে ধীরে এই জড় জগতের বিকৃত প্রতিফলন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। এভাবেই জ্ঞানের দ্বারা জড় জগতের সংযোগ ছিন্ন করে চিৎ-জগতের বাস্তব বৃক্ষে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে *অসঙ্গ* কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য করার আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই, প্রামাণ্য শাস্ত্রের ভিত্তিতে ভগবৎ-তত্ত্ব বিজ্ঞান আলোচনা করার মাধ্যমে এবং যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ভক্তসঙ্গে এই ধরনের আলোচনা করার ফলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়। তারপর সর্বপ্রথমে যা অবশ্য করণীয়, তা হচ্ছে তাঁর শ্রীচরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করা। সেই পরম ধামের বর্ণনায় এখানে বলা হয়েছে যে, একবার সেখানে গেলে এই প্রতিবিম্বরূপী বৃক্ষে আর ফিরে আসতে হয় না। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি মূল, যাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। সেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে হলে কেবলমাত্র আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই আত্মসমর্পণই হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন আদি নববিধা ভক্তি অনুশীলনের চরম পরিণতি। এই জড় জগতের বিস্তারের কারণ হচ্ছেন ভগবান। ভগবান নিজেই ইতিমধ্যে সেই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি সব কিছুরই উৎস"। সুতরাং, জড়-জাগতিক জীবনরূপ অত্যন্ত কঠিন এই অশ্বত্থ বৃক্ষের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন গতি নেই। শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করলে অনায়াসে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

নিঃ—শূন্য; **মান**—অভিমান; **মোহাঃ**—মোহ; **জিত**—বিজিত; **সঙ্গ**—সঙ্গের; **দোষাঃ**—দোষ; **অধ্যাত্ম**—পারমার্থিক জ্ঞানে; **নিত্যাঃ**—নিত্যত্ব; **বিনিবৃত্ত**—বর্জিত; **কামাঃ**—কামনা-বাসনা; **দ্বন্দ্বৈঃ**—দ্বন্দ্বসমূহ থেকে; **বিমুক্তাঃ**—মুক্ত; **সুখদুঃখ**—সুখ ও দুঃখ; **সংজ্ঞৈঃ**—নামক; **গচ্ছন্তি**—লাভ করেন; **অমূঢ়াঃ**—মোহমুক্ত ব্যক্তিগণ; **পদম্**—পদ; **অব্যয়ম্**—নিত্য; **তৎ**—সেই।

গীতার গান

নিরভিমান নির্মোহ সঙ্গদোষে মুক্ত ।
নিত্যানিত্য বুদ্ধি যার কামনা নিবৃত্ত ॥
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব মুক্ত জড় মূঢ় নয় ।
বিধিজ্ঞ পুরুষ পায় সে পদ অব্যয় ॥

অনুবাদ

যাঁরা অভিমান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্য-অনিত্য বিচার-পরায়ণ, কামনা-বাসনা বর্জিত, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বসমূহ থেকে মুক্ত এবং মোহমুক্ত, তাঁরাই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

শরণাগতির পন্থা এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে গর্বের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন না হওয়া। কারণ, বদ্ধ জীব নিজেকে জড়া প্রকৃতির অধিপতি বলে মনে করে গর্বস্ফীত। তাই, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করা তার পক্ষে খুব কঠিন। যথার্থ জ্ঞান অনুশীলন করার মাধ্যমে তাকে জানতে হবে যে, সে জড়া প্রকৃতির অধিপতি নয়। অধিপতি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অহঙ্কার-জনিত মোহ থেকে কেউ যখন মুক্ত হয়, তখন সে আত্মসমর্পণের পন্থা শুরু করতে পারে। যে সর্বদাই এই জড় জগতে সম্মানের

আকাঙ্ক্ষা করে, তার পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব নয়। মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলেই অহঙ্কারের উদয় হয়; কারণ জীব যদিও অল্প দিনের জন্য এখানে আসে এবং তারপর বিদায় নিয়ে চলে যায়, তবুও মূর্খের মতো সে মনে করে যে, সে এই জগতের অধীশ্বর। এভাবেই সে সব কিছু জটিল করে তোলে এবং তার ফলে সে সর্বদাই দুর্দশাগ্রস্ত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সমস্ত জগৎ চালিত হচ্ছে। মানুষ মনে করছে যে, সারা পৃথিবীটাই মানব-সমাজের সম্পত্তি এবং মিথ্যা মালিকানার ভ্রান্তবোধে তারা পৃথিবীটাকে ভাগ করে নিয়েছে। মনুষ্য-সমাজ যে এই জগতের মালিক, সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে। এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হলে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়তা বোধের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত মিথ্যা বন্ধনগুলি মানুষকে জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখে। এই স্তর অতিক্রম করার পর দিব্যজ্ঞান অনুশীলন করতে হবে। যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে জানতে হবে কোন জিনিসগুলি তার এবং কোনগুলি তার নয়। সব কিছু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ হলে মানুষ সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হয়। সে যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করে, তখনই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ৬

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

ন—না; **তৎ**—তা; **ভাসয়তে**—আলোকিত করতে পারে; **সূর্যঃ**—সূর্য; **ন**—না; **শশাঙ্কঃ**—চন্দ্র; **ন**—না; **পাবকঃ**—অগ্নি, বিদ্যুৎ; **যৎ**—যেখানে; **গত্বা**—গেলে; **ন**—না; **নিবর্তন্তে**—ফিরে আসে; **তৎ ধাম**—সেই ধাম; **পরমম্**—পরম; **মম**—আমার।

গীতার গান

সে আকাশে জ্যোতির্ময়ে সূর্য বা শশাঙ্ক ।
আবশ্যক নাহি তথা কিংবা সে পাবক ॥
সেখানে প্রবেশ হলে ফিরে নাহি আসে ।
নিত্যকাল মোর ধামে সে জন নিবাসে ॥

অনুবাদ

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি বা বিদ্যুৎ আমার সেই পরম ধামকে আলোকিত করতে পারে না। সেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

চিন্ময় জগৎ বা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম—কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। চিদাকাশে সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ, অগ্নি অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ সেখানে সব কয়টি গ্রহই জ্যোতির্ময়। এই ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটি গ্রহ সূর্য হচ্ছে জ্যোতির্ময়। কিন্তু চিদাকাশে সব কয়টি গ্রহই জ্যোতির্ময়। বৈকুণ্ঠলোক নামক এই সমস্ত গ্রহে উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি নামক চিদাকাশ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় শ্রীকৃষ্ণের আলয় গোলোক বৃন্দাবন থেকে। সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির কিয়দংশ মহৎ-তত্ত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত। সেটিই হচ্ছে জড় জগৎ। এই জড় জগৎ ছাড়া সেই জ্যোতির্ময় আকাশের অধিকাংশ স্থানই চিন্ময় গ্রহলোকসমূহে পরিপূর্ণ, যাদের বলা হয় বৈকুণ্ঠ এবং তাদের সর্বোচ্চ শিখরে গোলোক বৃন্দাবন অবস্থিত।

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগতে থাকে, সে বদ্ধ জীবন যাপন করে। কিন্তু যখনই সে জড় জগতের মিথ্যা, বিকৃত বৃক্ষটি কেটে ফেলে চিৎ-জগতে প্রবেশ করে, তখনই সে মুক্ত হয়। তখন আর তাকে এখানে ফিরে আসতে হয় না। বদ্ধ অবস্থায় জীব নিজেকে জড় জগতের অধীশ্বর বলে মনে করে। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় সে যখন ভগবানের রাজত্বে প্রবেশ করে, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করে এবং সেখানে সে সৎ-চিৎ-আনন্দময় জীবন উপভোগ করে।

এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি সকলেরই আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বাস্তবের ভ্রান্ত প্রতিবিম্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে সেই নিত্য পরম ধামে ফিরে যাবার জন্য সকলেরই বাসনা করা উচিত। যারা এই জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে সেই আসক্তি ছিন্ন করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তারা যদি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে, তা হলে সেই আসক্তির বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করা। যে সমাজ ঐকান্তিকভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত, সেই রকম সমাজ খুঁজে বার করতে হবে এবং তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই মানুষ জড় জগতের প্রতি আসক্তি ছেদন করতে পারে। গেরুয়া কাপড় পরলেই কেবল জড় জগতের আকর্ষণ থেকে মুক্ত

হওয়া যায় না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার প্রতি তাকে আসক্ত হতেই হবে। সুতরাং, প্রকৃত বৃক্ষের বিকৃত প্রতিফলনের থেকে মুক্ত হওয়ার যে পন্থা ভক্তিযোগ, যা দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। চতুর্দশ অধ্যায়ে জড়-জাগতিক সব কয়টি পন্থার দোষ প্রদর্শন করা হয়েছে। কেবলমাত্র ভক্তিযোগকে শুদ্ধ গুণাতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকটিতে *পরমং মম* কথাটির ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি, কিন্তু চিৎ-জগৎ হচ্ছে *পরমম্*, অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। *কঠ উপনিষদে* (২/২/১৫) বলা হয়েছে যে, চিৎ-জগতে সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ ও তারকামণ্ডলীর কোন প্রয়োজন নেই (*ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্*)। কারণ, সমগ্র চিদাকাশ পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। পরম ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় কেবল ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে। এ ছাড়া আর কোন উপায়ে তা সম্ভব হয় না।

শ্লোক ৭

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

মম—আমার; **এব**—অবশ্যই; **অংশঃ**—বিভিন্নাংশ; **জীবলোকে**—জড় জগতে; **জীবভূতঃ**—বদ্ধ জীব; **সনাতনঃ**—নিত্য; **মনঃ**—মন সহ; **ষষ্ঠানি**—ছয়; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলিকে; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতিতে; **স্থানি**—স্থিত; **কর্ষতি**—কঠোর সংগ্রাম করছে।

গীতার গান

যত জীব মোর অংশ নহে সে অপর ।
সনাতন তার সত্তা জীবলোকে ঘোর ॥
এখানে সে মন আর ইন্দ্রিয়বন্ধনে ।
কর্ষণ করয়ে কত প্রকৃতির স্থানে ॥

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে জীবের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে। সনাতনভাবে জীব হচ্ছে ভগবানের অতি ক্ষুদ্র বিভিন্নাংশ। এমন নয় যে, বদ্ধ অবস্থায় জীব স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে এবং মুক্ত অবস্থায় সে ভগবানের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। সনাতনভাবেই জীবসত্তা ভগবানের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ-স্বরূপ। *সনাতনঃ* কথাটি এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক বর্ণনা অনুসারে ভগবান নিজেকে অনন্তরূপে প্রকাশ করেন, যার মুখ্য প্রকাশকে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব এবং গৌণ প্রকাশকে বলা হয় জীবসত্তা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বিষ্ণুতত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশ এবং জীবসত্তা হচ্ছে বিভিন্নাংশ-প্রকাশ। তাঁর স্বাংশ-প্রকাশে তিনি রামচন্দ্র, নৃসিংহদেব, বিষ্ণুমূর্তি এবং বিভিন্ন বৈকুণ্ঠলোকের অধীশ্বর আদি নানারূপে প্রকাশিত হন। বিভিন্নাংশ প্রকাশ জীবসমূহ ভগবানের নিত্যদাস। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশসমূহের স্বতন্ত্র স্বরূপগুলি নিত্য বর্তমান। তেমনই, বিভিন্নাংশ জীবদেরও স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হবার ফলে, ভগবানের গুণাবলীর অণুসদৃশ অংশ জীবদের মধ্যেও রয়েছে, যার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে একটি। স্বতন্ত্র আত্মারূপে প্রতিটি জীবেরই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষুদ্র স্বাধীনতা রয়েছে। সেই ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে জীবাত্মা বদ্ধ হয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতার যথাযথ সদ্ব্যবহার করলে সে সর্বদা মুক্ত থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই সে পরমেশ্বর ভগবানের মতো গুণগতভাবে নিত্য। মুক্ত অবস্থায় সে জড় জগতের পরিবেশ থেকে মুক্ত এবং সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত। বদ্ধ অবস্থায় সে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে এবং অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবার কথা সে ভুলে যায়। তার ফলে, এই জড় জগতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

কেবল কুকুর, বেড়াল, মানুষই নয়, এমন কি জড় জগতের নিয়ন্ত্রণকারী—ব্রহ্মা, শিব এমন কি বিষ্ণু পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ। তাঁরা সকলেই নিত্য, তাঁদের প্রকাশ সাময়িক নয়। এখানে *কর্ষতি* ('সংগ্রাম করা' অথবা 'জোর করে আঁকড়ে ধরা') কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বদ্ধ জীব যেন লৌহ শৃঙ্খলের মতো অহঙ্কারের দ্বারা শৃঙ্খলিত এবং তার মন হচ্ছে তার মুখ্য প্রতিনিধি, যে তাকে জড় অস্তিত্বের দিকে ধাবিত করছে। মন যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন তার কার্যকলাপ শুদ্ধ হয়। মন যখন রজোগুণে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন তার কার্যকলাপ পীড়াদায়ক হয় এবং মন যখন তমোগুণে থাকে, তখন সে নিম্নতর প্রজাতিরূপে বিচরণ করে। এই শ্লোকে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বদ্ধ জীবাত্মা মন ও ইন্দ্রিয় সমন্বিত জড় দেহের দ্বারা আবৃত এবং সে যখন মুক্ত হয়

তখন এই জড় আবরণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার স্বরূপ সমন্বিত চিন্ময় দেহ নিজস্ব সামর্থ্যে প্রকাশিত হয়। *মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতিতে* এই তথ্যগুলি প্রদান করা হয়েছে—*স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্বমনুভবতি।* এখানে বলা হয়েছে যে, যখন জীবাত্মা তাঁর জড় আবরণ পরিত্যাগ করে চেতন জগতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর চিন্ময় শরীর পুনরুজ্জীবিত হয় এবং তাঁর চিন্ময় শরীরে তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। তিনি তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে পারেন, তাঁর কথা শুনতে পারেন এবং যথাযথভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। *স্মৃতি* শাস্ত্রেও জানতে পারা যায় যে, *বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ*—বৈকুণ্ঠলোকে সকলেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মতো রূপ নিয়ে বিরাজ করেন। সেখানে বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশ এবং তাঁর বিভিন্নাংশ জীবাত্মাদের দেহের গঠনে কোন পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, জীব মুক্ত হলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় দিব্য শরীর প্রাপ্ত হন।

এখানে *মমৈবাংশঃ* ('পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ') কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ অংশ কোন জড় পদার্থের ভাঙা অংশের মতো নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে, আত্মাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা যায় না। এই অণুসদৃশ অংশকে জড় বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। এটি জড় পদার্থের মতো নয়, যা কেটে টুকরো টুকরো করা যায়, তারপর আবার জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায়। সেই ধারণা এখানে প্রযোজ্য নয়, কারণ এখানে সংস্কৃত *সনাতন* ('নিত্য') কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবানের অণুসদৃশ অংশগুলিও নিত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমদিকে এটিও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি দেহে ভগবানের অণুসদৃশ অংশ আত্মা বর্তমান থাকে (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*)। সেই অণুসদৃশ অংশ যখন জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন চিদাকাশে চিন্ময় গ্রহলোকে তার আদি চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করার আনন্দ উপভোগ করে। এখানে অবশ্য এটি বোঝা যাচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ অংশ হওয়ার ফলে জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, যেমন সোনার একটি কণাও সোনা।

শ্লোক ৮

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

শরীরম্—দেহ; **যৎ**—যেমন; **অবাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **যৎ**—যা; **চ অপি**—ও; **উৎক্রামতি**—নিষ্ক্রান্ত হয়; **ঈশ্বরঃ**—দেহের ঈশ্বর; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **এতানি**—এই সমস্ত; **সংযাতি**—গমন করে; **বায়ুঃ**—বায়ু; **গন্ধান্**—গন্ধ; **ইব**—মতন; **আশয়াৎ**—ফুল থেকে।

গীতার গান

বার বার কত দেহ সে যে প্রাপ্ত হয় ।
এক দেহ ছাড়ে আর অন্যে প্রবেশয় ॥
বায়ু গন্ধ যথা যায় স্থান স্থানান্তরে ।
কর্মফল সূক্ষ্ম সেই দেহ দেহান্তরে ॥

অনুবাদ

বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই এই জড় জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে জীবকে *ঈশ্বর* বা তার দেহের নিয়ন্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে যদি ইচ্ছা করে, তা হলে সে তার দেহকে উচ্চতর শ্রেণীতে পরিবর্তন করতে পারে এবং সে যদি ইচ্ছা করে তা হলে নিম্নতর শ্রেণীতে অধঃপতিত হতে পারে। তার অতি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য এই ক্ষেত্রে আছে। তার শরীরের সমস্ত পরিবর্তন নির্ভর করে তার সেই স্বাতন্ত্র্যের উপর। তার চেতনাকে সে যেভাবে গড়ে তুলেছে, মৃত্যুর পর তা তাকে পরবর্তী শরীরে নিয়ে যাবে। তার চেতনাকে যদি সে একটি কুকুর বা একটি বেড়ালের চেতনার মতো করে গড়ে তোলে, তা হলে সে অবশ্যই কুকুর অথবা বেড়ালের শরীর প্রাপ্ত হবে। কেউ যদি তার চেতনাকে দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত করে, তা হলে সে দেবতাদের মতো শরীর প্রাপ্ত হবে এবং সে যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তা হলে সে অপ্রাকৃত কৃষ্ণলোকে স্থানান্তরিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করবে। দেহের নাশ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে দেহের সব কিছুরই নাশ হয়ে যায়, সেই ধারণা ভ্রান্ত। জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে এবং তার বর্তমান শরীর ও বর্তমান কার্যকলাপ তার পরবর্তী শরীরের পটভূমি। কর্ম অনুসারে জীব একটি ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয় এবং যথা সময়ে তাকে সেই শরীর ত্যাগ করতে হয়। এখানে বলা হয়েছে যে, সূক্ষ্ম শরীর, যা পরবর্তী

শরীরের ধারণা বহন করে, তা পরবর্তী জীবনে অন্য একটি শরীরে বিকশিত হয়। এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হবার এই পন্থা এবং দেহের সংগ্রামকে বলা হয় কর্ষতি বা জীবন-সংগ্রাম।

শ্লোক ৯

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

শ্রোত্রম্—কর্ণ; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **স্পর্শনম্**—ত্বক; **চ**—ও; **রসনম্**—জিহ্বা; **ঘ্রাণম্**—ঘ্রাণশক্তি; **এব**—ও; **চ**—এবং; **অধিষ্ঠায়**—আশ্রয় করে; **মনঃ**—মন; **চ**—ও; **অয়ম্**—এই জীব; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **উপসেবতে**—উপভোগ করে।

গীতার গান

শরীরের অনুসার শ্রবণ দর্শন ।
স্পর্শন, রসন আর ঘ্রাণ বা মনন ॥
সে শরীরে জীব করে বিষয় সেবন ।
বদ্ধজীব করে সেই সংসার ভ্রমণ ॥

অনুবাদ

এই জীব চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে।

তাৎপর্য

পক্ষান্তরে বলা যায়, জীব যদি তার চেতনাকে কুকুর-বেড়ালের প্রবৃত্তির দ্বারা কলুষিত করে তোলে, তা হলে পরবর্তী জীবনে সে কুকুর বা বেড়ালের মতো শরীর প্রাপ্ত হয়ে তাদের মতো দেহসুখ ভোগ করবে। চেতনা মূলত জলের মতো নির্মল। কিন্তু জলের সঙ্গে যদি কোন রং মেশান হয়, তা হলে জল রঙিন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, চেতনা নির্মল, কেন না আত্মা পবিত্র। কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের সংস্রবে আসার ফলে চেতনা কলুষিত হয়ে পড়ে। প্রকৃত চেতনা হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা। তাই কেউ যখন কৃষ্ণচেতনায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি তাঁর নির্মল জীবনে অবস্থান করেন। কিন্তু নানা রকম জাগতিক মনোবৃত্তির দ্বারা চেতনা যদি কলুষিত হয়ে

পড়ে, তা হলে পরবর্তী জীবনে তিনি তদনুরূপ দেহ প্রাপ্ত হন। তিনি যে পুনরায় মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি কুকুর, বেড়াল, শূকর, দেবতা অথবা অন্য বহু শরীরের মধ্যে একটি শরীর প্রাপ্ত হতে পারেন। এই রকম চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির শরীর রয়েছে।

শ্লোক ১০

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

উৎক্রামন্তম্—দেহ ত্যাগ করে; **স্থিতম্**—দেহে স্থিত; **বা অপি**—দুটির মধ্যে কোন একটি; **ভুঞ্জানম্**—উপভোগ করে; বা—অথবা; **গুণান্বিতম্**—প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন; **বিমূঢ়াঃ**—মূঢ় লোকেরা; ন—না; **অনুপশ্যন্তি**—দেখতে পায়; **পশ্যন্তি**—দেখতে পান; **জ্ঞানচক্ষুষঃ**—জ্ঞান-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

গীতার গান

মূঢ়লোক না বিচারে কি ভাবে কি হয় ।
উৎক্রান্তি স্থিতি ভোগ কার বা কোথায় ॥
যার জ্ঞানচক্ষু আছে গুরুর কৃপায় ।
ভাগ্যবান সেই জন দেখিবারে পায় ॥

অনুবাদ

মূঢ় লোকেরা দেখতে পায় না কিভাবে জীব দেহ ত্যাগ করে অথবা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিভাবে তার পরবর্তী শরীর সে উপভোগ করে। কিন্তু জ্ঞান-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমস্ত বিষয় দেখতে পান।

তাৎপর্য

জ্ঞানচক্ষুষঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞান বিনা কেউই বুঝতে পারে না কিভাবে জীব তার বর্তমান শরীরটি ত্যাগ করে এবং পরবর্তী জীবনে সে কি রকম শরীর ধারণ করে। এমন কি এটিও বুঝতে পারে না, কেন সে একটি বিশেষ ধরনের শরীরে অবস্থান করছে। এই তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করবার জন্য গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন, যা সদ্‌গুরুর মুখারবিন্দ থেকে *ভগবদ্গীতা* ও তদনুরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করার

মাধ্যমে লাভ করা যায়। এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার শিক্ষা যিনি লাভ করেছেন, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। প্রতিটি জীবই কোন বিশেষ অবস্থায় তার শরীর ত্যাগ করছে। কোন বিশেষ অবস্থায় সে জীবন ধারণ করছে এবং জড়া প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সে বিশেষ অবস্থায় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার চেষ্টা করছে এবং পরিণামে সে নানা রকমের সুখ ও দুঃখ ভোগ করছে। যারা অনন্তকাল ধরে কাম ও বাসনার দ্বারা মোহিত হয়ে আছে, তারা কেন এক বিশেষ দেহে অবস্থান করছে এবং কেনই বা সেই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে তা উপলব্ধি করার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে। সেটি তাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু যাঁর হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ হয়েছে, তিনি দর্শন করতে পারেন যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং সর্বদাই তাঁর দেহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং চিন্ময় স্বরূপে তাঁর আত্মা নিত্য আনন্দ অনুভব করছে। এই জ্ঞান যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই বুঝতে পারেন, কিভাবে বদ্ধ জীব এই জড় জগতে দুর্দশা ভোগ করছে। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনের ফলে যাদের চেতনা খুব উন্নত হয়েছে, তাঁরা জনসাধারণকে এই জ্ঞান দান করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কারণ বদ্ধ জীবের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে তাঁরা মর্মাহত হন। বদ্ধ জীবের অবস্থা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে এই বদ্ধ অবস্থা অতিক্রম করে কৃষ্ণচেতনা লাভ করা এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে অপ্রাকৃত জগতে প্রত্যাবর্তন করা।

শ্লোক ১১

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যতন্তঃ—যত্নশীল; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **চ**—ও; **এনম্**—এই; **পশ্যন্তি**—দর্শন করতে পারেন; **আত্মনি**—আত্মায়; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **যতন্তঃ**—যত্নপরায়ণ হয়ে; **অপি**—ও; **অকৃতাত্মানঃ**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত; **ন**—না; **এনম্**—এই; **পশ্যন্তি**—দেখতে পায়; **অচেতসঃ**—অবিবেকীগণ।

গীতার গান

কত যোগী বৈজ্ঞানিক চেষ্টা বহু করে ।
আত্মজ্ঞান অভাবেতে বৃথা ঘুরি মরে ॥

কিন্তু যেবা আত্মজ্ঞানী আত্মাবস্থিত ।
দেখিতে সমর্থ হয় শুদ্ধ অবহিত ॥

অনুবাদ

আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যত্নশীল যোগিগণ, এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন। কিন্তু আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত অবিবেকীগণ যত্নপরায়ণ হয়েও এই তত্ত্ব অবগত হয় না।

তাৎপর্য

আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী বহু সাধক আছেন। কিন্তু যে আত্মজ্ঞান লাভ করেনি, সে জীবদেহে সমস্ত কিছুর পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে তা দেখতে পায় না। এই সূত্রে *যোগিনঃ* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক যুগে তথাকথিত অনেক যোগী আছে এবং তথাকথিত বহু যোগাশ্রম আছে। কিন্তু আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাপারে তারা বাস্তবিকই অন্ধ। তারা কেবল এক ধরনের শরীরচর্চা প্রণালী সংক্রান্ত ব্যায়ামে অভ্যস্ত এবং দেহ যদি সুস্থ-সুন্দর থাকে, তা হলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। এ ছাড়া আর অন্য কোন তথ্য তাদের জানা নেই। তাদের বলা হয় *যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানঃ*। যদিও তারা তথাকথিত যোগ পন্থায় প্রচেষ্টা করছে, কিন্তু তারা তত্ত্বজ্ঞানী নয়। এই ধরনের লোকেরা আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না। যাঁরা যথার্থ যোগপন্থা অনুসরণ করছেন, তাঁরাই কেবল আত্মা, জগৎ ও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনায় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত ভক্তিযোগীই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে সব কিছু ঘটছে।

শ্লোক ১২

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

যৎ—যে; **আদিত্যগতম্**—সূর্যস্থিত; **তেজঃ**—জ্যোতি; **জগৎ**—বিশ্বকে; **ভাসয়তে**—প্রকাশিত করে; **অখিলম্**—সমগ্র; **যৎ**—যে; **চন্দ্রমসি**—চন্দ্রে; **যৎ**—যে; **চ**—ও; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **তৎ**—সেই; **তেজঃ**—তেজ; **বিদ্ধি**—জানবে; **মামকম্**—আমার।

গীতার গান

এই যে সূর্যের তেজ অখিল জগতে ।
চন্দ্রের কিরণ কিংবা আছে ভালমতে ॥

আমার প্রভাব সেই আভাস সে হয় ।
আমি যাকে আলো দিই সে আলো পায় ॥

অনুবাদ

সূর্যের যে জ্যোতি এবং চন্দ্র ও অগ্নির যে জ্যোতি সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করে, তা আমারই তেজ বলে জানবে।

তাৎপর্য

যারা নির্বোধ, তারা বুঝতে পারে না কিভাবে সব কিছু ঘটছে। ভগবান এখানে যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা উপলব্ধি করার মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞানের সূচনা হয়। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক শক্তি সকলেই দেখতে পায়। মানুষকে কেবল এটি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে, সূর্যের উজ্জ্বল জ্যোতি, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ, বৈদ্যুতিক আলোক ও অগ্নির দীপ্তি সবই আসছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে। জীবনের এই ভাবধারায়, কৃষ্ণভাবনার সূচনা এই জড় জগতে বদ্ধ জীবের প্রগতি অনেক অংশে নির্ভর করে। জীব অপরিহার্যরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ এবং এখানে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন কিভাবে তারা তাদের আপন আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে।

এই শ্লোকটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সূর্য সমস্ত সৌরমণ্ডলকে আলোকিত করছে। অনেক অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং সৌরমণ্ডল আছে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য রয়েছে, চন্দ্র রয়েছে এবং গ্রহ রয়েছে। তবে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র সূর্যই আছে। *ভগবদ্গীতায়* (১০/২১) বলা হয়েছে যে, চন্দ্র হচ্ছে নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতম (*নক্ষত্রাণামহং শশী*)। সূর্যরশ্মির প্রকাশ হয় চিদাকাশে ভগবানের চিন্ময় জ্যোতির প্রভাবে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মানুষের কার্যকলাপ বিন্যস্ত করা হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে তারা রান্না করে, আগুন জ্বালিয়ে তারা কারখানা চালায় ইত্যাদি। আগুনের সাহায্যে কত কিছু করা হয়, তাই সূর্যোদয়, অগ্নি ও চন্দ্রকিরণ জীবদের কাছে এত মনোরম। তাদের সাহায্য ব্যতীত জীব বেঁচে থাকতে পারে না। তাই কেউ যখন বুঝতে পারে যে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির আলোক ও জ্যোতির উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন তার কৃষ্ণচেতনা শুরু হয়। চন্দ্র-কিরণের দ্বারা সমস্ত বনস্পতির পুষ্টিসাধন হয়। চন্দ্রকিরণ এতই মনোরম যে, মানুষ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলেই জীবন ধারণ করছে। তাঁর কৃপা ব্যতীত সূর্যের উদয় হতে পারে

না, তাঁর কৃপা ব্যতীত চন্দ্রের প্রকাশ হতে পারে না, তাঁর কৃপা ব্যতীত অগ্নির প্রকাশ হতে পারে না এবং সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির সহায়তা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারে না। এই চিন্তাগুলি বদ্ধ জীবের কৃষ্ণচেতনা জাগিয়ে তোলে।

শ্লোক ১৩

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

গাম্—পৃথিবীতে; **আবিশ্য**—প্রবিষ্ট হয়ে; **চ**—ও; **ভূতানি**—জীবসমূহকে; **ধারয়ামি**—ধারণ করি; **অহম্**—আমি; **ওজসা**—আমার শক্তির দ্বারা; **পুষ্ণামি**—পুষ্ট করছি; **চ**—এবং; **ঔষধীঃ**—ধান, যব আদি ওষধি; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **সোমঃ**—চন্দ্র; **ভূত্বা**—হয়ে; **রসাত্মকঃ**—রসময়।

গীতার গান

এই যে পৃথিবী যথা বায়ুমধ্যে ভাসে ।
আমার সে শক্তি ধরে সবেতে প্রবেশে ॥
আমি সে ঔষধি যত পোষণ করিতে ।
চন্দ্ররূপে রশ্মিদান করি সে তাহাতে ॥

অনুবাদ

আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে আমার শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবদের ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ধান, যব আদি ওষধি পুষ্ট করছি।

তাৎপর্য

ভগবানের শক্তির প্রভাবেই যে সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে ভাসছে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভগবান প্রতিটি অণুতে, প্রতিটি গ্রহে এবং প্রতিটি জীবে প্রবিষ্ট হন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অংশরূপে পরমাত্মা গ্রহগুলিতে, ব্রহ্মাণ্ডে, জীবে, এমন কি অণুতে প্রবিষ্ট হন। সুতরাং, তিনি প্রবিষ্ট হন বলেই সব কিছু যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। দেহে যখন আত্মা থাকে, তখন মানুষ জলে ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন এই দেহ থেকে চলে যায় এবং দেহটির যখন মৃত্যু হয়, তখন দেহটি ডুবে যায়। অবশ্যই সেটি যখন পরে পচে ফেঁপে-ফুলে ওঠে, তখন তা

শুকনো খড়কুটা বা পাতার মতো ভাসতে থাকে, কিন্তু যেইমাত্র মানুষটির মৃত্যু হয়, সে তৎক্ষণাৎ জলে ডুবে যায়। তেমনই এই সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে ভাসছে এবং তা সম্ভব হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম শক্তি তাতে প্রবিষ্ট হয়েছে বলে। তাঁর শক্তি সমস্ত গ্রহগুলিকে এক মুঠো ধূলিকণার মতো ধারণ করে আছে। কেউ যদি এক মুঠো ধূলিকণা ধরে রাখে, তা হলে সেই ধূলিকণাগুলি পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি সেগুলিকে বায়ুর মধ্যে নিক্ষেপ করে, তা হলে তা পড়ে যাবে। তেমনই, এই সমস্ত গ্রহগুলি যা মহাশূন্যে ভাসছে, তা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের মুষ্টিতে ধৃত। তাঁর বীর্য ও শক্তির প্রভাবে স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুই তাদের যথাস্থানে অবস্থিত থাকে। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্যই সূর্য আলোক দান করছে এবং গ্রহগুলি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলেছে। তিনি না হলে ধূলিকণার মতো সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত এবং বিনাশ প্রাপ্ত হত। তেমনই, চন্দ্র যে সমস্ত বনস্পতির পুষ্টি সাধন করছে, তাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই জন্য। চন্দ্রের প্রভাবের ফলেই বনস্পতিরা সুস্বাদু হয়। চন্দ্রকিরণ ব্যতীত বনস্পতিরা না পারে বর্ধিত হতে, না পারে রসাল স্বাদযুক্ত হতে। মানব-সমাজ কর্ম করছে, আরাম উপভোগ করছে এবং আহার্যের স্বাদ উপভোগ করছে, পরমেশ্বর ভগবান সেগুলি সরবরাহ করছেন বলেই। তা না হলে মানুষ বাঁচতে পারত না। *রসাত্মকঃ* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি চন্দ্রের প্রভাবে সব কিছু সুস্বাদু হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৪

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

অহম্—আমি; **বৈশ্বানরঃ**—জঠরাগ্নি; **ভূত্বা**—হয়ে; **প্রাণিনাম্**—প্রাণীগণের; **দেহম্**—দেহ; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় করে; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **অপান**—অপান বায়ু; **সমাযুক্তঃ**—সংযোগে; **পচামি**—পরিপাক করি; **অন্নম্**—খাদ্য; **চতুর্বিধম্**—চার প্রকার।

গীতার গান

আমি বৈশ্বানর হই দেহমাত্রে বসি ।
প্রাণাপান বায়ুযোগে ভক্ষ্য দ্রব্য কষি ॥

অনুবাদ

আমি জঠরাগ্নি রূপে প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।

তাৎপর্য

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, জঠরে এক রকমের অগ্নি আছে যা সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে হজম করতে সাহায্য করে। সেই অগ্নি যখন প্রজ্বলিত না থাকে, তখন ক্ষুধা থাকে না এবং সেই অগ্নি যখন ঠিকমতো জ্বলতে থাকে, তখন আমরা ক্ষুধার্ত হই। মাঝে মাঝে সেই অগ্নি যখন ঠিকমতো না জ্বলে, তখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সে যাই হোক, এই অগ্নি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিনিধি। বৈদিক মন্ত্রেও (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫/৯/১*) প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা ব্রহ্ম অগ্নিরূপে উদরে অবস্থিত হয়ে সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করছেন (*অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদং অন্নং পচ্যতে*)। সুতরাং, যেহেতু তিনি সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করতে সাহায্য করছেন, তাই আহারের ব্যাপারেও জীব স্বাধীন নয়। পরমেশ্বর ভগবান যদি পরিপাকের ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করেন, তা হলে তার পক্ষে আহার করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এভাবেই তিনি খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন এবং পরিপাক করেন এবং তাঁর কৃপার প্রভাবে আমরা আমাদের জীবন উপভোগ করতে পারি। *বেদান্তসূত্রেও* (১/২/২৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ*—ভগবান শব্দের মধ্যে ও শরীরের মধ্যে, বায়ুতে এমন কি উদরে পরিপাক শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। খাদ্যদ্রব্য চার প্রকারের—চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এবং এই সব রকমের খাদ্যেরই পরিপাক করার শক্তি হচ্ছেন তিনি।

শ্লোক ১৫

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

সর্বস্য—সমস্ত জীবের; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **হৃদি**—হৃদয়ে; **সন্নিবিষ্টঃ**—অবস্থিত; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অপোহনম্**—

বিলোপ; **চ**—এবং; **বেদৈঃ**—বেদসমূহের দ্বারা; **চ**—ও; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **অহম্**—আমি; **এব**—অবশ্যই; **বেদ্যঃ**—জ্ঞাতব্য; **বেদান্তকৃৎ**—বেদান্তকর্তা; **বেদবিৎ**—বেদজ্ঞ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

সবার হৃদয়ে আমি, সন্নিবিষ্ট অন্তর্যামী,
আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান মন ।
আমি সে জাগাই কারে, আমি সে ভুলাই তারে,
আমা হতে হয় অপোহন ॥
যত বেদ পৃথিবীতে, আমার সে তল্লাসেতে,
আমি হই সব বেদবেদ্য ।
আমি সে বেদান্তবিৎ, আমি সে বেদান্তকৃৎ,
বেদান্তের কথা শুন অদ্য ॥

অনুবাদ

আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিলোপ হয়। আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।

তাৎপর্য

ভগবান পরমাত্মারূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং তাঁর থেকে সমস্ত কর্মের সূচনা হয়। জীব তার পূর্ব জীবনের সব কথা ভুলে যায়, কিন্তু তাকে সমস্ত কর্মের সাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে যেতে হয়। সুতরাং, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সে কর্ম করতে শুরু করে। সেই জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন ভগবান তাকে তা দান করেন। তিনি তাকে স্মৃতি দান করেন এবং তার পূর্ব জীবন সম্বন্ধে বিস্মৃতিও দান করেন। এভাবেই, ভগবান কেবল সর্বব্যাপ্তই নন, তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরেও বিরাজমান। তিনি নানা রকম কর্মফল দান করেন। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে বা হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা রূপেই কেবল আরাধ্য নন, *বেদের* অবতাররূপেও তিনি আরাধ্য। *বেদ* মানুষকে সঠিক নির্দেশ প্রদান করে, যাতে তারা যথাযথভাবে তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে। *বেদ* পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে *বেদান্তসূত্র* প্রণয়ন করেন। ব্যাসদেবের *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে *বেদান্তসূত্রের* যথার্থ তত্ত্ব-উপলব্ধি। পরমেশ্বর ভগবান এতই পূর্ণ যে, বদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি হচ্ছেন তার খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহকারী, পাচনকারী, তার কর্মের সাক্ষী, *বেদরূপে* তার জ্ঞান প্রদাতা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষক। তিনি বদ্ধ জীবাত্মার আরাধ্য। এভাবেই ভগবান সর্ব মঙ্গলময় এবং তিনি পরম দয়াময়।

অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্। দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে জীব সব কিছু ভুলে যায়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আবার তার কর্ম শুরু করে। যদিও সে তার পূর্বজন্মের সব কথা ভুলে যায়, তবুও যেখানে সে তার কর্ম শেষ করেছিল, সেখান থেকে আবার শুরু করবার জন্য ভগবান তাকে বুদ্ধি দান করেন। সুতরাং, হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীব যে কেবল জাগতিক সুখ-দুঃখ ভোগ করে তা নয়, তার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করার সুযোগও সে পায়। কেউ যদি বৈদিক জ্ঞান লাভে গভীরভাবে প্রয়াসী হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে উপযুক্ত বুদ্ধিও দান করেন। আমাদের উপলব্ধির জন্য কেন তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন? কারণ, ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানা জীবের প্রয়োজন। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*যোঽসৌ সর্বৈর্বেদৈর্গীয়তে।* *চতুর্বেদ থেকে শুরু করে বেদান্তসূত্র, উপনিষদ, পুরাণ* আদি সমস্ত শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের যশ কীর্তিত হয়েছে। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলন করার ফলে, বৈদিক দর্শন আলোচনা করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা করার ফলে তাঁকে লাভ করা যায়। সুতরাং, *বেদের* উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। *বেদ* আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার নির্দেশ দেয় এবং পথ প্রদর্শন করে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন পরম লক্ষ্য। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *বেদান্তসূত্র* (১/১/৪) বলছে—*তৎ তু সমন্বয়াৎ।* তিনটি পর্যায়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা যায়। বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়, বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং অবশেষে জীবনের পরম লক্ষ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হওয়া যায়। এই শ্লোকে *বেদের* উদ্দেশ্য, *বেদের* উপলব্ধি এবং *বেদের* লক্ষ্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

দ্বৌ—দুই; **ইমৌ**—এই; **পুরুষৌ**—জীব; **লোকে**—জগতে; **ক্ষরঃ**—বিনাশী; **চ**—এবং; **অক্ষরঃ**—অবিনাশী; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **ক্ষরঃ**—বিনাশী; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীব; **কূটস্থঃ**—একভাবে স্থিত; **অক্ষরঃ**—অবিনাশী; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

বদ্ধ মুক্ত পুরুষ সে হয় দ্বি-প্রকার।
দুই নামে পরিচিত সে ক্ষর অক্ষর ॥
বদ্ধ জীব যত হয় তার ক্ষর নাম।
অক্ষর কূটস্থ জীব নিত্য মুক্তধাম ॥

অনুবাদ

ক্ষর ও অক্ষর দুই প্রকার জীব রয়েছে। এই জড় জগতের সমস্ত জীবকে ক্ষর এবং চিৎ-জগতের সমস্ত জীবকে অক্ষর বলা হয়।

তাৎপর্য

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যাসদেব রূপে অবতরণ করে ভগবান *বেদান্তসূত্র* প্রণয়ন করেন। এখানে ভগবান সংক্ষেপে *বেদান্তসূত্রের* সারমর্ম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন যে, জীব যা সংখ্যায় অনন্ত, তাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ক্ষর ও অক্ষর। জীব হচ্ছে ভগবানের সনাতন বিভিন্নাংশ। তারা যখন জড় জগতের সংস্পর্শে থাকে, তখন তাদের বলা হয় *জীবভূত* এবং সংস্কৃত *ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি* কথাটির অর্থ হচ্ছে তারা *ক্ষর*। কিন্তু যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত, তাঁদের বলা হয় *অক্ষর*। একাত্মভাবে যুক্ত কথাটির অর্থ এই নয় যে, তাঁদের কোন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নেই, কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁরা ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন নন। সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে তাঁরা সকলেই মেনে নিয়েছেন। অবশ্য, চিৎ-জগতে সৃষ্টি বলে কিছু নেই, তবে *বেদান্তসূত্রের* বর্ণনা অনুসারে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস, তাই সেই ধারণাই এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে দুই রকমের জীব আছে। *বেদেও* তার প্রমাণ আছে। সুতরাং, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। যে সমস্ত জীব এই জগতে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে সংগ্রাম করছে, তাদের জড় দেহ আছে, যা তাদের বদ্ধ অবস্থায় প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। জীব যতক্ষণ বদ্ধ থাকে, জড়ের সংস্পর্শে আসার ফলে তার দেহের পরিবর্তন হয়। জড় দেহের পরিবর্তন

হয়, তাই মনে হয় যেন জীবের পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু চিৎ-জগতে জড় পদার্থ দিয়ে শরীর তৈরি হয় না। তাই সেখানে কোন পরিবর্তন নেই। জড় জগতে জীবের ছয়টি পরিবর্তন হয়—জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, বংশবৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ। এগুলি জড় শরীরের পরিবর্তন। কিন্তু চিৎ-জগতে দেহের কোন পরিবর্তন হয় না। সেখানে জরা নেই, জন্ম নেই এবং মৃত্যু নেই। সেখানে সব কিছুই একত্বভাবে অবস্থান করে। *ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি*—পিতামহ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ছোট পিঁপড়ে পর্যন্ত যে এই জড় জগতের সংস্পর্শে এসেছে, তারা সকলেই দেহ পরিবর্তন করছে। তাই তারা সকলেই ক্ষর। চিৎ-জগতে সকলেই একত্বভাবে সর্বদা *অক্ষর* বা মুক্ত।

শ্লোক ১৭

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

উত্তমঃ—উত্তম; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **তু**—কিন্তু; **অন্যঃ**—অন্য; **পরম**—পরম; **আত্মা**—আত্মা; **ইতি**—এভাবে; **উদাহৃতঃ**—বলা হয়; **যঃ**—যিনি; **লোক**—ভুবনে; **ত্রয়ম্**—তিন; **আবিশ্য**—প্রবিষ্ট হয়ে; **বিভর্তি**—পালন করছেন; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর।

গীতার গান

তাহা হতে যে উত্তম পুরুষ প্রধান ।
ঈশ্বর সে পরমাত্মা থাকে সর্বস্থান ॥

অনুবাদ

এই উভয় থেকে ভিন্ন উত্তম পুরুষকে বলা হয় পরমাত্মা, যিনি ঈশ্বর ও অব্যয় এবং ত্রিজগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পালন করছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির ধারণা *কঠ উপনিষদ* (২/২/১৩) ও *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/১৩) খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বদ্ধ ও মুক্ত অনন্ত কোটি জীবের ঊর্ধ্বে হচ্ছেন পরম পুরুষ, যিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। *উপনিষদের* শ্লোকটি হচ্ছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের মধ্যেই একজন পরম প্রাণময় পুরুষ রয়েছেন। তিনি

হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি তাদের প্রতিপালন করেন এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম অনুসারে আনন্দ উপভোগ করবার সমস্ত সুযোগ সুবিধা দান করেন। সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করেন। যে জ্ঞানী পুরুষ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই কেবল যথার্থ শান্তি লাভের যোগ্য, অন্য কেউ নয়।

শ্লোক ১৮

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ—যেহেতু; **ক্ষরম্**—ক্ষরের; **অতীতঃ**—অতীত; **অহম্**—আমি; **অক্ষরাৎ**—অক্ষর থেকে; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **উত্তমঃ**—উত্তম; **অতঃ**—অতএব; **অস্মি**—হই; **লোকে**—জগতে; **বেদে**—বৈদিক শাস্ত্রে; **চ**—এবং; **প্রথিতঃ**—বিখ্যাত; **পুরুষোত্তমঃ**—পুরুষোত্তম নামে।

গীতার গান

ক্ষর বা অক্ষর হতে আমি সে উত্তম ।
অতএব ঘোষিত নাম পুরুষোত্তম ॥

অনুবাদ

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম, সেই হেতু জগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না—বদ্ধ জীবেও না, মুক্ত জীবেও না। অতএব, তিনি হচ্ছেন পুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম পুরুষ। এখন স্পষ্টভাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, জীব ও পরম পুরুষোত্তম ভগবান উভয়েই স্বতন্ত্র। পার্থক্যটি হচ্ছে যে, বদ্ধ অবস্থাতেই হোক অথবা মুক্ত অবস্থাতেই হোক, জীবেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিসমূহকে কোন পরিমাণেই অতিক্রম করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান ও জীবকে সমপর্যায়ভুক্ত বা সর্বতোভাবে সমান বলে মনে করা ভুল। তাঁদের ব্যক্তিসত্তায় সর্বদাই ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনের প্রশ্ন থেকে যায়। *উত্তম* শব্দটি এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

লোকে কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে '*পৌরুষ আগমে*' (স্মৃতিশাস্ত্র)। নিরুক্তি অভিধানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, *লোক্যতে বেদার্থোঽনেন*—"*বেদের* উদ্দেশ্য স্মৃতি শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পরমাত্মারূপী প্রাদেশিক প্রকাশরূপে *বেদেও* বর্ণিত হয়েছেন। *বেদে* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৮/১২/৩) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে—*তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।* "দেহ থেকে বেরিয়ে এসে পরমাত্মা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করেন। তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অবস্থান করেন। সেই পরম ঈশ্বরকে বলা হয় পরম পুরুষ।" অর্থাৎ, পরম পুরুষ তাঁর চিন্ময় জ্যোতি প্রদর্শন ও বিকিরণ করেন, যা হচ্ছে পরম জ্যোতি। সেই পরম পুরুষোত্তমই পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। সত্যবতী ও পরাশরের সন্তান ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন।

শ্লোক ১৯

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

যঃ—যিনি; **মাম্**—আমাকে; **এবম্**—এভাবে; **অসংমূঢ়ঃ**—নিঃসন্দেহে; **জানাতি**—জানেন; **পুরুষোত্তমম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—তিনি; **সর্ববিৎ**—সর্বজ্ঞ; **ভজতি**—ভজনা করেন; **মাম্**—আমাকে; **সর্বভাবেন**—সর্বতোভাবে; **ভারত**—হে ভারত।

গীতার গান

যে মোরে বুঝিল শ্রেষ্ঠ সে পুরুষোত্তম ।
সকল সন্দেহ ছাড়ি হইল উত্তম ॥
সে জানিল সর্ব বেদ নির্মল হৃদয় ।
হে ভারত! সর্বভাবে সে মোরে ভজয় ॥

অনুবাদ

হে ভারত! যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব ও জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক অনুমান আছে। এখন এই শ্লোকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ। যে অনভিজ্ঞ, সে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমানই করে চলে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী তাঁর অমূল্য সময়ের অপচয় না করে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে নিযুক্ত করেন। সমগ্র *ভগবদ্গীতায়* সর্বত্রই এই তত্ত্বের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তবুও *ভগবদ্গীতার* বহু উদ্ধত হঠকারী ভাষ্যকারেরা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব ও জীব এক ও অভিন্ন।

বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় *শ্রুতি* অর্থাৎ শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষা। প্রামাণিক সূত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিনিধির কাছ থেকেই কেবল বৈদিক জ্ঞান লাভ করা উচিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দরভাবে সব কিছুর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং এই সূত্র থেকে সকলেরই শ্রবণ করা উচিত। নির্বোধের মতো কেবল শ্রবণ করাই যথেষ্ট নয়, সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করে তা উপলব্ধি করতে হবে। এমন নয় যে, কেবল কেতাবি বিদ্যার উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র অনুমান করলেই চলবে। বিনীতভাবে *ভগবদ্গীতা* থেকে শ্রবণ করতে হবে যে, জীব সর্বদাই পরম পুরুষ ভগবানের অধীন তত্ত্ব। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে যিনি এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই *বেদের* যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছেন, তা ছাড়া আর কেউই *বেদের* উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়।

ভজতি শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পর্কে অনেক জায়গায় *ভজতি* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বৈষ্ণব পরম্পরায় বলা হয় যে, কেউ যখন ভক্তিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তাঁকে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য অন্য কোন আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া অনুশীলন করতে হয় না। তিনি ইতিমধ্যেই সেই স্তরে উপনীত হয়েছেন, কারণ তিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত। তাঁর পক্ষে ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির সব কয়টি প্রারম্ভিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি শত সহস্র জীবন ধরে ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমান করে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে উপলব্ধির পর্যায়ে উপনীত না হয় এবং তার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে না পারে, তা হলে বহু বর্ষ ধরে তার যে এত সমস্ত অনুমান, তা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র।

শ্লোক ২০

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি—এভাবেই; **গুহ্যতমম্**—সবচেয়ে গোপনীয়; **শাস্ত্রম্**—শাস্ত্র; **ইদম্**—এই; **উক্তম্**—কথিত হল; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **এতৎ**—এই; **বুদ্ধা**—অবগত হয়ে; **বুদ্ধিমান্**—বুদ্ধিমান; **স্যাৎ**—হন; **কৃতকৃত্যঃ**—কৃতার্থ; **চ**—এবং; **ভারত**—হে ভারত।

গীতার গান

এই সে শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম কথা শুন ।
তুমি সে নিষ্পাপ হও শুদ্ধ তব মন ॥
ইহা যে বুঝিল ভাগ্যে হল বুদ্ধিমান ।
হে ভারত! কৃতকৃত্য সে হল মহান ॥

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ অর্জুন! হে ভারত! এভাবেই সবচেয়ে গোপনীয় শাস্ত্র আমি তোমার কাছে প্রকাশ করলাম। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান ও কৃতার্থ হন।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এটিই হচ্ছে সমস্ত দিব্য শাস্ত্রের সারমর্ম এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেভাবে তা দান করেছেন, ঠিক সেভাবেই তা উপলব্ধি করা উচিত। তার ফলে মানুষের বুদ্ধি বিকশিত হবে এবং সে পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই ভগবৎ-দর্শন উপলব্ধি করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। ভক্তিযোগ হচ্ছে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পন্থা। যেখানেই ভক্তিযোগ সাধিত হয়, সেখানে জড় জগতের কলুষতা থাকতে পারে না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা এবং ভগবান এক ও অভিন্ন, কারণ তাঁরা চিন্ময়। ভগবানের সেবা অনুষ্ঠিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে। ভগবানকে বলা হয় সূর্যের মতো এবং অজ্ঞানতা হচ্ছে অন্ধকার। যেখানে সূর্যালোকের প্রকাশ হয়, সেখানে অন্ধকারের কোন প্রশ্নই উঠতে

পারে না। তাই, সদ্‌গুরুর উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে যখন ভক্তিযোগের অনুশীলন করা হয়, তখন অজ্ঞানতার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

সকলেরই উচিত এই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে ব্রতী হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও নির্মলতা প্রাপ্তির জন্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, সে যথার্থ বুদ্ধিমান নয়।

এই শ্লোকে অর্জুনকে যে *অনঘ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা সম্ভব নয়। মানুষকে সব রকমের পাপের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে হবে। তখনই কেবল সে উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু ভক্তিযোগ এতই শুদ্ধ ও শক্তিশালী যে, কেউ যখন একবার ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন সে আপনা থেকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে যখন ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা হয়, তখন কতকগুলি প্রতিবন্ধককে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করার প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃদয়ের দুর্বলতা। প্রথম অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার অভিলাষ। এভাবেই জীব পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি পরিত্যাগ করে। হৃদয়ের দ্বিতীয় দুর্বলতা হচ্ছে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতা। এই প্রবণতা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সে জড়ের প্রতি আসক্ত হয় এবং সে জড়ের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এই হৃদয়ের দুর্বলতাগুলিই হচ্ছে জড় অস্তিত্বের কারণ। এই অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি শ্লোকে হৃদয়ের এই সমস্ত দুর্বলতা থেকে মানুষকে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের বাকি অংশে ষষ্ঠ শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত *পুরুষোত্তম-যোগ* নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—পরম পুরুষের যোগতত্ত্ব বিষয়ক 'পুরুষোত্তম-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ

শ্লোক ১-৩

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অভয়ম্**—ভয়শূন্যতা; **সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ**—সত্তার পবিত্রতা; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **যোগ**—যোগে; **ব্যবস্থিতিঃ**—অবস্থিতি; **দানম্**—দান; **দমঃ**—মনঃসংযোগ; **চ**—এবং; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **চ**—এবং; **স্বাধ্যায়ঃ**—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **আর্জবম্**—সরলতা; **অহিংসা**—অহিংসা; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **অক্রোধঃ**—ক্রোধশূন্যতা; **ত্যাগঃ**—বৈরাগ্য; **শান্তিঃ**—প্রশান্তি; **অপৈশুনম্**—অন্যের দোষ না দেখা; **দয়া**—দয়া; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবের প্রতি; **অলোলুপ্ত্বম্**—লোভহীনতা; **মার্দবম্**—মৃদুতা; **হ্রীঃ**—লজ্জা; **অচাপলম্**—অচপলতা; **তেজঃ**—তেজ; **ক্ষমা**—ক্ষমা; **ধৃতিঃ**—ধৈর্য; **শৌচম্**—শুচিতা; **অদ্রোহঃ**—

মাৎসর্যহীনতা; ন—না; অতিমানিতা—অভিমানশূন্যতা; ভবন্তি—হয়; সম্পদম্—সম্পদ; দৈবীম্—দিব্য; অভিজাতস্য—জাত ব্যক্তির; ভারত—হে ভারত।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

অভয় সত্ত্ব সংসিদ্ধি জ্ঞানে অবস্থান ।
দান দম যজ্ঞ আর স্বাধ্যায় তপান ॥
সরলতা সত্য আর অহিংসা অক্রোধ ।
ত্যাগ শান্তি দয়া আর পরনিন্দা রোধ ॥
অলোলুপতা মৃদুতা তেজ অচপল ।
ক্ষমা ধৃতি শৌচ বা হ্রী অদ্রোহ সকল ॥
অভিমান শূন্যতা সে ছাব্বিশ যে গুণ ।
সম্পদ সে হয় তার যার দৈবীতে জনম ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ভারত! ভয়শূন্যতা, সত্তার পবিত্রতা, পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন, দান, আত্মসংযম, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপশ্চর্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধশূন্যতা, বৈরাগ্য, শান্তি, অন্যের দোষ দর্শন না করা, সমস্ত জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ, মাৎসর্য শূন্যতা, অভিমান শূন্যতা—এই সমস্ত গুণগুলি দিব্যভাব সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়।

তাৎপর্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের শুরুতেই অশ্বত্থ বৃক্ষবৎ এই জড় জগতের বর্ণনা করা হয়েছে। তার শাখামূলগুলিকে জীবের মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে দেব ও অসুরদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বৈদিক রীতি অনুসারে সাত্ত্বিক কর্মকে মুক্তিপ্রদ, মঙ্গলজনক কর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার কার্যকলাপকে দৈবী প্রকৃতি বলে অভিহিত করা হয়। যারা দৈবী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, তারা মুক্তির পথে অগ্রসর হন। পক্ষান্তরে, যারা রাজসিক ও তামসিক কর্ম করছে, তাদের পক্ষে মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। তারা হয় এই জড় জগতে মনুষ্যরূপে অবস্থান করবে, নয়তো অধোগামী হয়ে পশুজীবন

বা আরও নিম্নতর জীবন লাভ করবে। এই ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান দৈবী প্রকৃতি, তার গুণাবলী এবং আসুরিক প্রবৃত্তি ও তার গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত গুণের সুবিধা ও অসুবিধার কথাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

অভিজাতস্য শব্দটি যার এখানে অনুবাদ হচ্ছে দিব্যগুণে যার জন্ম হয়েছে, তার উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দিব্য পরিবেশে সন্তান উৎপাদনের পন্থা বৈদিক শাস্ত্রে 'গর্ভাধান সংস্কার' নামে পরিচিত। পিতামাতা যদি দিব্যগুণ সমন্বিত সন্তান কামনা করেন, তা হলে তাঁদের মানব-জীবনের জন্য অনুমোদিত দশটি নিয়ম মেনে চলতে হবে। *ভগবদ্গীতাতে* আমরা আগেই পড়েছি যে, সুসন্তান লাভের জন্য স্ত্রী-পুরুষের যে যৌন মিলন, তা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলন যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তা হলে তা নিন্দনীয় নয়। যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময়, তাঁদের অন্তত কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন না করে এমন সন্তান উৎপাদন করা উচিত, জন্মের পরে যারা কৃষ্ণভাবনাময় হবে। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন পিতা-মাতার সন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ করার সৌভাগ্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামক সমাজ-ব্যবস্থা—যা সমাজকে চারটি বর্ণে ও চারটি আশ্রমে বিভক্ত করেছে—তা জন্ম অনুসারে মানব-সমাজকে বিভক্ত করার জন্য নয়। এই বিভাগ হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণ অনুসারে। সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। এখানে যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের দিব্যগুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা দিব্যজ্ঞান লাভের পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বা সমাজের সকল শ্রেণীর গুরু বলে গণ্য করা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—সমাজের এই তিনটি বর্ণের গুরু বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসী, যিনি এই সমাজের সর্বোচ্চ শীর্ষে অধিষ্ঠিত, তিনি ব্রাহ্মণদেরও গুরু। সন্ন্যাসীর প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে ভয়শূন্যতা। কারণ সন্ন্যাসীকে সব রকম সহায় সম্বলহীন হয়ে কেবলমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে তাঁকে একলা থাকতে হয়। সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করার পরেও যদি তিনি মনে করেন, "সম্পর্ক ছিন্ন করার পরে, কে আমায় রক্ষা করবে?" তা হলে তাঁর পক্ষে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ বা পরম পুরুষ ভগবান পরমাত্মারূপে সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে রয়েছেন। তিনি সর্বদাই সব কিছু দর্শন করছেন এবং তিনি হৃদয়ের সমস্ত বাসনাগুলির কথা জানেন। এভাবেই তাঁকে দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন হতে হয় যে, পরমাত্মা রূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরণাগত জীবের

রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁর অনুভব করা উচিত, "আমি কখনই নিঃসঙ্গ নই। আমি যদি অরণ্যের গভীরতম প্রদেশেও থাকি, শ্রীকৃষ্ণ তখনও আমার সঙ্গে থাকবেন এবং তিনি আমাকে রক্ষা করবেন।" এই দৃঢ় বিশ্বাসকে বলা *অভয়ম্* বা ভয়শূন্যতা। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই ধরনের মনোভাব থাকা আবশ্যক।

তারপর তাঁকে তাঁর অস্তিত্ব পবিত্র করতে হয়। সন্ন্যাস-জীবনে পালনীয় বহু নিয়মকানুন আছে। সেগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কোন স্ত্রীর সঙ্গে কোন রকম অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকা কোনও সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জনীয়। কোন নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলাও তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী। তিনি যখন পুরীতে ছিলেন, তখন মহিলা ভক্তেরা তাঁকে প্রণাম করার জন্য তাঁর কাছেও আসতে পারত না, তাদের দূর থেকে তাঁকে প্রণাম জানাতে বলা হত। এটি স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ নয়, এটি হচ্ছে সন্ন্যাসীর প্রতি স্ত্রীসঙ্গ না করার যে কঠোর নির্দেশ আছে, তারই দৃষ্টান্ত। জীবন পবিত্র করে গড়ে তোলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলতে হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী এবং তাঁর জীবন থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি সবচেয়ে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করেছেন এবং সেই জন্য যদিও তাঁকে ভগবানের সবচেয়ে করুণাময় বা মহাবদান্য অবতার বলে গণ্য করা হয়, তবুও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি-নিষেধগুলি পালন করেছেন। ছোট হরিদাস ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে একজন। কিন্তু কোন কারণবশত এই ছোট হরিদাস একবার এক মহিলার প্রতি কামপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এত কঠোর ছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্ষদমণ্ডলী থেকে পরিত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, "সন্ন্যাসী অথবা যিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় প্রকৃতি ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসী, তাঁর পক্ষে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য পার্থিব সম্পদ ভোগ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। তাদের উপভোগ না করলেও যদি কেবল সেই প্রবৃত্তি নিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়, তা এতই নিন্দনীয় যে, এই অবৈধ বাসনাকে মনে স্থান দেওয়ার আগে আত্মহত্যা করা উচিত।" সুতরাং, এগুলিই হচ্ছে পবিত্র হওয়ার পন্থা।

পরবর্তী বিষয়টি হচ্ছে *জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি*—জ্ঞানের অনুশীলনে নিযুক্ত হওয়া। সন্ন্যাস-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহস্থ ও অন্যেরা, যারা তাদের পারমার্থিক জীবনের কথা ভুলে গেছে, তাদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করা। সন্ন্যাসীকে জীবন ধারণের

জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে ভিখারী। দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষের একটি গুণ হচ্ছে দৈন্য এবং সেই দীনতার বশবর্তী হয়েই সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে গমন করেন, ঠিক ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, গৃহস্থদের কাছে গিয়ে তাদের কৃষ্ণচেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য। সেটিই হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম। তিনি যদি যথার্থই উন্নত হন এবং তাঁর গুরুর দ্বারা আদিষ্ট হন, তা হলে যুক্তি ও উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা উচিত এবং তিনি যদি তত উন্নত না হন, তা হলে তাঁর পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে জ্ঞান লাভ করার জন্য তাঁর উচিত সদ্‌গুরুর কাছ থেকে সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা। সন্ন্যাসীর উচিত অভয় হয়ে *সত্ত্বসংশুদ্ধি* (পবিত্রতা) লাভ করে জ্ঞানযোগে অধিষ্ঠিত হওয়া।

তার পরের বিষয়টি হচ্ছে দান। দান করা গৃহস্থের কর্তব্য। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে সদুপায়ে অর্থোপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করা এবং আয়ের অর্ধাংশ সমস্ত বিশ্ব জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য দান করা। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে সেই ধরনের সংস্থাকে দান করা, যারা এই ধরনের কাজে নিযুক্ত আছে। দান যথাযোগ্য পাত্রে অর্পণ করা উচিত। দান নানা রকমের আছে, তা পরে ব্যাখ্যা করা হবে, যেমন সত্ত্বগুণে দান, রজোগুণে দান ও তমোগুণে দান। শাস্ত্রে সত্ত্বগুণে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রজ ও তমোগুণে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, কারণ সেই ধরনের দানের ফলে কেবল অর্থেরই অপচয় হয়। পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার উদ্দেশ্যেই কেবল দান করা উচিত। সেটিই হচ্ছে সত্ত্বগুণে দান।

দম বা আত্মসংযম ধার্মিক সমাজের অন্য আশ্রমভুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই কেবল নির্দিষ্ট হয়নি, গৃহস্থদের জন্য তা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। গৃহস্থ আশ্রমে মানুষ যদিও স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তবু অনর্থক যৌন জীবন যাপনে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করা গৃহস্থের উচিত নয়। গৃহস্থের যৌন জীবনও বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গে যৌনসুখ ভোগ করা উচিত নয়। আধুনিক সমাজ সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব এড়াবার জন্য গর্ভনিরোধক প্রণালী এবং আরও সমস্ত অতি জঘন্য উপায়ে যৌন জীবন করছে। এই ধরনের কার্যকলাপ দিব্যগুণের পর্যায়ভুক্ত নয়। এগুলি আসুরিক কার্যকলাপ। কেউ যদি গৃহস্থও হন এবং পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে চান, তবে তাঁকে অবশ্যই সংযত হতে হবে এবং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য

ব্যতীত সন্তান উৎপাদন করা থেকে বিরত হতে হবে। তিনি যদি এমন সন্তান উৎপাদন করতে পারেন, যারা কৃষ্ণচেতনাময় হবে, তা হলে তিনি শত শত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। কিন্তু সেই সামর্থ্য না থাকলে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সেই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।

যজ্ঞ হচ্ছে আর একটি বিষয়, যা গৃহস্থদের অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ যজ্ঞ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। জীবনের অন্য আশ্রমগুলিতে, যেমন ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে মানুষের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ থাকে না। তাঁরা ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেন। সুতরাং, বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা গৃহস্থদের কর্ম। তাদের উচিত অগ্নিহোত্র আদি যে সমস্ত যজ্ঞ করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, তার অনুষ্ঠান করা। কিন্তু আজকালকার যুগে এই ধরনের যজ্ঞ করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং কোন গৃহস্থের পক্ষে তা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। এই যুগের জন্য শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। এই সংকীর্তন যজ্ঞ, অর্থাৎ **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করাই হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কম খরচের যজ্ঞ। যে কেউ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং তার সুফল লাভ করতে পারেন। সুতরাং দান, দম ও যজ্ঞ—এই তিনটি অনুষ্ঠান গৃহস্থের জন্য।

তারপর *স্বাধ্যায়* বা বেদপাঠ 'ব্রহ্মচর্য' বা ছাত্র-জীবনের জন্য। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্রহ্মচারীদের কোন রকম সংস্রব থাকা উচিত নয়; কৌমার্য অবলম্বন করে দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাদের জীবন যাপন করা উচিত। তাকে বলা হয় *স্বাধ্যায়*।

তপঃ বা তপশ্চর্যা বিশেষ করে বানপ্রস্থ আশ্রমের জন্য। সারা জীবন গৃহস্থ-জীবনে থাকা উচিত নয়। মানুষের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, মানব-জীবনে চারটি আশ্রম আছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমের পরে অবসর গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি একশ বছর বেঁচে থাকে, তা হলে তার উচিত পঁচিশ বছর ব্রহ্মচারী-জীবনে, পঁচিশ বছর গৃহস্থ-জীবনে, পঁচিশ বছর বানপ্রস্থ-জীবনে এবং পঁচিশ বছর সন্ন্যাস আশ্রমে অতিবাহিত করা। এগুলি হচ্ছে বৈদিক ধর্ম আচরণের নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ। বানপ্রস্থ আশ্রমে অবশ্যই দেহ, মন ও জিহ্বার তপশ্চর্যার অনুশীলন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে তপস্যা। সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্মপরায়ণ সমাজ তপস্যা করার জন্য। তপস্যা ছাড়া কোন মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে না। তপস্যা করার কোন প্রয়োজন নেই, নিজের ইচ্ছামতো এক-একটি পথ বার করলেই সিদ্ধি লাভ করা যাবে—এই মতবাদ বৈদিক শাস্ত্রে

কিংবা *ভগবদ্গীতায়* কোথাও অনুমোদন করা হয়নি। এই ধরনের মতবাদগুলি আবিষ্কার করেছে কতকগুলি ভণ্ড অধ্যাত্মবাদী, যারা কেবল লোক ঠকিয়ে দল ভারি করার ব্যাপারে ব্যস্ত। যদি বিধি-নিষেধ থাকে, নিয়মকানুন থাকে, তা হলে মানুষ আকৃষ্ট হবে না। তাই, ধর্মের নামে যারা শিষ্য বাড়াতে চায় কেবল লোক দেখানোর জন্য, তারা তাদের শিষ্যদের সংযত জীবন যাপন করার উপদেশ দেয় না এবং নিজেরাও সংযত জীবন যাপন করে না। কিন্তু *বেদে* সেই পন্থার অনুমোদন করা হয়নি।

ব্রাহ্মণের গুণ 'সরলতা' জীবনের কোন বিশেষ আশ্রমে মানুষদের অনুশীলনের জন্যই কেবল নয়, সকলেরই জন্য, তা সে ব্রহ্মচারী হোক, গৃহস্থ হোক, বানপ্রস্থী হোক অথবা সন্ন্যাসীই হোক না কেন। সকলেরই উচিত সরল জীবন যাপন করা।

অহিংসা অর্থ হচ্ছে কোন জীবের জীবনের ক্রমোন্নতি রোধ না করা। কারও এটি মনে করা উচিত নয় যে, দেহকে হত্যা করলেও যখন আত্মার বিনাশ হয় না, তখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য পশুহত্যা করলেও কোন ক্ষতি নেই। যথেষ্ট পরিমাণে শস্য, ফল এবং দুধ থাকা সত্ত্বেও এখনকার মানুষেরা পশুমাংস আহারে আসক্ত। পশুহত্যা করার কোনই প্রয়োজন নেই। এই নির্দেশ সকলেরই জন্য। যখন আর কোন বিকল্প উপায় থাকে না, তখন মানুষ পশুহত্যা করতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সেই পশুকে যজ্ঞের বলি হিসাবে নিবেদন করতে হয়। সে যাই হোক, মানুষের জন্য যথেষ্ট খাদ্য রয়েছে, যারা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে পশুহত্যা করা উচিত নয়। যথার্থ *অহিংসা* হচ্ছে কারওই জীবনের প্রগতি রোধ না করা। বিবর্তনের মাধ্যমে পশুরাও এক পশুদেহ থেকে অন্য পশুদেহে দেহান্তরিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। যদি কোনও এক বিশেষ পশুকে হত্যা করা হয়, তবে তার প্রগতি বাধা প্রাপ্ত হয়। কোন পশুর যখন কোন নির্দিষ্ট শরীরে কোন নির্দিষ্ট কাল অবস্থানের মেয়াদ থাকে, তখন যদি তাকে অপরিণত অবস্থায় হত্যা করা হয়, তা হলে তাকে বাকি সময়টি পূর্ণ করে উন্নততর প্রজাতিতে উন্নীত হওয়ার জন্য আবার সেই শরীর প্রাপ্ত হতে হয়। সুতরাং, কেবলমাত্র জিহ্বার তৃপ্তির জন্য ওদের প্রগতি রোধ করা উচিত নয়। একেই বলা হয় অহিংসা।

সত্যম্ শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সত্যের বিকৃত করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্রে কতকগুলি অতি কঠিন অধ্যায় আছে। কিন্তু তার অর্থ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে হবে সদ্গুরুর কাছ থেকে। *বেদ* উপলব্ধি করবার এটিই হচ্ছে পন্থা। *শ্রুতির* অর্থ হচ্ছে যে, তা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শ্রবণ করতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার কতকগুলি

আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতার* বহু ব্যাখ্যা আছে, যা *ভগবদ্গীতার* মূল বিষয়-বস্তুকে বিকৃত করেছে। *গীতার* বাণীর যথার্থ অর্থ প্রকাশ করতে হবে এবং তা শিখতে হবে সদ্গুরুর কাছ থেকে।

অক্রোধ কথাটির অর্থ হচ্ছে ক্রোধ দমন করা। ক্রোধের উদ্রেক হলেও সহিষ্ণু হয়ে তা দমন করতে হবে, কারণ একবার ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত শরীর কলুষিত হয়ে যায়। ক্রোধ হচ্ছে রজোগুণ ও কামের পরিণতি। সুতরাং যিনি অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁর পক্ষে ক্রোধ দমন করা অবশ্য কর্তব্য। *অপৈশুনম্* অর্থ হচ্ছে অনর্থক অপরের দোষ দর্শন না করা অথবা তাদের সংশোধন করা থেকে বিরত থাকা। অবশ্য একটি চোরকে চোর বলা পরনিন্দা নয়, কিন্তু একজন সাধুকে চোর বলা মস্ত বড় অপরাধ, বিশেষ করে যিনি পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁর পক্ষে। *হ্রী* অর্থ বিনয়ী হওয়া এবং কোন অবস্থাতেই কোন জঘন্য কর্ম না করা। *অচাপলম্* কথাটির অর্থ হচ্ছে কোন প্রচেষ্টাতেই উত্তেজিত বা নিরাশ না হওয়া। কোন কোন প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা আসতে পারে, কিন্তু সেই জন্য দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। ধৈর্য ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

এখানে *তেজ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ক্ষত্রিয়দের জন্য। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে দুর্বলকে রক্ষা করা। তাদের তথাকথিত অহিংসার নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। যদি হিংসার প্রয়োজন হয়, তা হলে তাদের তা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু শত্রুকে দমন করতে পারলে কোন কোন ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন করাও চলতে পারে। সামান্য দোষত্রুটি ক্ষমা করা যেতে পারে।

শৌচম্ অর্থ শুচিতা কেবল দেহ বা মনেরই নয়, আচরণেও মানুষকে শুচি হতে হবে। এটি বিশেষ করে বৈশ্যদের জন্য। তাদের কালোবাজারী করে অর্থ উপার্জন করা উচিত নয়। *নাতিমানিতা* অর্থাৎ অভিমান শূন্যতা বা সম্মানের আকাঙ্ক্ষা না করা শূদ্রদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে চতুর্বর্ণের সর্বনিম্ন। অনর্থক দম্ভ বা অভিমানে তাদের মত্ত হওয়া উচিত নয়, তাদের উচিত তাদের নিজস্ব স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। শূদ্রের কর্তব্য হচ্ছে সামাজিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য উচ্চতর বর্ণগুলিকে সম্মান প্রদর্শন করা।

যে ছাব্বিশটি গুণের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সব কয়টিই হচ্ছে দিব্য গুণাবলী। বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে তাদের অনুশীলন করা উচিত। এর তাৎপর্য হচ্ছে, যদিও জড় জগতের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ, তবুও সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকদের যদি অনুশীলনের মাধ্যমে এই গুণগুলি অর্জন করার শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হলে সমস্ত সমাজ ধীরে ধীরে তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ৪

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

দম্ভঃ—দম্ভ; **দর্পঃ**—দর্প; **অভিমান**—নিজেকে পূজ্যত্ব বুদ্ধি; **চ**—এবং; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **পারুষ্যম্**—রূঢ়তা; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান; **চ**—এবং; **অভিজাতস্য**—যার জন্ম হয়েছে তার; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **সম্পদম্**—সম্পদ; **আসুরীম্**—আসুরী।

গীতার গান

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ।
সম্পদ আসুরী হয় যথা অজ্ঞানতা ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, রূঢ়তা ও অবিবেক—এই সমস্ত সম্পদ আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে নরকে যাওয়ার প্রশস্ত রাজপথটির বর্ণনা করা হয়েছে। অসুরেরা মহা আড়ম্বরের সঙ্গে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি প্রদর্শন করতে চায়, যদিও তারা নিজেরা সেই সমস্ত নীতিগুলি অনুশীলন করে না। তারা সর্বদাই কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষা অথবা অত্যধিক সম্পদের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। তারা চায় যে, সকলেই তাদের পূজা করবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা সব সময় সকলের কাছ থেকে সম্মান দাবি করে, যদিও সম্মান পাবার কোন যোগ্যতাই তাদের নেই। খুব তুচ্ছ ব্যাপারে তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং কঠোর স্বরে কথা বলে। তাদের মধ্যে কোন রকম নম্রতা নেই। তারা জানে না তাদের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। তারা সকলেই তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে খামখেয়ালীর বশে কাজকর্ম করে এবং তারা কারও কর্তৃত্ব মানে না। এই সমস্ত আসুরিক গুণগুলি তারা মাতৃগর্ভে তাদের শরীর গঠনের সময়েই গ্রহণ করে থাকে এবং তারা যতই বড় হয়, এই সমস্ত অশুভ গুণগুলি ততই তাদের মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে।

শ্লোক ৫

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

দৈবী—দিব্য; **সম্পৎ**—সম্পদ; **বিমোক্ষায়**—মুক্তির নিমিত্ত; **নিবন্ধায়**—বন্ধনের কারণ; **আসুরী**—আসুরিক সম্পদ; **মতা**—বিবেচিত হয়; **মা**—করো না; **শুচঃ**—শোক; **সম্পদম্**—সম্পদ; **দৈবীম্**—দৈবী; **অভিজাতঃ**—জাত; **অসি**—হয়েছ; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডুপুত্র।

গীতার গান

দৈবী সম্পদ যে তার মুক্তির কারণ ।
আসুরী সম্পদ হয় সংসার বন্ধন ॥
তোমার চিন্তার কথা নাহি হে পাণ্ডব ।
দৈবী সম্পদে তোমার হয়েছে জনম ॥

অনুবাদ

দৈবী সম্পদ মুক্তির অনুকূল, আর আসুরিক সম্পদ বন্ধনের কারণ বলে বিবেচিত হয়। হে পাণ্ডুপুত্র! তুমি শোক করো না, কেন না তুমি দৈবী সম্পদ সহ জন্মগ্রহণ করেছ।

তাৎপর্য

আসুরিক গুণে যে অর্জুনের জন্ম হয়নি, সেই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এখানে উৎসাহিত করছেন। সেই যুদ্ধে তাঁর জড়িয়ে পড়ার কারণ আসুরিক ছিল না। কারণ, তিনি স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তিগুলির বিবেচনা করে দেখছিলেন। তিনি বিবেচনা করছিলেন, ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো সম্মানীয় পুরুষদের হত্যা করা ঠিক হবে কি না। সুতরাং তিনি ক্রোধ, দম্ভ অথবা নিষ্ঠুরতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছিলেন না। তাই, তিনি আসুরিক গুণসম্পন্ন ছিলেন না। শত্রুর উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং তার এই কর্ম থেকে নিরস্ত হওয়াকে আসুরিক বলে মনে করা হবে। সুতরাং, অর্জুনের শোক করার কোনই কারণ ছিল না। যিনি জীবনের বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচরণ করেন, তিনি দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৬

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

দ্বৌ—দুই প্রকার; **ভূতসর্গৌ**—সৃষ্ট জীব; **লোকে**—সংসারে; **অস্মিন্**—এই; **দৈবঃ**—দৈব; **আসুরঃ**—আসুরিক; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **দৈবঃ**—দৈব; **বিস্তরশঃ**—বিস্তারিতভাবে; **প্রোক্তঃ**—বলা হয়েছে; **আসুরম্**—আসুরিক; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **মে**—আমার থেকে; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

হে ভারত, এ জগতে দুই ভূত সৃষ্টি ।
এক দৈবী দ্বিতীয় সে আসুরী বা দৃষ্টি ॥
দৈবী যারা তার কথা অনেক হয়েছে ।
শুন এবে কথা যারা অসুর জন্মেছে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আসুরিক—এই দুই প্রকার জীব সৃষ্টি হয়েছে। দৈব সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এখন আমার থেকে অসুর প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

অর্জুন যে দিব্যগুণে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই আশ্বাস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসুরিক পন্থার বর্ণনা করছেন। এই জগতের বদ্ধ জীবদের দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যাঁরা দিব্যগুণে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেন, অর্থাৎ তাঁরা শাস্ত্র এবং সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের নির্দেশ মেনে চলেন। প্রামাণ্য শাস্ত্রের আলোকে কর্তব্য অনুষ্ঠান করা উচিত। এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় দিব্য। যারা শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি-নিষেধের অনুসরণ না করে তাদের নিজেদের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করে, তাদের বলা হয় আসুরিক। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের প্রতি অনুগত হওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেবতা ও অসুর উভয়েরই জন্ম হয় প্রজাপতি থেকে। তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, দেবতারা বৈদিক নির্দেশ মেনে চলেন এবং অসুরেরা তা মানে না।

শ্লোক ৭

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

প্রবৃত্তিম্—ধর্মে প্রবৃত্তি; **চ**—ও; **নিবৃত্তিম্**—অধর্ম থেকে নিবৃত্তি; **চ**—এবং; **জনাঃ**—ব্যক্তিরা; **ন**—না; **বিদুঃ**—জানে; **আসুরাঃ**—অসুর স্বভাব-বিশিষ্ট; **ন**—নেই; **শৌচম্**—শৌচ; **ন**—নেই; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **আচারঃ**—সদাচার; **ন**—নেই; **সত্যম্**—সত্যতা; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান।

গীতার গান

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যাহা অসুর না জানে ।
শৌচাচার সত্য মিথ্যা নাহি তারা মানে ॥

অনুবাদ

অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্ম বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না। তাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার ও সত্যতা বিদ্যমান নেই।

তাৎপর্য

প্রতিটি সভ্য মানব-সমাজে কতকগুলি শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন আছে, যেগুলি প্রথম থেকেই মেনে চলা হয়। বিশেষ করে আর্যদের, যারা বৈদিক সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে এবং যারা সভ্য মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলে পরিচিত। তাদের মধ্যে যারা শাস্ত্রের নির্দেশ মানে না, তাদের অসুর বলে গণ্য করা হয়। তাই এখানে বলা হচ্ছে যে, অসুরেরা শাস্ত্রের বিধান জানে না এবং তাদের মধ্যে কেউ যদি তা জেনেও থাকে, সেগুলি অনুসরণ করবার কোন প্রবৃত্তি তাদের নেই। ধর্মে তাদের বিশ্বাস নেই, আর *বেদের* নির্দেশ অনুসারে আচরণ করবার কোন ইচ্ছাও তাদের নেই। অসুরেরা অন্তরে ও বাইরে শুদ্ধ নয়। স্নান করে, দাঁত মেজে, কাপড় পরিবর্তন করে ইত্যাদি শৌচ পন্থায় দেহকে পরিষ্কার রাখার জন্য সর্বদাই যত্নশীল হওয়া উচিত। অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য সর্বদাই ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করা উচিত এবং **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। বাইরের ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতার এই সমস্ত নিয়মগুলি অনুসরণ করার কোন প্রবৃত্তি অসুরদের নেই।

মানুষের আচরণ যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য অনেক নিয়ম ও বিধান আছে, যেমন *মনুসংহিতা* হচ্ছে মনুষ্য-জাতির আইন শাস্ত্র। এমন কি আজও পর্যন্ত হিন্দুরা *মনুসংহিতা* অনুসরণ করে। উত্তরাধিকারের আইন ও অন্য অনেক আইন এই গ্রন্থ থেকে নিরূপণ করা হয়েছে। *মনুসংহিতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নারীদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের ক্রীতদাসীর মতো রাখতে হবে। তার অর্থ হচ্ছে তারা শিশুর মতো। শিশুদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাদের ক্রীতদাসের মতো রাখা হয়। অসুরেরা এই সমস্ত নির্দেশগুলি এখন অবহেলা করছে এবং তারা মনে করছে যে, পুরুষদের মতো নারীদেরও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সে যাই হোক, নারীদের এই স্বাধীনতা পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, জীবনের প্রতিটি স্তরে নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। শৈশবে তাদের পিতা-মাতার, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে উপযুক্ত সন্তানদের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। *মনুসংহিতার* নির্দেশ অনুসারে এটিই হচ্ছে যথার্থ সামাজিক আচরণ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কৃত্রিমভাবে নারী জীবনের ধারণাকে গর্বস্ফীত করবার উপায় উদ্ভাবন করেছে এবং তাই আজকের মানব-সমাজে বিবাহ-ব্যবস্থা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। আধুনিক যুগের নারীদের নৈতিক চরিত্রও অত্যন্ত অধঃপতিত হয়েছে। সুতরাং, অসুরেরা সমাজের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত নির্দেশ তা গ্রহণ করে না এবং যেহেতু তারা মহর্ষিদের অভিজ্ঞতা এবং মুনি-ঋষিদের প্রদত্ত আইন-কানুনগুলি মেনে চলে না, তাই আসুরিক-ভাবাপন্ন মানুষদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

শ্লোক ৮

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

অসত্যম্—মিথ্যা; **অপ্রতিষ্ঠম্**—অবলম্বনশূন্য; **তে**—তারা; **জগৎ**—জগৎ; **আহুঃ**—বলে; **অনীশ্বরম্**—ঈশ্বরশূন্য; **অপরস্পর**—পরস্পরের কাম থেকে; **সম্ভূতম্**—উৎপন্ন; **কিমন্যৎ**—অন্য কোন কারণ নেই; **কামহৈতুকম্**—কেবল কামের জন্য।

গীতার গান

অসুর যে লোক তারা না মানে ঈশ্বর ।
জগতের বিধাতা যিনি অস্বীকার তার ॥

সৃষ্টির কারণ সেই অনীশ্বরবাদী ।
জড় কার্যকারণ সে কামুক বিবাদী ॥

অনুবাদ

আসুরিক স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলে যে, এই জগৎ মিথ্যা, অবলম্বনহীন ও ঈশ্বরশূন্য। কামবশত এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং কাম ছাড়া আর অন্য কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা সিদ্ধান্ত করে যে, এই জগৎটি অলীক, এর পিছনে কোনও কার্য-কারণ নেই, এর কোন নিয়ন্তা নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই—সব কিছুই মিথ্যা। তারা বলে যে, ঘটনাচক্রে জড় পদার্থের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তারা তা মনে করে না। তাদের নিজেদের মনগড়া কতকগুলি মতবাদ আছে—এই জগৎ আপনা হতেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এর পেছনে যে ভগবান রয়েছেন, সেটি বিশ্বাস করার কোন কারণই নেই। তাদের কাছে চেতন ও জড়ের কোন পার্থক্য নেই এবং তারা পরম চেতনকে স্বীকার করে না। তাদের কাছে সবই কেবল জড় এবং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে একটি অজ্ঞানতার পিণ্ড। তাদের মত অনুসারে সব কিছুই শূন্য এবং যা কিছুরই অস্তিত্বের প্রকাশ দেখা যায়, তা কেবল আমাদের উপলব্ধির ভ্রম। তারা স্থির নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে যে, বৈচিত্র্যময় সমস্ত প্রকাশ হচ্ছে অজ্ঞানতা জনিত ভ্রম, ঠিক যেমন স্বপ্নে আমরা অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারি, প্রকৃতপক্ষে যাদের কোন অস্তিত্ব নেই। তারপর যখন আমরা জেগে উঠব, তখন আমরা দেখতে পাব যে, সব কিছুই কেবল একটি স্বপ্নমাত্র। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, অসুরেরা যদিও বলে যে, জীবন একটি স্বপ্নমাত্র, কিন্তু স্বপ্নটি উপভোগ করার ব্যাপারে তারা খুব দক্ষ। তাই, জ্ঞান আহরণ করার পরিবর্তে তারা এই স্বপ্নরাজ্যে আরও বেশি জড়িয়ে পড়ে। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনের ফলে যেমন একটি শিশুর জন্ম হয়, এই পৃথিবীরও কোন আত্মা ছাড়াই জন্ম হয়েছে। তাদের মতে, কেবলমাত্র জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলেই জীবসকলের উদ্ভব হয়েছে এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যেমন, দেহের ঘাম থেকে এবং মৃতদেহ থেকে কোন কারণ ছাড়াই অনেক প্রাণী বেরিয়ে আসে, তেমনই সমস্ত জগৎ এসেছে মহাজাগতিক প্রকাশের জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে। তাই জড়া প্রকৃতিই এই প্রকাশের কারণ এবং এ

ছাড়া অন্য আর কোন কারণ নেই। তারা *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।* "আমার অধ্যক্ষতায় সমস্ত জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে।" পক্ষান্তরে বলা যায়, অসুরদের জড় জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান নেই। তাদের সকলেরই নিজের নিজের একটি মতবাদ আছে। তাদের মতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তাদের মনগড়া মতবাদের মতোই একটি মতবাদ মাত্র। শাস্ত্রের নির্দেশ যে প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত, তারা তা বিশ্বাস করে না।

শ্লোক ৯

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

এতাম্—এই প্রকার; **দৃষ্টিম্**—সিদ্ধান্ত; **অবষ্টভ্য**—অবলম্বন করে; **নষ্টাত্মানঃ**—আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন; **অল্পবুদ্ধয়ঃ**—অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন; **প্রভবন্তি**—প্রভাব বিস্তার করে; **উগ্রকর্মাণঃ**—উগ্রকর্মা; **ক্ষয়ায়**—ধ্বংসের জন্য; **জগতঃ**—জগতের; **অহিতাঃ**—অনিষ্টকারী অসুরেরা।

গীতার গান

এই ক্ষুদ্র দৃষ্টি লয়ে অসুরের গণ ।
আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন অল্পবুদ্ধি হন ॥
উগ্র কর্মে উৎসাহ তার জগৎ অহিত ।
ক্ষয়কার্যে পটু তারা হয় প্রভাবিত ॥

অনুবাদ

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন, অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, উগ্রকর্মা ও অনিষ্টকারী অসুরেরা জগৎ ধ্বংসকারী কার্যে প্রভাব বিস্তার করে।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা যে ধরনের কাজকর্মে নিযুক্ত, তা পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। ভগবান এখানে বলেছেন যে, তারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন। জড়বাদীরা, যাদের ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই, তারা মনে করে যে, তারা উন্নত। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে তারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সব রকমের

কাণ্ডজ্ঞানহীন। তারা চরমভাবে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চেষ্টা করে। তাই, তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সর্বদাই কিছু না কিছু আবিষ্কার করতে ব্যস্ত। এই ধরনের জড় আবিষ্কারগুলিকে মানব-সভ্যতার উন্নতি বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু তার ফলে মানুষেরা আরও বেশি নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়ে উঠছে, পশুর প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে এবং অন্য মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। পরস্পরের মধ্যে কি রকম আচরণ করা উচিত, তার কোন ধারণাই তাদের নেই। আসুরিক মানুষদের মধ্যে পশুহত্যার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। এই ধরনের মানুষকে পৃথিবীর শত্রু বলে গণ্য করা হয়, কারণ অবশেষে একদিন তারা এমন একটা কিছু তৈরি করবে বা আবিষ্কার করবে, যা সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করবে। পরোক্ষভাবে, এই শ্লোকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারের আভাস দেওয়া হচ্ছে, যে সম্বন্ধে আজ সারা জগৎ গর্বিত। যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে এবং তখন এই সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রগুলি ব্যাপক ধ্বংস সাধন করবে। এই প্রকার জিনিস সৃষ্টি হয়েছে কেবলমাত্র জগৎকে ধ্বংস করবার জন্য এবং এখানে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নাস্তিকতার প্রভাবে মানব-সমাজে যে ধরনের অস্ত্রগুলি আবিষ্কার করা হচ্ছে, সেগুলি জগতের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নয়।

শ্লোক ১০

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

কামম্—কামকে; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় করে; **দুষ্পূরম্**—দুষ্পূরণীয়; **দম্ভ**—দম্ভ; **মান**—মান; **মদান্বিতাঃ**—মদমত্ত হয়ে; **মোহাৎ**—মোহবশত; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **অসৎ**—অনিত্য; **গ্রাহান্**—বিষয়ে; **প্রবর্তন্তে**—প্রবৃত্ত হয়; **অশুচি**—অশুচি কার্যে; **ব্রতাঃ**—ব্রতী হয়।

গীতার গান

দুষ্পূর আশ্রয় কাম দম্ভ মদান্বিত ।
মোহগ্রস্ত অসদগ্রাহ অশুচিব্রত ॥

অনুবাদ

সেই আসুরিক ব্যক্তিগণ দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় করে দম্ভ, মান ও মদমত্ত হয়ে অশুচি কার্যে ব্রতী হয় এবং মোহবশত অসৎ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে আসুরিক মনোবৃত্তির বর্ণনা করা হয়েছে। অসুরদের কাম কখনও তৃপ্ত হয় না। তাদের জাগতিক সুখভোগের তৃপ্তিহীন বাসনা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকে। যদিও অনিত্য বস্তু গ্রহণ করার ফলে তারা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, তবুও মোহের বশে তারা এই ধরনের কাজকর্মে প্রতিনিয়তই নিযুক্ত থাকে। তাদের কোন রকম জ্ঞান নেই এবং তারা বুঝতে পারে না যে, তারা ভুল পথে এগিয়ে চলেছে। অনিত্য বস্তুকে গ্রহণ করার ফলে এই ধরনের আসুরিক মানুষেরা তাদের মনগড়া ভগবান তৈরি করে, তাদের মনগড়া মন্ত্র তৈরি করে এবং তা কীর্তন করে। তার ফলে তারা জড় জগতের দুটি বস্তুর প্রতি আরও বেশি করে আকৃষ্ট হতে থাকে—যৌন সুখভোগ এবং জড় সম্পদ সঞ্চয়। *অশুচিব্রতাঃ* কথাটি এই সূত্রে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধরনের আসুরিক মানুষেরা কেবল মদ, স্ত্রীলোক, মাংসাহার ও জুয়াখেলার প্রতি আসক্ত। সেগুলি হচ্ছে তাদের অভ্যাস। দম্ভ ও ভ্রান্ত সম্মানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা কতকগুলি ধর্মনীতি তৈরি করে, যা বৈদিক অনুশাসনের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। যদিও এই ধরনের আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে জঘন্য শ্রেণীর জীব, তবুও কৃত্রিম উপায়ে এই জগৎ তাদের জন্য মিথ্যা সম্মান তৈরি করেছে। যদিও তারা নরকের দিকে এগিয়ে চলেছে, তবুও তারা নিজেদের খুব উন্নত বলে মনে করে।

শ্লোক ১১-১২

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

চিন্তাম্—দুশ্চিন্তা; **অপরিমেয়াম্**—অপরিমেয়; **চ**—এবং; **প্রলয়ান্তাম্**—মৃত্যুকাল পর্যন্ত; **উপাশ্রিতাঃ**—আশ্রয় করে; **কামোপভোগ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকে; **পরমাঃ**—জীবনের পরম উদ্দেশ্য; **এতাবৎ ইতি**—এভাবে; **নিশ্চিতাঃ**—নিশ্চয় করে; **আশাপাশ**—আশারূপ রজ্জুর দ্বারা; **শতৈঃ**—শত শত; **বদ্ধাঃ**—আবদ্ধ হয়ে; **কাম**—কাম; **ক্রোধ**—ক্রোধ; **পরায়ণাঃ**—পরায়ণ হয়ে; **ঈহন্তে**—চেষ্টা করে; **কাম**—কাম; **ভোগ**—উপভোগের; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **অন্যায়েন**—অসৎ উপায়ে; **অর্থ**—ধন-সম্পদ; **সঞ্চয়ান্**—সঞ্চয়ের।

গীতার গান

অপরেয় চিন্তা তার যতদিন বাঁচে ।
কামমাত্র উপভোগ হৃদয়েতে আছে ॥
শত শত আশা পাশ শুধু কাম ক্রোধ ।
কামভোগ লাগি অর্থ অন্য সে বিরোধ ॥
অন্যায় সে করে নিত্য সঞ্চয়েতে ।
চিত্ত তার নিত্য বিদ্ধ অসৎ কার্যেতে ॥

অনুবাদ

অপরিমেয় দুশ্চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই তারা তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। এভাবেই শত শত আশাপাশে আবদ্ধ হয়ে এবং কাম ও ক্রোধ-পরায়ণ হয়ে তারা কাম উপভোগের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

তাৎপর্য

অসুরেরা মনে করে যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করাই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং মৃত্যু পর্যন্ত তারা এই ভাবধারা পোষণ করে চলে। তারা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না এবং কর্ম অনুসারে জীব যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের শরীর প্রাপ্ত হয়, তাও তারা বিশ্বাস করে না। জীবন সম্বন্ধে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা কখনও শেষ হয় না। তারা একটির পর একটি পরিকল্পনা করে চলে, কিন্তু কোনটিই পূর্ণ হয় না। এই রকম একজন মানুষের সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, যিনি মৃত্যুর সময়ে ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর আয়ু আরও চার বছর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ তাঁর পরিকল্পনাগুলি তখনও পূর্ণ হয়নি। এই ধরনের মূর্খ লোকেরা জানে না যে, ডাক্তার এমন কি এক মুহূর্তের জন্যও কারও আয়ু বর্ধিত করতে পারে না। মৃত্যুর পরোয়ানা যখন আসে, তখন মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোনও বিবেচনাই করা হয় না। প্রকৃতির আইন দৈব-নির্ধারিত সময়ের বেশি আর এক মুহূর্ত সময়ও মঞ্জুর করে না।

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা, যাদের ভগবান বা অন্তর্যামী পরমাত্মার উপর কোন বিশ্বাস নেই, তারা কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সব রকমের পাপকর্ম করে চলে। তারা জানে না যে, তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সাক্ষীরূপে একজন বসে আছেন।

জীবাত্মার সমস্ত কাজকর্ম পরমাত্মা নিরীক্ষণ করছেন। *উপনিষদে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—একটি গাছে দুটি পাখি বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন সেই গাছের ফলগুলি ভোগ করে এবং অন্যজন তার সমস্ত কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করে চলে। কিন্তু যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, তাদের বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই এবং সেই সম্বন্ধে বিশ্বাস নেই। তাই তারা পরিণামের বিবেচনা না করে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে কোনও কাজ করতে প্রস্তুত থাকে।

শ্লোক ১৩-১৬

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

ইদম্—এই; **অদ্য**—আজ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **লব্ধম্**—লাভ হয়েছে; **ইমম্**—এই; **প্রাপ্স্যে**—লাভ করব; **মনোরথম্**—আমার মনোভীষ্ট অনুসারে; **ইদম্**—এই; **অস্তি**—আছে; **ইদম্**—এই; **অপি**—ও; **মে**—আমার; **ভবিষ্যতি**—হবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ধনম্**—সম্পদ; **অসৌ**—ঐ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **শত্রুঃ**—শত্রু; **হনিষ্যে**—আমি হত্যা করব; **চ**—ও; **অপরান্**—অন্যদের; **অপি**—অবশ্যই; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **অহম্**—আমি; **অহম্**—আমি; **ভোগী**—ভোক্তা; **সিদ্ধঃ**—সিদ্ধ; **অহম্**—আমি; **বলবান্**—শক্তিশালী; **সুখী**—সুখী; **আঢ্যঃ**—ধনবান; **অভিজনবান্**—অভিজাত আত্মীয়স্বজন পরিবৃত; **অস্মি**—হই; **কঃ**—কে; **অন্যঃ**—অন্য; **অস্তি**—আছে; **সদৃশঃ**—মতো; **ময়া**—আমার; **যক্ষ্যে**—যজ্ঞ করব; **দাস্যামি**—দান করব; **মোদিষ্যে**—আনন্দ করব; **ইতি**—এভাবে; **অজ্ঞান**—অজ্ঞান দ্বারা; **বিমোহিতাঃ**—বিমোহিত হয়; **অনেক**—বহু প্রকার; **চিত্তবিভ্রান্তাঃ**—দুশ্চিন্তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে; **মোহ**—মোহ; **জাল**—জালের দ্বারা; **সমাবৃতাঃ**—বিজড়িত হয়ে; **প্রসক্তাঃ**—আসক্ত চিত্ত সেই ব্যক্তিরা; **কাম**—কাম; **ভোগেষু**—ভোগে; **পতন্তি**—পতিত হয়; **নরকে**—নরকে; **অশুচৌ**—অশুচি।

গীতার গান

অদ্য এই অর্থলাভ মনোরথ সিদ্ধি ।
পুনর্বার ভবিষ্যতে হবে অর্থ বৃদ্ধি ॥
সে শত্রু মরিল অন্য নিশ্চয় মারিব ।
আমি সে ঈশ্বর ধনী সে কার্য সাধিব ॥
আমি ভোগী সিদ্ধ আর বলবান সুখী ।
মম সম কেহ নহে আর সব দুঃখী ॥
আমি অভিজনবান আমি ধনআঢ্য ।
আমার সমান হবে কার কিবা সাধ্য ॥
আমি সে করিব যজ্ঞ আমি দান দিব ।
স্ত্রীসঙ্গ করিয়া আমি আনন্দ পাইব ॥
অজ্ঞান মোহিত হয়ে কত কথা বলে ।
মোহজাল সমাবৃত কালের কবলে ॥
আসলেতে কামাসক্ত নরকের যাত্রী ।
অশুচি নরকে বাস নরক বিধাতৃ ॥

অনুবাদ

অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা মনে করে—"আজ আমার দ্বারা এত লাভ হয়েছে এবং আমার পরিকল্পনা অনুসারে আরও লাভ হবে। এখন আমার এত ধন আছে এবং ভবিষ্যতে আরও ধন লাভ হবে। ঐ শত্রু আমার দ্বারা নিহত হয়েছে এবং অন্যান্য শত্রুদেরও আমি হত্যা করব। আমিই ঈশ্বর, আমি ভোক্তা। আমিই সিদ্ধ, বলবান ও সুখী। আমি সবচেয়ে ধনবান এবং অভিজাত আত্মীয়স্বজন পরিবৃত। আমার মতো আর কেউ নেই। আমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করব, দান করব এবং আনন্দ করব।" এভাবেই অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা অজ্ঞানের দ্বারা বিমোহিত হয়। নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে এবং মোহজালে বিজড়িত হয়ে কামভোগে আসক্তচিত্ত সেই ব্যক্তিরা অশুচি নরকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের ধন-সম্পদ আহরণ করার বাসনার কোন অন্ত নেই। তা অসীম। তারা কেবল চিন্তা করে কি পরিমাণ অর্থ তার এখন আছে এবং

সেই অর্থকে আরও বাড়াবার জন্য নানা রকম বিনিয়োগের পরিকল্পনা করে। সেই উদ্দেশ্যে যে কোন রকম পাপকর্ম করতে তারা দ্বিধা করে না এবং তাই তারা কালোবাজারী আদি অবৈধ কাজকর্মে লিপ্ত হয়। তারা তাদের সঞ্চিত অর্থ, গৃহ, জায়গা-জমি, পরিবার আদি সমস্ত সম্পদের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে থাকে এবং তারা সর্বদাই পরিকল্পনা করে কিভাবে সেগুলির আরও উন্নতি সাধন করা যায়। তারা তাদের নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের উপরে আস্থাবান এবং তারা জানে না যে, যা কিছু তারা লাভ করছে, তা সবই তাদের পূর্বকৃত পুণ্যকর্মেরই ফল মাত্র। এই ধরনের সমস্ত ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ তারা পায়। কিন্তু তার কারণ যে তাদের পূর্বকৃত কর্ম, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা মনে করে যে, তাদের সঞ্চিত ঐশ্বর্য তারা তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলেই আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর আস্থাবান। তারা কর্মফলে বিশ্বাস করে না। মানুষ তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে অথবা ধনবান হয়, অথবা উচ্চ শিক্ষিত হয় কিংবা রূপবান হয়। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ মনে করে যে, সমস্তই ঘটনাচক্রে এবং তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে ঘটে চলেছে। বিভিন্ন রকমের মানুষের রূপ, গুণ, শিক্ষা আদির পেছনে যে এক অতি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা রয়েছে, তা তারা অনুভব করতে পারে না। কেউ যদি এই সমস্ত আসুরিক মানুষদের প্রতিযোগী হয়, তা হলে তারা তাদের শত্রুতে পরিণত হয়। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ অসংখ্য এবং তারা সকলেই একে অপরের শত্রু। এই শত্রুতা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে—প্রথমে ব্যক্তিগত, তারপর পরিবারে পরিবারে, তারপর সমাজে, অবশেষে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের। তাই, জগৎ জুড়ে সর্বদাই বিবাদ, যুদ্ধ ও শত্রুতা লেগেই রয়েছে।

প্রতিটি আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষই মনে করে যে, অন্য সকলকে বলি দিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে। সাধারণত আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা নিজেদের পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে এবং আসুরিক প্রচারকেরা তাদের অনুগামীদের বলে— "তোমরা ভগবানকে খুঁজছ কেন? তোমরা সকলেই ভগবান! তোমাদের যা ইচ্ছা, তাই তোমরা করতে পার। ভগবানকে বিশ্বাস করো না। ভগবানকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। ভগবান মরে গেছে।" এগুলি হচ্ছে আসুরিক প্রচার।

আসুরিক মানুষ যদিও দেখতে পায় যে, অন্যেরা তারই মতো বা তার থেকে অধিক বিত্তবান বা ক্ষমতাবান, তবুও সে মনে করে যে, কেউই তার থেকে অধিক ধনবান বা ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। উচ্চতর গ্রহলোকে যাবার জন্য যজ্ঞ করার যে প্রয়োজন, তা তারা বিশ্বাস করে না। অসুরেরা মনে করে যে, তারা তাদের

নিজেদের মনগড়া যজ্ঞবিধি তৈরি করবে এবং কোন রকম যন্ত্র আবিষ্কার করবে, যার দ্বারা তারা যে কোন উচ্চতর গ্রহলোকে যেতে পারবে। এই ধরনের অসুরদের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাবণ। সে তার অনুগত জনদের বুঝিয়ে ছিল যে, স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাদের সে একটি সিঁড়ি তৈরি করে দেবে—যাতে কোন রকম বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান না করেই যে কেউ তাতে চড়ে স্বর্গলোকে যেতে পারবে। তেমনই, আধুনিক যুগের আসুরিক মানুষেরা যান্ত্রিক উপায়ে উচ্চতর লোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এগুলি হচ্ছে ভ্রান্তির নিদর্শন। তার ফলে তারা তাদের অজান্তেই নরকের দিকে অধঃপতিত হচ্ছে। এখানে *মোহজাল* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জালে যেমন মাছ ধরা হয়, এই মোহরূপ জালে জীবেরা তেমন আবদ্ধ হয়ে আছে এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় নেই।

শ্লোক ১৭

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ—আত্মাভিমানী; **স্তব্ধাঃ**—অনম্র; **ধনমান**—ধন ও মানে; **মদান্বিতাঃ**—মদমত্ত; **যজন্তে**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে; **নাম**—নামমাত্র; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **তে**—তারা; **দম্ভেন**—দম্ভ সহকারে; **অবিধিপূর্বকম্**—শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করে।

গীতার গান

আত্ম-সম্ভাবিত মান ধনেতে অনম্র ।
মদান্বিত অসুর সে সর্বদা বিনম্র ॥
নামমাত্র যজ্ঞ করে শাস্ত্রে বিধি নাই ।
দম্ভমাত্র আছে সার কেবল বড়াই ॥

অনুবাদ

সেই আত্মাভিমানী, অনম্র এবং ধন ও মানে মদান্বিত ব্যক্তিরা অবিধিপূর্বক দম্ভ সহকারে নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।

তাৎপর্য

নিজেদের সর্বেসর্বা বলে মনে করে এবং কোন রকম অধ্যক্ষতা অথবা প্রামাণ্য শাস্ত্রের পরোয়া না করে অসুরেরা তথাকথিত ধর্মানুষ্ঠান বা যজ্ঞবিধির অনুষ্ঠান করে থাকে। যেহেতু তারা নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক সূত্র বিশ্বাস করে না, তাই তারা অত্যন্ত

উদ্ধত। তার কারণ হচ্ছে সঞ্চিত ধন-সম্পদ ও অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা মোহাচ্ছন্ন। কখনও কখনও এই ধরনের অসুরেরা ধর্মপ্রচারক সেজে জনসাধারণকে বিপথগামী করে এবং ধর্ম সংস্কারক বা ভগবানের অবতার রূপে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করে। তারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ভান করে, অথবা দেব-দেবীর পূজা করে, অথবা নিজেদের মনগড়া ভগবান তৈরি করে। সাধারণ লোক তাদের ভগবান বলে মনে করে তাদের পূজা করে। মূর্খ লোকেরা তাদের ধর্মজ্ঞ বা দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন বলে মনে করে। তারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে সব রকম অপকর্মে লিপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তাদের প্রতি নানা রকম বিধি-নিষেধের নির্দেশ রয়েছে। অসুরেরা কিন্তু এই সমস্ত বিধি-নিষেধের ধার ধারে না। তাদের মতে কোন নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করার দরকার নেই। যার যার নিজের মত অনুযায়ী এক-একটি পথ বার করে নিলে চলে। *অবিধিপূর্বকম্* অর্থাৎ কোন বিধি-নিষেধের পরোয়া না করা কথাটির উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞতা ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলেই এগুলি হয়।

শ্লোক ১৮

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অহঙ্কারম্—অহঙ্কার; **বলম্**—বল; **দর্পম্**—দর্প; **কামম্**—কাম; **ক্রোধম্**—ক্রোধকে; **চ**—ও; **সংশ্রিতাঃ**—আশ্রয় করে; **মাম্**—আমাকে; **আত্ম**—স্বীয়; **পর**—অন্যের; **দেহেষু**—দেহে অবস্থিত; **প্রদ্বিষন্তঃ**—বিদ্বেষ করে; **অভ্যসূয়কাঃ**—সাধুদের গুণেতে দোষারোপ করে।

গীতার গান

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধাশ্রয় ।
আমার সম্পর্কে দেহে দ্বেষ সে করয় ॥
অসূয়ার বশে চিন্তা স্বপর অপরে ।
সাধুর গুণেতে দোষ কিংবা নিন্দা করে ॥

অনুবাদ

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করে অসুরেরা স্বীয় দেহে ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং সাধুদের গুণেতে দোষারোপ করে।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা সর্বদাই ভগবানের মহত্ত্বের বিরোধিতা করে এবং তাই তারা শাস্ত্রের নির্দেশ বিশ্বাস করতে চায় না। তারা শাস্ত্র ও পরম পুরুষোত্তম ভগবান উভয়েরই প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের তথাকথিত জড় প্রতিষ্ঠা, তাদের সঞ্চিত সম্পদ, তাদের শক্তিসামর্থ্য, এগুলিই হচ্ছে তাদের এই মনোভাবের কারণ। তারা জানে না যে, তাদের এই জীবনটি হচ্ছে তাদের পরবর্তী জীবনকে গড়ে তোলার একটি মহান সুযোগ। সেটি না জেনে তারা অন্য সকলের প্রতি এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেরও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। সে অপরের শরীরের প্রতি হিংস্র আচরণ করে এবং তাদের নিজের শরীরেও হিংস্র আচরণ করে। তারা পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের পরোয়া করে না, কারণ তাদের কোন জ্ঞানই নেই। শাস্ত্র বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করবার জন্য নানা রকম কপট প্রমাণের অবতারণা করে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ খণ্ডন করার চেষ্টা করে। তারা মনে করে যে, সব রকম কর্ম করার শক্তি ও স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। তারা মনে করে যে, যেহেতু শক্তি, সামর্থ্য অথবা বিত্তে কেউই তাদের সমকক্ষ নয়, তাই তারা যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারে, কেউই তাকে বাধা দিতে পারবে না। তাদের কোন শত্রু যদি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কার্যকলাপে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তখন তারা তাকে সমূলে বিনাশ করার পরিকল্পনা করে।

শ্লোক ১৯

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

তান্—তাদের; **অহম্**—আমি; **দ্বিষতঃ**—বিদ্বেষী; **ক্রূরান্**—ক্রূর; **সংসারেষু**—ভবসমুদ্রে; **নরাধমান্**—নরাধমদের; **ক্ষিপামি**—নিক্ষেপ করি; **অজস্রম্**—অনবরত; **অশুভান্**—অশুভ; **আসুরীষু**—আসুরী; **এব**—অবশ্যই; **যোনিষু**—যোনিতে।

গীতার গান

সেই সে বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমগণে ।
নিত্য সে ক্ষেপণ করি সংসার গহনে ॥

অনুবাদ

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর ও নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে অবিরত নিক্ষেপ করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছার প্রভাবেই জীবাত্মা কোন বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়। আসুরিক মানুষেরা ভগবানের পরমেশ্বরত্ব অস্বীকার করে যথেচ্ছাচার করতে পারে। কিন্তু তাদের পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই ইচ্ছা অনুসারে—তাদের নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে জীবাত্মা কোন বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উচ্চতর শক্তির তত্ত্বাবধানে মাতৃজঠরে স্থাপিত হয়। তাই জড় জগতে আমরা পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, মানুষ আদি নানা রকমের প্রজাতির প্রকাশ দেখতে পাই। এদের প্রকাশ হয়েছে উচ্চতর শক্তির প্রভাবে। ঘটনাচক্রে এদের উদ্ভব হয়নি। অসুরদের সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, তারা বারবার অসুরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং এভাবেই তারা চিরকাল ঈর্ষাপরায়ণ নরাধমরূপে থাকে। এই ধরনের আসুরিক জীবন সর্বদাই কামার্ত, সর্বদাই অত্যাচারী ও কুৎসিত এবং সর্বদাই অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তারা ঠিক জঙ্গলের শিকারীদের মতো আসুরিক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

শ্লোক ২০

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

আসুরীম্—আসুরী; **যোনিম্**—যোনি; **আপন্নাঃ**—লাভ করে; **মূঢ়াঃ**—সেই মূঢ়গণ; **জন্মনি জন্মনি**—জন্মে জন্মে; **মাম্**—আমাকে; **অপ্রাপ্য**—না পেয়ে; **এব**—অবশ্যই; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **ততঃ**—তার থেকে; **যান্তি**—প্রাপ্ত হয়; **অধমাম্**—অধম; **গতিম্**—গতি।

গীতার গান

অসুর যোনিতে হয় জনম মরণ ।
অজস্র অশুভ তার জীবন যাপন ।

অসুরের ঘরে মূঢ় জনমে জনমে ।
আমাকে ভুলিয়া দুঃখী মরমে মরমে ॥
ক্রমে ক্রমে পায় সেই অধমা যে গতি ।
অক্ষম আমাকে পেতে যেহেতু কুমতি ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সকলেই জানে যে, ভগবান হচ্ছেন পরম করুণাময়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভগবান অসুরদের প্রতি কখনই করুণাময় নন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা জন্ম-জন্মান্তরে অসুরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা ক্রমান্বয়ে অধঃপতিত হতে হতে অবশেষে কুকুর, বেড়াল ও শূকরের শরীর প্রাপ্ত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের অসুরদের পরবর্তী কোন জীবনেই ভগবানের কৃপা লাভ করার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। *বেদেও* বলা হয়েছে যে, এই ধরনের মানুষেরা ক্রমান্বয়ে নিমজ্জিত হতে হতে অবশেষে কুকুর ও শূকরের শরীর প্রাপ্ত হয়। এখন এই সম্বন্ধে বিতর্কের উত্থাপন করে কেউ বলতে পারে যে, ভগবান যদি এই সমস্ত অসুরদের প্রতি কৃপা-পরায়ণ না হন, তা হলে তাঁকে কৃপাময় বলে জাহির করা উচিত নয়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, *বেদান্তসূত্রে* উল্লেখ আছে, পরমেশ্বর ভগবান কাউকেই ঘৃণা করেন না। অসুরদের যে সবচেয়ে অধঃপতিত জীবন দান করেন, তাও তাঁর কৃপারই এক রকম প্রকাশ। কখন কখন অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানের হাতে নিহত হয়, কিন্তু এভাবেই ভগবানের হাতে নিহত হওয়াও তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ, বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবানের হাতে মৃত্যু হলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হয়। ইতিহাসে রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু আদি বহু অসুরের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে—তাদের হত্যা করবার জন্য ভগবান নানারূপে অবতরণ করেছেন। সুতরাং, ভগবানের কৃপা অসুরদের উপরেও বর্ষিত হয় যদি তারা ভগবানের হাতে নিহত হবার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

শ্লোক ২১

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

ত্রিবিধম্—তিনটি; **নরকস্য**—নরকের; **ইদম্**—এই; **দ্বারম্**—দ্বার; **নাশনম্**—নাশকারী; **আত্মনঃ**—আত্মার; **কামঃ**—কাম; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **তথা**—ও; **লোভঃ**—লোভ; **তস্মাৎ**—অতএব; **এতৎ**—এই; **ত্রয়ম্**—তিনটি; **ত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করবে।

গীতার গান

সেই কাম, ক্রোধ, লোভ, নরকের দ্বার ।
ত্যজ তাহা নয় তিন সাধু ব্যবহার ॥

অনুবাদ

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বার, অতএব ঐ তিনটি পরিত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

এখানে আসুরিক জীবনের কিভাবে শুরু হয়, তার বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ কাম উপভোগ করবার চেষ্টা করে এবং তার অতৃপ্তিতে তার চিত্তে ক্রোধ ও লোভের উদয় হয়। সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন যে মানুষ আসুরিক জীবনে অধঃপতিত হতে না চায়, তাকে অবশ্যই এই তিনটি শত্রুর সঙ্গ বর্জন করতে হবে। এই তিনটি শত্রু আত্মাকে এমনভাবে হত্যা করে, যার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

শ্লোক ২২

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

এতৈঃ—এই; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **তমোদ্বারৈঃ**—তমোময় দ্বার থেকে; **ত্রিভিঃ**—তিন প্রকার; **নরঃ**—মানুষ; **আচরিত**—আচরণ করেন; **আত্মনঃ**—আত্মার; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **ততঃ**—অনন্তর; **যাতি**—লাভ করেন; **পরাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি।

গীতার গান

এই তিনে মুক্ত যারা শুন হে কৌন্তেয় ।
তমোগুণের দ্বার সেই অতিশয় হেয় ॥
তবে সে আচরি ধর্ম নিজ শ্রেয়স্কর ।
পরাগত লাভ করে মম ভক্তি পর ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! এই তিন প্রকার তমোদ্বার থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ আত্মার শ্রেয় আচরণ করেন এবং তার ফলে পরাগতি লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

মানব জীবনের তিনটি শত্রু—কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে মানুষ যতই মুক্ত হয়, তার জীবন ততই নির্মল হয়। তখন সে বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধের অনুশীলন করতে সক্ষম হয়। মানব-জীবনের বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হতে পারে। এই প্রকার অনুশীলনের ফলে কেউ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, তা হলে তার সাফল্য অনিবার্য। বৈদিক শাস্ত্রে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমন্বিত যথাযথ কর্ম আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষকে নির্মল জীবনের স্তরে উন্নীত করবার জন্য। সেই সমগ্র পন্থাটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করার উপর। এই পন্থায় জ্ঞান অনুশীলন করার ফলে আত্ম-উপলব্ধির চরম স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে এই আত্ম-উপলব্ধির পূর্ণতা লাভ হয়। এই ভক্তিযোগে বদ্ধ জীবের মুক্তি অনিবার্য। তাই, বৈদিক প্রথায় চারটি বর্ণ ও জীবনের চারটি আশ্রমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বলা হয় দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম। সমাজে বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান নির্দিষ্ট হয়েছে এবং কেউ যদি যথাযথভাবে সেগুলি আচরণ করে, তা হলে আপনা থেকেই সে আধ্যাত্ম উপলব্ধির চরম স্তরে উন্নীত হতে পারবে। তখন সে নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ২৩

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

যঃ—যে; **শাস্ত্রবিধিম্**—শাস্ত্রবিধি; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **বর্ততে**—বর্তমান থাকে; **কামকারতঃ**—কামাচারে; **ন**—না; **সঃ**—সে; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **অবাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **ন**—না; **সুখম্**—সুখ; **ন**—না; **পরাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি।

গীতার গান

শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগে কাম আচরণ।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি নহে তাহে সুখ গতিপর ॥

অনুবাদ

যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কামাচারে বর্তমান থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা পরাগতি লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

পূর্বেই বলা হয়েছে, মানব-সমাজে বিভিন্ন বর্ণের ও আশ্রমের জন্য শাস্ত্রবিধি বা শাস্ত্রীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত বিধিগুলি অনুশীলন করা। কেউ যদি সেই নির্দেশগুলি অনুশীলন না করে কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হয়ে নিজের খেয়ালখুশি মতো জীবন যাপন করতে থাকে, তা হলে সে কখনই সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, কোন মানুষ সিদ্ধান্তগতভাবে এই সমস্ত শাস্ত্রনির্দেশ সম্বন্ধে অবগত থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি তার নিজের জীবনে সেগুলিকে আচরণ না করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে একটি নরাধম। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত জীবের কাছে এটিই প্রত্যাশা করা হয় যে, সে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য শাস্ত্র-নির্দেশগুলি অনুশীলন করবে। সে যদি তা না করে, তা হলে তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সমস্ত বিধি-নিষেধ ও নৈতিক আচার-অনুষ্ঠান করেও সে যদি ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে উন্নীত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার সমস্ত জ্ঞানই ব্যর্থ হয়েছে। আর এমন কি ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করেও যদি সে ভগবানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত না করে, তবে বুঝতে হবে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ। তাই, ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনামৃত ও ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হবে। তখনই কেবল সিদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোন উপায়েই তা সম্ভব নয়।

কামকারতঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞাতসারে মানুষ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে কাম আচরণ করে। সেই আচরণগুলি নিষিদ্ধ জেনেও যদি তা আচরণ করা হয়, তাকে বলা হয় খেয়ালখুশি মতো আচরণ করা। সে জানে যে, সেগুলি অনুশীলন

করা উচিত, কিন্তু তবুও সে তা করে না, তাই তাকে বলা হয় খামখেয়ালী। এই সমস্ত মানুষদের পরিণতি হচ্ছে যে, তারা ভগবানের দ্বারা দণ্ডিত হয়। মানব-জীবনের যে চরম সিদ্ধি, তা তারা কখনই লাভ করতে পারে না। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনকে পবিত্র করা এবং যারা শাস্ত্রবিধির অনুশীলন করে না, আচরণ করে না, তারা কখনই পবিত্র হতে পারে না এবং তারা যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ২৪

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **শাস্ত্রম্**—শাস্ত্র; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **তে**—তোমার; **কার্য**—কর্তব্য; **অকার্য**—অকর্তব্য; **ব্যবস্থিতৌ**—নির্ধারণে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **শাস্ত্র**—শাস্ত্রের; **বিধান**—বিধান; **উক্তম্**—কথিত হয়েছে; **কর্ম**—কর্ম; **কর্তুম্**—করতে; **ইহ**—এই; **অর্হসি**—যোগ্য হও।

গীতার গান

অতএব শাস্ত্রবিধি কার্যের প্রমাণ ।
জানি শাস্ত্রবিধি কর কার্য সমাধান ॥

অনুবাদ

অতএব, কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রীয় বিধানে কথিত হয়েছে যে কর্ম, তা জেনে তুমি সেই কর্ম করতে যোগ্য হও।

তাৎপর্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সমস্ত বৈদিক বিধি ও নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। কেউ যদি *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরে কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তিনি বৈদিক শাস্ত্র প্রদত্ত জ্ঞানের চরম সিদ্ধির স্তরে উপনীত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পন্থাকে অত্যন্ত সরল করে দিয়ে গেছেন। তিনি মানুষকে কেবল **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে, ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হতে এবং ভগবৎ

প্রসাদ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যিনি এভাবেই ভক্তিমূলক কর্মধারায় প্রত্যক্ষভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, তিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রাদি অনুশীলন করেছেন বলেই বুঝতে হবে। তিনি সঠিকভাবে বৈদিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অবশ্যই, যারা কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেনি, তাদের পক্ষে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার করে কর্ম করা উচিত। কোন রকম কুতর্ক না করে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে যাওয়া উচিত। তাকেই বলা হয় শাস্ত্রবিধির আচরণ করা। শাস্ত্র হচ্ছে চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং বদ্ধ জীবের যে চারটি ত্রুটি আছে, সেগুলি হচ্ছে—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব (ভুল করার প্রবণতা, মোহগ্রস্ত হওয়া, প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা ও অপূর্ণ ইন্দ্রিয়াদি)। এই চারটি প্রধান ত্রুটি থাকার জন্য বদ্ধ জীব বিধিনিয়ম রচনার অযোগ্য। সেই কারণেই শাস্ত্রোক্ত বিধিনিয়মগুলি এই চারটি ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বলে সমস্ত মহামুনি, ঋষি, আচার্য ও মহাত্মাগণ শাস্ত্রের নির্দেশগুলিকে কোনও রকম পরিবর্তন না করে গ্রহণ করেছেন।

ভারতবর্ষে অনেক আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় রয়েছে, যেগুলি সাধারণত দুভাগে বিভক্ত—নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী। তাঁরা উভয়েই অবশ্য বৈদিক নির্দেশ অনুসারেই জীবন যাপন করেন। শাস্ত্রনির্দেশ অনুশীলন না করে কখনই সিদ্ধি লাভ করা যায় না। তাই, যিনি যথার্থভাবে শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনিই ভাগ্যবান।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করার পন্থা অবলম্বন না করার ফলেই মানব-সমাজে অধঃপতন দেখা দেয়। মানব-জীবনে সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ। তাই, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া সর্বদাই আমাদের ত্রিতাপ দুঃখ দিয়ে চলেছে। এই বহিরঙ্গা শক্তি জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত। পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে হলে অন্তত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হবে। সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে না পারলে মানুষ রজ ও তমোগুণের স্তরে থেকে যায়, যা আসুরিক জীবনের কারণ। যারা রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তারা শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে, সাধুদের অবজ্ঞা করে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতেও অবজ্ঞা করে। তারা সদ্‌গুরুকে অমান্য করে এবং তারা শাস্ত্র-নির্দেশের কোন রকম পরোয়া করে না। ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এভাবেই তারা নিজেদের মনগড়া উন্নতির পন্থা আবিষ্কার করে। এগুলি মানব-সমাজের কতকগুলি ত্রুটি, যা মানুষকে আসুরিক জীবনের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু সে যদি সদ্‌গুরুর দ্বারা পরিচালিত

হয়ে যথার্থ মঙ্গলের পথ অবলম্বন করে যথার্থ উন্নতির স্তরে উন্নীত হতে পারে, তা হলেই তার জীবন সার্থক হয়।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—দৈব ও আসুরিক প্রকৃতিগুলির পরিচয় বিষয়ক 'দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; যে—যারা; শাস্ত্রবিধিম্—শাস্ত্রের বিধান; উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; যজন্তে—পূজা করে; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; অন্বিতাঃ—যুক্ত হয়ে; তেষাম্—তাদের; নিষ্ঠা—নিষ্ঠা; তু—কিন্তু; কা—কি রকম; কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণে; আহো—অথবা; রজঃ—রজোগুণে; তমঃ—তমোগুণে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

শাস্ত্রবিধি নাহি জানে কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত ।
যজন করয়ে যারা কিবা তার হিত ॥
কিবা নিষ্ঠা তার কৃষ্ণ সত্ত্ব, রজ, তম ।
বিস্তার কহ'ত সেই শুনি ইচ্ছা মম ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ! যারা শাস্ত্রীয় বিধান পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের সেই নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক?

তাৎপর্য

চতুর্থ অধ্যায়ের ঊনচত্বারিংশত্তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কোনও বিশেষ ধরনের আরাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবান হলে কালক্রমে জ্ঞান লাভ হয় এবং পরা শান্তি ও সমৃদ্ধির পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। ষোড়শ অধ্যায়ের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, যারা শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধির অনুশীলন করে না, তাদের বলা হয় অসুর এবং যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রের অনুশাসনাদি মেনে চলেন, তাঁদের বলা হয় সুর বা দেব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে কোন নীতির অনুশীলন করে যার উল্লেখ শাস্ত্রে নেই, তার কি অবস্থা? অর্জুনের মনের এই সংশয় শ্রীকৃষ্ণকে দূর করতে হবে। যারা একটি মানুষকে বেছে নিয়ে তার উপর বিশ্বাস অর্পণ করে এক ধরনের ভগবান তৈরি করে নেয়, তারা কি সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, কিংবা তমোগুণের বশবর্তী হয়ে আরাধনা করতে থাকে? ঐ ধরনের লোকেরা কি জীবনে সিদ্ধি লাভের পর্যায়ে উপনীত হয়? তাদের পক্ষে কি যথার্থ জ্ঞান লাভ করে পরম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব? যারা শাস্ত্রবিধির অনুশীলন করে না, কিন্তু শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন দেব-দেবীর ও মানুষের পূজা করে, তারা কি তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে? অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **ত্রিবিধা**—তিন প্রকার; **ভবতি**—হয়; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **দেহিনাম্**—দেহীদের; **সা**—তা; **স্বভাবজা**—স্বভাব-জনিত; **সাত্ত্বিকী**—সাত্ত্বিকী; **রাজসী**—রাজসী; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **তামসী**—তামসী; **চ**—এবং; **ইতি**—এভাবে; **তাম্**—তা; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

স্বভাবজ তিন নিষ্ঠা শ্রদ্ধা সে দেহীর ।
সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী গভীর ॥
বিবরণ কহি তার শুন দিয়া মন ।
যার যেবা শ্রদ্ধা হয় গুণের কারণ ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—দেহীদের স্বভাব-জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। এখন সেই সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

যারা শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও আলস্য বা বৈমুখ্যবশত এই সমস্ত বিধির অনুশীলন করে না, তারা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাদের পূর্বকৃত সত্ত্বগুণ, রজোগুণ অথবা তমোগুণাশ্রিত কর্ম অনুসারে তারা বিশেষ ধরনের প্রকৃতি অর্জন করে। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলীর সঙ্গে জীবের আসঙ্গ চিরকাল ধরেই চলে আসছে; যেহেতু জীবসত্তা জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে, সেই জন্য জড় গুণের সঙ্গে তার আসঙ্গ অনুসারে সে বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা অর্জন করে থাকে। কিন্তু যদি সে কোনও সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভ করে এবং তার নির্দেশিত অনুশাসনাদি ও শাস্ত্রাদি মেনে চলে, তা হলে তার প্রকৃতি বদলাতে পারা যায়। ক্রমশ, সেভাবেই মানুষ তম থেকে রজ, কিংবা রজ থেকে সত্ত্বে তার অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। এই থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রকৃতির কোনও এক বিশেষ গুণের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের ফলে মানুষ পূর্ণ সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। সব কিছুই সতর্কতার সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে, সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে বিবেচনা করতে হয়। এভাবেই মানুষ প্রকৃতির উচ্চতর গুণগত পর্যায়ে নিজের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

শ্লোক ৩

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

সত্ত্বানুরূপা—অন্তঃকরণের অনুরূপ; সর্বস্য—সকলের; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; ভবতি—হয়; ভারত—হে ভারত; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; ময়ঃ—পূর্ণ; অয়ম্—এই; পুরুষঃ—জীব; যঃ—যে; যৎ—যেই রকম; শ্রদ্ধঃ—শ্রদ্ধা; সঃ—সেই প্রকার; এব—অবশ্যই; সঃ—সে।

গীতার গান

নিজ সত্ত্ব অনুরূপা শ্রদ্ধা সে ভারত ।
শ্রদ্ধাময় পুরুষ যে শ্রদ্ধা যে তেমত ॥

অনুবাদ

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধা নিজ-নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়। যে যেই রকম গুণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেই রকম শ্রদ্ধাবান।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষেরই, সে যেই হোক না কেন, কোন বিশেষ ধরনের শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু তার স্বভাব অনুসারে সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয়। এভাবেই তার বিশেষ শ্রদ্ধা অনুসারে সে এক-এক ধরনের মানুষের সঙ্গ করে। এখন প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রতিটি জীবই মূলত পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ-বিশেষ। তাই, মূলত প্রতিটি জীবই জড়া প্রকৃতির এই সমস্ত গুণের অতীত। কিন্তু কেউ যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং বদ্ধ জীবনে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন সে বৈচিত্র্যময় জড়া প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে নিজের অবস্থান গড়ে তোলে। তার ফলে তার যে কৃত্রিম বিশ্বাস ও উপাধি তা জড়-জাগতিক। কেউ যদিও কতকগুলি সংস্কার বা ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে নির্গুণ বা গুণাতীত। তাই, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে তার জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে। সেটিই হচ্ছে নির্ভয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পন্থা—কৃষ্ণভাবনামৃত। কৃষ্ণভাবনামৃত যিনি লাভ করেছেন, তিনি নিশ্চিতভাবে সিদ্ধ স্তরে অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু কেউ যদি আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা অবলম্বন না করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিচালিত হবেন।

এই শ্লোকে *শ্রদ্ধা* অর্থাৎ 'বিশ্বাস' কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *শ্রদ্ধা* অর্থাৎ বিশ্বাসের প্রথম উদয় হয় সত্ত্বগুণের মাধ্যমে। কারও শ্রদ্ধা দেব-দেবীর প্রতি অথবা মনগড়া কোন ভগবান কিংবা কোন রকম অলীক কল্পনার প্রতি থাকতে পারে। এই যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, তা জড় জগতের সত্ত্বগুণের কর্ম থেকে উদ্ভূত। কিন্তু জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবনে কোন কাজই পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ নয়। সেগুলি হয় মিশ্র প্রকৃতির। সেগুলি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব হচ্ছে অপ্রাকৃত; সেই শুদ্ধ সত্ত্বে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারা যায়। কারও শ্রদ্ধা যতক্ষণ পর্যন্ত না শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা জড়া প্রকৃতির যে কোন গুণের দ্বারা কলুষিত হতে পারে। জড়া প্রকৃতির কলুষিত গুণগুলি হৃদয়ে বিস্তার লাভ করে। অতএব জড়া প্রকৃতির বিশেষ কোন গুণের সংস্পর্শে হৃদয়ের স্থিতি অনুসারে জীবের শ্রদ্ধার প্রকাশ হয়। বুঝতে হবে যে, কারও হৃদয় যদি সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধা হবে সাত্ত্বিক। তার হৃদয় যদি রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধা হবে রাজসিক এবং তার হৃদয় যদি তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে বা মোহাচ্ছন্ন থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধাও হবে সেই রকমই কলুষিত। এভাবেই এই জগতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দেখতে পাই এবং ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের থেকে নানা রকম ধর্মের উদয় হয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসের যথার্থ তত্ত্ব শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত, কিন্তু হৃদয় কলুষিত হয়ে পড়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের উদয় হয়। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস অনুসারে নানা রকম উপাসনা পদ্ধতির উদ্ভব হয়।

শ্লোক ৪

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

যজন্তে—পূজা করে; **সাত্ত্বিকাঃ**—সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা; **দেবান্**—দেবতাদের; **যক্ষরক্ষাংসি**—যক্ষ ও রাক্ষসদের; **রাজসাঃ**—রাজসিক ব্যক্তিরা; **প্রেতান্**—প্রেতাত্মাদের; **ভূতগণান্**—ভূতদের; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যেরা; **যজন্তে**—পূজা করে; **তামসাঃ**—তামসিক; **জনাঃ**—ব্যক্তিরা।

গীতার গান

সাত্ত্বিকী যে শ্রদ্ধা সেই পূজে দেবতারে ।
রাজসী যে শ্রদ্ধা পূজে যক্ষ রাক্ষসেরে ॥

তামসী যে শ্রদ্ধা তাহে ভূতপ্রেত পূজে ।
যার যেই শ্রদ্ধা হয় সেই তথা ভজে ॥

অনুবাদ

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতাত্মাদের পূজা করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বিভিন্ন ধরনের উপাসকদের বহিরঙ্গা কর্মধারা অনুসারে তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র উপাস্য, কিন্তু যারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নয় অথবা শ্রদ্ধাবান নয়, তারা তাদের জড়া প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপাসনা করে থাকে। যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তারা সাধারণত দেব-দেবীদের পূজা করে। এই সমস্ত দেব-দেবীরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি। এই রকম অনেক দেব-দেবী আছেন। যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে। তেমনই, যারা রজোগুণে অধিষ্ঠিত তারা যক্ষ, রাক্ষস আদির পূজা করে। আমাদের মনে আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় কোন এক ব্যক্তি হিটলারের পূজা করতে শুরু করে, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে সে কালোবাজারী করে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পেরেছিল। তেমনই যারা রজ বা তমোগুণে আচ্ছন্ন, তারা সাধারণত কোন শক্তিশালী মানুষকে ভগবান বলে নির্ধারণ করে। তারা মনে করে, যে-কোন জনকেই ভগবান বলে পূজা করা যায় এবং তাতে একই রকম ফল লাভ করা যায়।

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা রাজসিক তারা এই ধরনের ভগবান তৈরি করে তাদের পূজা করে এবং যারা তামসিক, তারা ভূত-প্রেত আদির পূজা করে। কিছু লোককে কোন মৃতলোকের সমাধিতে গিয়ে পূজা করতে দেখা যায়। যৌন আচারগুলিকেও তামসিক আচার বলে গণ্য করা হয়। তেমনই, ভারতের অজ পাড়াগাঁয়ে ভূত-প্রেতের পূজার প্রচলন দেখা যায়। ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি যে, নিম্ন স্তরের লোকেরা যদি জানতে পারে যে, জঙ্গলে কোন গাছে ভূত আছে, তা হলে তারা নানা রকম নৈবেদ্য অর্পণ করে সেই গাছের পূজা করে।

এই রকম যে সমস্ত পূজা তা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের আরাধনা নয়। ভগবৎ উপাসনা হচ্ছে তাঁদের জন্য, যাঁরা গুণাতীত শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/৩/২৩) বলা হয়েছে, *সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্*—"কোন মানুষ যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন, তিনি তখন বাসুদেবের আরাধনা করেন।" এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, যারা জড় জগতের সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তারাই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন।

নির্বিশেষবাদীরাও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে মনে করা হয় এবং তারা পাঁচ রকমের দেব-দেবীর উপাসনা করে। তারা জড় জগতে নির্বিশেষ বিষ্ণুরূপ বা মনোধর্ম-প্রসূত বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসনা করে। বিষ্ণু হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশ, কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বিশ্বাস করে না, তাই তারা কল্পনা করে যে, বিষ্ণুরূপও নির্বিশেষ ব্রহ্মের একটি রূপ মাত্র। তেমনই, তারা মনে করে যে, ব্রহ্মাও হচ্ছেন রজোগুণের নির্বিশেষ প্রকাশ মাত্র। এভাবেই তারা পাঁচ জন উপাস্য দেব-দেবীর কথা বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু যেহেতু তারা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই পরিণামে তারা সব উপাস্য বস্তুকে পরিত্যাগ করে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বৈশিষ্ট্যগুলি গুণাতীত ব্যক্তির সান্নিধ্যের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হতে পারে।

শ্লোক ৫-৬

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

অশাস্ত্রবিহিতম্—শাস্ত্রবিরুদ্ধ; **ঘোরম্**—অপরের পক্ষে ক্ষতিকর; **তপ্যন্তে**—তপশ্চর্যা অনুষ্ঠান করে; **যে**—যারা; **তপঃ**—তপস্যা; **জনাঃ**—ব্যক্তিগণ; **দম্ভ**—দম্ভ; **অহঙ্কার**—অহঙ্কার; **সংযুক্তাঃ**—যুক্ত; **কাম**—কাম; **রাগ**—আসক্তি; **বল**—বল; **অন্বিতাঃ**—বিশিষ্ট; **কর্ষয়ন্তঃ**—ক্লেশ প্রদান করে; **শরীরস্থম্**—শরীরস্থ; **ভূতগ্রামম্**—ভূতসমূহকে; **অচেতসঃ**—অবিবেকী; **মাম্**—আমাকে; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **অন্তঃ**—অন্তরে; **শরীরস্থম্**—দেহস্থিত; **তান্**—তাদের; **বিদ্ধি**—জানবে; **আসুর**—আসুরিক; **নিশ্চয়ান্**—নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করি যে তপস্যা করে ।
দম্ভ দর্প কাম রাগ যুক্ত অহঙ্কারে ॥
বৃথা উপবাস করে ক্লেশ সহিবারে ।
শরীরেতে ভূতগণে মূর্খ কর্শিবারে ॥
আমাকেও অন্তর্যামী শরীর ভিতরে ।
আসুরিক জান সেই তার ব্যবহারে ॥

অনুবাদ

দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত এবং কামনা ও আসক্তির প্রভাবে বলান্বিত হয়ে যে সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তি তাদের দেহস্থ ভূতসমূহকে এবং অন্তরস্থ পরমাত্মাকে ক্লেশ প্রদান করে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, তাদেরকে নিশ্চিতভাবে আসুরিক বলে জানবে।

তাৎপর্য

কিছু মানুষ আছে যারা নানা রকম তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন উদ্ভাবন করে, যা শাস্ত্রবিধানে উল্লেখ নেই। যেমন, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনশন করা। এই ধরনের অনশন করার কথা শাস্ত্রে বলা হয়নি। শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে কেবলমাত্র পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই অনশন করা উচিত। কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা করা উচিত নয়। এই ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যারা তপশ্চর্যা করে; *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে যে, তারা অবশ্যই আসুরিক ভাবাপন্ন। তাদের কার্যকলাপ শাস্ত্রবিধির বিরোধী এবং তার ফলে জনসাধারণের কোন মঙ্গল হয় না। প্রকৃতপক্ষে, তারা গর্ব, অহঙ্কার, কাম ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে ঐ সমস্ত কর্ম করে। এই ধরনের কাজকর্মের ফলে যে সমস্ত জড় উপাদান দিয়ে দেহ তৈরি হয়েছে তা-ই যে কেবল বিক্ষুব্ধ হয় তা নয়, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যিনি এই শরীরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তিনিও ক্ষুব্ধ হন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরনের অবিধিপূর্বক অনশন বা তপস্যা অপরের কাছেও একটি উৎপাত-স্বরূপ। এই রকম তপশ্চর্যার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা মনে করতে পারে যে, এই উপায় অবলম্বন করে তারা তাদের শত্রুকে অথবা অন্য দলকে তাদের ইচ্ছা

অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য করাতে পারে, কিন্তু এই ধরনের অনশনের ফলে অনেক সময় তাদের মৃত্যু ঘটে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই ধরনের কাজ অনুমোদন করেননি এবং তিনি বলেছেন যে, যারা এই ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হয়, তারা অসুর। এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিও অসম্মানসূচক, কারণ বৈদিক শাস্ত্রের অনুশাসন আদি অমান্য করে তা করা হয়। অচেতসঃ কথাটি এই সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুস্থ স্বাভাবিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা অবশ্যই শাস্ত্রের অনুশাসনগুলি পালন করে চলেন। যারা তেমন মনোভাবাপন্ন নয়, তারা শাস্ত্রের নির্দেশ অবহেলা করে তাদের নিজেদের মনগড়া তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থা উদ্ভাবন করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষের যে পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব সময় মনে রাখা উচিত। ভগবান তাদের আসুরিক যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তার ফলে তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা জানতে না পেরে, জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক জীবন যাপন করতে থাকবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ধরনের মানুষেরা যদি সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করতে পারে, যিনি তাদের বৈদিক জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করেন, তা হলেই তারা এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অবশেষে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

শ্লোক ৭

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

আহারঃ—আহার; **তু**—অবশ্যই; **অপি**—ও; **সর্বস্য**—সকলের; **ত্রিবিধঃ**—তিন প্রকার; **ভবতি**—হয়; **প্রিয়ঃ**—প্রীতিকর; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **তপঃ**—তপস্যা; **তথা**—তেমনই; **দানম্**—দান; **তেষাম্**—তাদের; **ভেদম্**—প্রভেদ; **ইমম্**—এই; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

আহারও ত্রিবিধ সে যথাযথ প্রিয় ।
সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী যে হেয় ॥
যজ্ঞ, জপ, তপ, দান সেও সে ত্রিবিধ ।
যার যেবা ভেদ গুণ ভিন্ন বহুবিধ ॥

অনুবাদ

সকল মানুষের আহারও তিন প্রকার প্রীতিকর হয়ে থাকে। তেমনই যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ। এখন তাদের এই প্রভেদ শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে আহার, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপশ্চর্যা ও দান বিভিন্নভাবে সাধিত হয়। এই সমস্ত একই পর্যায়েই অনুষ্ঠিত হয় না। যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন যে, জড় জগতের কোন্ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন্ কর্ম সাধিত হয়েছে, তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞানী। যারা মনে করে, সব রকমের যজ্ঞ, খাদ্য অথবা দান সমপর্যায়ভুক্ত, তাদের পার্থক্য নিরূপণ করবার ক্ষমতা নেই, তারা মূর্খ। কিছু ধর্ম-প্রচারক এখন প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, মানুষ নিজের ইচ্ছামতো যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারে এবং এই ধরনের যথেচ্ছাচার করার ফলেই তাদের পরমার্থ সাধিত হবে। কিন্তু এই ধরনের মূর্খ প্রচারকেরা বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের অনুসরণ করছে না। তারা নিজেদের মনগড়া পন্থা তৈরি করে জনসাধারণকে বিপথগামী করছে।

শ্লোক ৮

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; **সত্ত্ব**—অস্তিত্ব; **বল**—বল; **আরোগ্য**—আরোগ্য; **সুখ**—সুখ; **প্রীতি**—প্রীতি; **বিবর্ধনাঃ**—বর্ধনকারী; **রস্যাঃ**—রসযুক্ত; **স্নিগ্ধাঃ**—স্নিগ্ধ, **স্থিরাঃ**—স্থায়ী; **হৃদ্যাঃ**—মনোরম; **আহারাঃ**—আহার্য; **সাত্ত্বিক**—সাত্ত্বিক লোকদের; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়।

গীতার গান

আয়ু সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতি বাড়ে ।
রস্য স্নিগ্ধ স্থির হৃদ্য সাত্ত্বিক আহারে ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত আহার আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধনকারী এবং রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও মনোরম, সেগুলি সাত্ত্বিক লোকদের প্রিয়।

শ্লোক ৯

কট্‌বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

কটু—তিক্ত; **অম্ল**—টক; **লবণ**—লবণাক্ত; **অত্যুষ্ণ**—অতি উষ্ণ; **তীক্ষ্ণ**—তীক্ষ্ণ; **রুক্ষ**—শুষ্ক; **বিদাহিনঃ**—প্রদাহকর; **আহারাঃ**—আহার; **রাজসস্য**—রাজসিক ব্যক্তিদের; **ইষ্টাঃ**—প্রিয়; **দুঃখ**—দুঃখ; **শোক**—শোক; **আময়প্রদাঃ**—রোগপ্রদ।

গীতার গান

কটু অম্ল লবণাক্ত অতি উষ্ণ যেই ।
জ্বালা পোড়া আময়ী রাজসিক সেই ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত আহার অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ, সেগুলি রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।

শ্লোক ১০

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

যাতযামম্—আহারের তিন ঘণ্টা আগে রান্না করা খাদ্য; **গতরসম্**—রসহীন; **পূতি**—দুর্গন্ধযুক্ত; **পর্যুষিতম্**—বাসী; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **উচ্ছিষ্টম্**—অন্যের উচ্ছিষ্ট; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অমেধ্যম্**—অমেধ্য দ্রব্য; **ভোজনম্**—আহার; **তামস**—তামসিক লোকদের; **প্রিয়ম্**—প্রিয়।

গীতার গান

বাসী শৈত্য গতরস পচা বা দুর্গন্ধ ।
উচ্ছিষ্ট অমেধ্য যেই খাদ্য তমসান্ধ ॥

অনুবাদ

আহারের এক প্রহরের অধিক পূর্বে রান্না করা খাদ্য, যা নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অমেধ্য দ্রব্য, সেই সমস্ত তামসিক লোকদের প্রিয়।

তাৎপর্য

খাদ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ু বর্ধন করা, মনকে পবিত্র করা এবং শরীরের শক্তি দান করা। সেটিই হচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য। পুরাকালে মুনি-ঋষিরা বলদায়ক, আয়ুবর্ধক সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন করে গেছেন, যেমন দুগ্ধজাত খাদ্য, শর্করা, অন্ন, গম, ফল ও শাক-সবজি। যারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, তাদের কাছে এই ধরনের খাদ্য অত্যন্ত প্রিয়। অন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য, যেমন ভুট্টার খই ও গুড় খুব একটা সুস্বাদু নয়, কিন্তু দুধ বা অন্য কোন খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে সেগুলি খুব সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তখন সেগুলি সাত্ত্বিক আহারে পরিণত হয়। এই সমস্ত খাদ্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মদ্য, মাংস আদি অস্পৃশ্য বস্তু থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অষ্টম শ্লোকে যে স্নিগ্ধ বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে হত্যা করা পশুর চর্বির কোন সম্পর্ক নেই। সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে খাদ্য দুধ, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহ পদার্থ আছে। দুধ, মাখন, ছানা এবং এই জাতীয় পদার্থে যে পরিমাণ স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়, তাতে আর নিরীহ পশু হত্যা করার কোন প্রয়োজন থাকে না। শুধুমাত্র পাশবিক মনোবৃত্তির ফলেই এই সমস্ত পশু হত্যা হয়ে চলেছে। সভ্য উপায়ে স্নেহ পদার্থ পাওয়ার পন্থা হচ্ছে দুধ। নরপশুরাই কেবল পশু হত্যা করে থাকে। ছোলা, মটর, গম আদিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন বা অন্নসার পাওয়া যায়।

রাজসিক খাদ্য হচ্ছে সেই সমস্ত খাদ্য, যা তিক্ত, অত্যন্ত লবণাক্ত বা অতি উষ্ণ অথবা অতিরিক্ত শুকনো লঙ্কা মিশ্রিত, যার ফলে উদরে কফ উৎপন্ন হয়ে শ্লেষ্মা প্রদান করে এবং অবশেষে রোগ দেখা দেয়। আর তামসিক আহার হচ্ছে সেগুলি, যা টাটকা নয়। যে খাদ্য আহার করার কম করে তিন ঘণ্টা আগে রান্না করা হয়েছে (ভগবৎ প্রসাদ ব্যতীত) তা তামসিক আহার বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু তা পচতে শুরু করেছে, তাই এই সমস্ত খাদ্য দুর্গন্ধযুক্ত। সেগুলি তমোগুণ-সম্পন্ন মানুষকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তা সহ্য করতে পারে না।

উচ্ছিষ্ট খাদ্য তখনই গ্রহণ করা উচিত যদি তা পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদিত

হয় অথবা তা যদি সাধু মহাত্মার, বিশেষ করে গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট হয়। তা না হলে উচ্ছিষ্ট খাদ্য তামসিক বলে গণ্য করা হয় এবং তার ফলে রোগ সংক্রামিত হয়। এই ধরনের খাদ্য তামসিক লোকদের কাছে যদিও খুব সুস্বাদু বলে মনে হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরা এই ধরনের খাদ্য পছন্দ করেন না, এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। শ্রেষ্ঠ খাদ্য হচ্ছে সেই খাদ্য, যা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, শাক-সবজি, ময়দা, দুগ্ধ আদি থেকে প্রস্তুত আহার্য যখন ভক্তি সহকারে তাঁকে নিবেদন করা হয়, তিনি তখন তা গ্রহণ করেন। *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*। অবশ্য, ভক্তি ও প্রেম হচ্ছে মুখ্য বস্তু, যা পরম পুরুষোত্তম ভগবান গ্রহণ করেন। কিন্তু এটিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ বস্তু দিয়ে বিশেষভাবে প্রসাদ তৈরি করতে হয়। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে প্রস্তুত এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ বহু বহু দিন পূর্বে প্রস্তুত হলেও তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্য চিন্ময়। তাই সব মানুষের জন্য খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত, আহার্য ও সুস্বাদু করে তুলতে হলে, সেগুলি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদন করা উচিত।

শ্লোক ১১

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **বিধিদিষ্টঃ**—শাস্ত্রের বিধি অনুসারে; **যঃ**—যে; **ইজ্যতে**—অনুষ্ঠিত হয়; **যষ্টব্যম্**—অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; **এব**—অবশ্যই; **ইতি**—এভাবেই; **মনঃ**—মনকে; **সমাধায়**—একাগ্র করে; **সঃ**—তা; **সাত্ত্বিকঃ**—সাত্ত্বিক।

গীতার গান

অফলাকাঙ্ক্ষী যে যজ্ঞ বিধিমত হয় ।
কর্তব্য যে মনে করে সাত্ত্বিকী সে কয় ॥

অনুবাদ

ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এভাবেই মনকে একাগ্র করে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, কোনও রকম ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। কর্তব্যবোধে আমাদের যজ্ঞ করা উচিত। মন্দির ও গির্জাগুলিতে যেভাবে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান করা হয়, তা সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন নয়। কর্তব্যবোধে মানুষের মন্দিরে বা গির্জায় যাওয়া উচিত এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা ও নৈবেদ্য নিবেদন করা উচিত। সকলেই মনে করে যে, কেবল ভগবানের আরতি করার জন্য মন্দিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু অর্থ লাভের জন্য ভগবানের উপাসনার কথা শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়নি। ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্যই সেখানে যাওয়া উচিত। তার ফলে মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভ্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

শ্লোক ১২

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

অভিসন্ধায়—কামনা করে; **তু**—কিন্তু; **ফলম্**—ফল; **দম্ভ**—দম্ভ; **অর্থম্**—প্রকাশের জন্য; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **যৎ**—যে যজ্ঞ; **ইজ্যতে**—অনুষ্ঠিত হয়; **ভরতশ্রেষ্ঠ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; **তম্**—তাকে; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **বিদ্ধি**—জানবে; **রাজসম্**—রাজসিক।

গীতার গান

মূলে অভিসন্ধি যার আকাঙ্ক্ষা ফলেতে ।
রাজসিক যজ্ঞ হয় দম্ভের সহিতে ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ফল কামনা করে দম্ভ প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে।

তাৎপর্য

কখনও কখনও স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য অথবা কোন জাগতিক লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে যজ্ঞ ও বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করা হয়। এই ধরনের যজ্ঞ বা আচার অনুষ্ঠান রাজসিক বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ১৩

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

বিধিহীনম্—শাস্ত্রবিধি বর্জিত; **অসৃষ্টান্নম্**—প্রসাদান্ন বিতরণবিহীন; **মন্ত্রহীনম্**—বৈদিক মন্ত্রহীন; **অদক্ষিণম্**—দক্ষিণা রহিত; **শ্রদ্ধাবিরহিতম্**—শ্রদ্ধাহীন; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞকে; **তামসম্**—তামসিক; **পরিচক্ষতে**—বলা হয়।

গীতার গান

বিধি অন্নহীন নাহি মন্ত্র বা দক্ষিণা ।
শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ সেই তমসা আচ্ছন্না ॥

অনুবাদ

শাস্ত্রবিধি বর্জিত, প্রসাদান্ন বিতরণহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

তমোগুণে শ্রদ্ধা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে অশ্রদ্ধা। কখনও কখনও মানুষ টাকা-পয়সা লাভের আশায় কোন কোন দেব-দেবীর পূজা করে থাকে এবং তারপর শাস্ত্র-নির্দেশের সম্পূর্ণ অবহেলা করে নানা রকম আমোদ-প্রমোদে সমস্ত অর্থ ব্যয় করে। এই ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ লোকদেখানো ধর্ম অনুষ্ঠানকে কৃত্রিম বলে অভিহিত করা হয়। এই সমস্তই হচ্ছে তামসিক। তার ফলে আসুরিক মনোভাবের উদয় হয় এবং মানব-সমাজের তাতে কোন মঙ্গল সাধিত হয় না।

শ্লোক ১৪

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

দেব—পরমেশ্বর ভগবান; দ্বিজ—ব্রাহ্মণ; গুরু—গুরু; প্রাজ্ঞ—পূজনীয় ব্যক্তিগণের; পূজনম্—পূজা; শৌচম্—শৌচ; আর্জবম্—সরলতা; ব্রহ্মচর্যম্—ব্রহ্মচর্য; অহিংসা—অহিংসা; চ—ও; শারীরম্—কায়িক; তপঃ—তপস্যা; উচ্যতে—বলা হয়।

গীতার গান

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ যে সব পূজন ।
শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্যের পালন ॥
সেই সব সিদ্ধ হয় শরীর তপস্যা ।
অনুদ্বেগকর বাক্য কিংবা প্রিয় পোষ্য ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এগুলিকে কায়িক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এখানে বিভিন্ন ধরনের তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমে তিনি কায়িক তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলেছেন। পরমেশ্বর ভগবানকে, দেব-দেবীকে, সিদ্ধ পুরুষকে, সদ্‌ব্রাহ্মণকে, সদ্‌গুরুকে এবং পিতা-মাতা আদি গুরুজনদেরকে অথবা যাঁরা বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত, তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা করা উচিত অথবা তাদের শ্রদ্ধা করার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এদের সকলকে যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত। বাইরে ও অন্তরে নিজেকে পরিষ্কার রাখার অনুশীলন করা উচিত এবং আচার ব্যবহারে সহজ সরল হতে শেখা উচিত। শাস্ত্রে যা অনুমোদন করা হয়নি, তা কখনই করা উচিত নয়। কখনই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়। কেবলমাত্র বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গ করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন মতেই নয়। একে বলা হয় ব্রহ্মচর্য। এগুলি হচ্ছে দেহের তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন।

শ্লোক ১৫

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অনুদ্বেগকরম্—অনুদ্বেগকর; **বাক্যম্**—বাক্য; **সত্যম্**—সত্য; **প্রিয়**—প্রিয়; **হিতম্**—হিতকর; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **স্বাধ্যায়**—বেদ পাঠের; **অভ্যসনম্**—অভ্যাস; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **বাঙ্ময়ম্**—বাচিক; **তপঃ**—তপস্যা; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

স্বাধ্যায় অভ্যাস যত বেদ উচ্চারণ ।
বাঙ্ময় তপস্যা সে শাস্ত্রের বচন ॥

অনুবাদ

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য এবং বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করাকে বাচিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

এমনভাবে কোন কথা বলা উচিত নয়, যার ফলে অন্যাদের মন উত্তেজিত হতে পারে। তবে, শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দান করবার জন্য সত্য কথা বলতে পারেন, কিন্তু তা যদি অন্যাদের, যারা তাঁর শিষ্য নয়, তাদের উত্তেজিত করে তোলে, তা হলে সেখানে তাঁর কথা বলা উচিত নয়। এটিই হচ্ছে বাচোবেগ দমন করার তপশ্চর্যা। এ ছাড়া অর্থহীন প্রজল্প করা উচিত নয়। ভক্তমণ্ডলীতে যখন কথা বলা হয়, তখন তা যেন শাস্ত্র-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যা বলা হয় তার যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য তৎক্ষণাৎ শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখ করা উচিত। সেই সঙ্গে, ঐ ধরনের আলোচনা অন্যের কাছে শ্রুতিমধুর হওয়া উচিত। তবেই এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে পরম মঙ্গল লাভ হতে পারে এবং মানব-সমাজের উন্নতি সাধিত হতে পারে। বৈদিক সাহিত্যের অনন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এবং সেগুলি পাঠ করা উচিত। একেই বলা হয় বাচোবেগের তপশ্চর্যা।

শ্লোক ১৬

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

মনঃপ্রসাদঃ—চিত্তের প্রসন্নতা; **সৌম্যত্বম্**—সরলতা; **মৌনম্**—মৌন; **আত্মবিনিগ্রহঃ**—মনঃসংযম; **ভাবসংশুদ্ধিঃ**—ব্যবহারে নিষ্কপটতা; **ইতি এতৎ**—এগুলিকে; **তপঃ**—তপস্যা; **মানসম্**—মানসিক; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

চিত্তের প্রসন্নতা যে আর সরলতা ।
আত্মনিগ্রহাদি মৌন ভাব প্রবণতা ॥
সেই সব মানসিক তপ নামে খ্যাত ।
উপরোক্ত সব তপ ত্রিগুণ প্রখ্যাত ॥

অনুবাদ

চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ব্যবহারে নিষ্কপটতা—এগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

মানসিক তপশ্চর্যা হচ্ছে সব রকমের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা থেকে মনকে মুক্ত করা। মনকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে সর্বক্ষণ মানুষের কি করে মঙ্গল হবে, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে। মনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হচ্ছে চিন্তায় গাম্ভীর্য। কৃষ্ণভক্তি থেকে কখনই বিচ্যুত হওয়া উচিত নয় এবং সর্বদাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরিত্যাগ করা উচিত। স্বভাবকে নির্মল করে গড়ে তোলার উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া। মনের সন্তোষ তখনই লাভ করা যায়, যখন মনকে সমস্ত ইন্দ্রিয় উপভোগের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। আমরা যতই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তা করি, মন ততই অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নানা রকম পন্থায় মনকে অনর্থক নিযুক্ত করছি এবং তাই মানসিক শান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। মানসিক শান্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে *মহাভারত* ও *পুরাণ* আদি বৈদিক শাস্ত্রে মনকে নিবদ্ধ করা, যা নানা রকম মনোমুগ্ধকর আনন্দদায়ক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এই জ্ঞানের সহায়তা লাভ করে মানুষ পবিত্র হতে পারে। মন যেন সব রকমের কপটতা থেকে মুক্ত থাকে এবং আমাদের উচিত সকলের মঙ্গল কামনা করা। মৌনতা মানে হচ্ছে সর্বক্ষণ আত্মজ্ঞান লাভের চিন্তায় মগ্ন থাকা। এই অর্থে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত হচ্ছেন যথার্থ মৌন। আত্মনিগ্রহের অর্থ হচ্ছে মনকে সব রকমের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা থেকে মুক্ত রাখা। আমাদের অকপট ব্যবহার করা উচিত, তার ফলে আমাদের অস্তিত্ব শুদ্ধ হয়। এই সমস্ত গুণাবলী হচ্ছে মানসিক তপশ্চর্যা।

শ্লোক ১৭

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; পরয়া—পরম; তপ্তম্—অনুষ্ঠিত; তপঃ—তপস্যা; তৎ—তা; ত্রিবিধম্—ত্রিবিধ; নরৈঃ—মানুষের দ্বারা; অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত; যুক্তৈঃ—যুক্ত; সাত্ত্বিকম্—সাত্ত্বিক; পরিচক্ষতে—বলা হয়।

গীতার গান

ত্রিবিধ তপস্যা যদি পরাশ্রদ্ধাযুক্ত ।
ফলাকাঙ্ক্ষা যদি নহে সাত্ত্বিকী সে উক্ত ॥

অনুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত মানুষের দ্বারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

শ্লোক ১৮

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

সৎকার—শ্রদ্ধা; মান—সম্মান; পূজার্থম্—পূজা লাভের আশায়; তপঃ—তপস্যা; দম্ভেন—দম্ভ সহকারে; চ—ও; এব—অবশ্যই; যৎ—যে; ক্রিয়তে—অনুষ্ঠিত হয়; তৎ—তাকে; ইহ—এই জগতে; প্রোক্তম্—বলা হয়; রাজসম্—রাজসিক; চলম্—অনিত্য; অধ্রুবম্—অনিশ্চিত।

গীতার গান

লাভ পূজা সম্মানের জন্য দম্ভের সহিত ।
যে তপস্যা সাধে লোক তাহা রাজসিক ॥
সে তপস্যার যে ফল তাহা অনিশ্চিত ।
অন্তবৎ তার ফল হয় শাস্ত্রেতে বিদিত ॥

অনুবাদ

শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা লাভের আশায় দম্ভ সহকারে যে তপস্যা করা হয়, তাকেই এই জগতে অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

অনেক সময় তপশ্চর্যার আচরণ করা হয় মানুষকে আকৃষ্ট করবার জন্য এবং অন্যের কাছ থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা লাভের জন্য। রাজসিক মানুষেরা তাদের অধস্তনদের কাছ থেকে পূজা আদায়ের বন্দোবস্ত করে, তাদের দিয়ে পা ধোয়ায় এবং সম্পদ দান করতে বাধ্য করায়। তপশ্চর্যার আচরণের দ্বারা এই ধরনের কৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলির ব্যবস্থা রাজসিক এবং তার ফল ক্ষণস্থায়ী। তা কিছু দিনের জন্য কেবল থাকে, কিন্তু স্থায়ী হয় না।

শ্লোক ১৯

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

মূঢ়—মূঢ়; **গ্রাহেণ**—আগ্রহের দ্বারা; **আত্মনঃ**—নিজের; **যৎ**—যে; **পীড়য়া**—পীড়ার দ্বারা; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **তপঃ**—তপস্যা; **পরস্য**—অপরের; **উৎসাদনার্থম্**—বিনাশের জন্য; **বা**—অথবা; **তৎ**—তাকে; **তামসম্**—তামসিক; **উদাহৃতম্**—বলা হয়।

গীতার গান

মূঢ়বুদ্ধি যারা তপে আত্মপীড়া দেয় ।
অপরের বিনাশার্থ যে তপস্যা করয় ॥
তামসী সে সব যত তপস্যা বহুল ।
অলীক তাহার নাম নহে শাস্ত্র অনুকূল ॥

অনুবাদ

মূঢ়োচিত আগ্রহের দ্বারা নিজেকে পীড়া দিয়ে অথবা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তাকে তামসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

নির্বোধ তপশ্চর্যার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হিরণ্যকশিপু, যে অমরত্ব লাভ করে দেবতাদের হত্যা করবার জন্য তপস্যা করেছিল। সে ব্রহ্মার কাছে এই সব প্রার্থনা করে, কিন্তু পরিণামে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের হাতে সে নিহত হয়। অসম্ভব কোন কিছু লাভের আশায় যে তপস্যা করা হয়, তা অবশ্যই তামসিক।

শ্লোক ২০

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

দাতব্যম্—দান করা কর্তব্য; **ইতি**—এভাবে; **যৎ**—যে; **দানম্**—দান; **দীয়তে**—দেওয়া হয়; **অনুপকারিণে**—প্রত্যুপকারের আশা না করে; **দেশে**—উপযুক্ত স্থানে; **কালে**—উপযুক্ত কালে; **চ**—ও; **পাত্রে**—উপযুক্ত পাত্রে; **চ**—এবং; **তৎ**—তাকে; **দানম্**—দান; **সাত্ত্বিকম্**—সাত্ত্বিক; **স্মৃতম্**—বলা হয়।

কর্তব্য জানিয়া যেই দানক্রিয়া হয় ।
দেশ কাল পাত্র বুঝি দাতব্য করয় ।
অনুপকারীকে দান সে সাত্ত্বিক হয় ॥

অনুবাদ

দান করা কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।

তাৎপর্য

পারমার্থিক কর্মে নিযুক্ত যে মানুষ, তাকেই দান করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। নির্বিচারে দান করার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পারমার্থিক উন্নতিই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। তাই তীর্থস্থানে, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময়, মাসের শেষে অথবা সদ্‌ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবকে অথবা মন্দিরে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে দান করা উচিত। কখনও কখনও অনুকম্পার

বশবর্তী হয়ে গরিবদের দান করা হয়, কিন্তু সেই গরিব লোকটি যদি দানের যোগ্য না হয়, তা হলে সেই দানের ফলে কোন পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নির্বিচারে দান করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি।

শ্লোক ২১-২২

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যৎ—যা; **তু**—কিন্তু; **প্রত্যুপকারার্থম্**—প্রত্যুপকারের আশায়; **ফলম্**—ফল; **উদ্দিশ্য**—কামনা করে; **বা**—অথবা; **পুনঃ**—পুনরায়; **দীয়তে**—দেওয়া হয়; **চ**—ও; **পরিক্লিষ্টম্**—অনুতাপ সহকারে; **তৎ**—সেই; **দানম্**—দানকে; **রাজসম্**—রাজসিক; **স্মৃতম্**—বলা হয়; **অদেশ**—অশুচি স্থানে; **কালে**—অশুভ সময়ে; **যৎ**—যে; **দানম্**—দান; **অপাত্রেভ্যঃ**—অনুপযুক্ত পাত্রে; **চ**—ও; **দীয়তে**—দেওয়া হয়; **অসৎকৃতম্**—অনাদরে; **অবজ্ঞাতম্**—অবজ্ঞা সহকারে; **তৎ**—তাকে; **তামসম্**—তামসিক; **উদাহৃতম্**—বলা হয়।

গীতার গান

প্রত্যুপকারের জন্য ফলানুসন্ধান ।
কিংবা দান করি হয় অনুতাপবান ॥
রাজসিক দান সেই শাস্ত্রের বিচার ।
তামসিক দান যাহা শুন এই বার ॥
অদেশকালে যে দান অপাত্রেতে হয় ।
অসৎকার অবজ্ঞা যেই তামসিক কয় ॥

অনুবাদ

যে দান প্রত্যুপকারের আশা করে অথবা ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং অনুতাপ সহকারে করা হয়, সেই দানকে রাজসিক বলা হয়।

অশুচি স্থানে, অশুভ সময়ে, অযোগ্য পাত্রে, অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলা হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য দান করা হয়, কখনও আবার গভীর বিরক্তির সঙ্গে দান করা হয় এবং কখনও দান করার পরে অনুশোচনা হয় যে, "কেন আমি এভাবে এতগুলি টাকা নষ্ট করলাম।" কখনও আবার গুরুজনের অনুরোধে বাধ্য হয়ে দান করতে হয়। এই ধরনের দানগুলিকে রাজসিক বলে গণ্য করা হয়।

অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানদের উপহার সামগ্রী দান করে থাকে। এই ধরনের দানকে বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদন করা হয়নি। কেবল মাত্র সাত্ত্বিকভাবে দানের নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে।

নেশা করা বা জুয়াখেলার জন্য দান করতে এখানে উৎসাহিত করা হয়নি। এই ধরনের সমস্ত দান তামসিক। এই ধরনের দানের ফলে কোন লাভ হয় না। উপরন্তু পাপকর্মে লিপ্ত সমস্ত মানুষগুলি প্রশ্রয় পায়। তেমনই, কেউ যদি আবার অশ্রদ্ধার সঙ্গে এবং অবহেলা করে যোগ্য পাত্রেও দান করে, তা হলেও সেই দানকে তামসিক বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ২৩

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

ওঁ—ব্রহ্মের নির্দেশকারী প্রণব; **তৎ**—সেই; **সৎ**—নিত্য; **ইতি**—এই; **নির্দেশঃ**—নির্দেশক নাম; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **ত্রিবিধঃ**—তিন প্রকার; **স্মৃতঃ**—কথিত আছে; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **তেন**—তার দ্বারা; **বেদাঃ**—বেদসমূহ; **চ**—ও; **যজ্ঞাঃ**—যজ্ঞসমূহ; **চ**—ও; **বিহিতাঃ**—বিহিত হয়েছে; **পুরা**—পুরাকালে।

গীতার গান

যজ্ঞ দান তপস্যাদি যাহা শাস্ত্রের নির্ণয় ।
ওঁ তৎসৎ সে উদ্দেশ্যে অন্য কিছু নয় ॥

সে উদ্দেশ্যে পূর্বকালে ব্রাহ্মণাদিগণ।
যজ্ঞ দান তপ আদি করিল পালন ॥

অনুবাদ

ওঁ তৎ সৎ—এই তিন প্রকার ব্রহ্ম-নির্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত আছে। পুরাকালে সেই নাম দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ ও যজ্ঞসমূহ বিহিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার তিনভাগে বিভক্ত—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কিন্তু উত্তমই হোক, মধ্যমই হোক বা কনিষ্ঠই হোক, সে সবই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত। যখন সেগুলি পরব্রহ্ম—ওঁ তৎ সৎ বা শাশ্বত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তখন সেগুলি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উপায়-স্বরূপ হয়ে ওঠে। শাস্ত্রের নির্দেশসমূহে সেই উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটি শব্দ নির্দিষ্টভাবে পরমতত্ত্ব পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সূচিত করে। বৈদিক মন্ত্রে সর্বদাই ওঁ শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

যে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে আচরণ করে না, সে কখনই পরম-তত্ত্বকে প্রাপ্ত হতে পারবে না। তার পক্ষে কোন সাময়িক ফল লাভ হতে পারে, কিন্তু তার জীবনের পরম অর্থ সাধিত হবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, দান, যজ্ঞ ও তপস্যা অবশ্যই সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে। রাজসিক বা তামসিকভাবে সেগুলি অনুষ্ঠিত হলে তা অবশ্যই নিকৃষ্ট। ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটি শব্দ পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নামের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়, যেমন *ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ*। যখনই কোন বৈদিক মন্ত্র বা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নামের উচ্চারণ করা হয়, তার সঙ্গে ওঁ শব্দটি যুক্ত হয়। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এই তিনটি শব্দ বৈদিক মন্ত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। *ওঁ ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম* (*ঋক্ বেদ*) প্রথম লক্ষ্যকে সূচিত করে। তারপর *তত্ত্বমসি* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/৮/৭) দ্বিতীয় লক্ষ্য সূচনা করে এবং *সদেব সৌম্য* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/২/১) তৃতীয় লক্ষ্যকে সূচিত করে। একত্রে তারা ওঁ তৎ সৎ। পুরাকালে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি এই তিনটি শব্দের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নির্দেশ করেছিলেন। অতএব গুরু-পরম্পরাতেও এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং, এই মন্ত্রটির বিপুল তাৎপর্য রয়েছে। তাই *ভগবদ্গীতায়* অনুমোদিত হয়েছে যে, যে-কোন কর্মই করা হোক না কেন, তা যেন ওঁ তৎ সৎ অথবা পরম পুরুষোত্তম

ভগবানের জন্য করা হয়। কেউ যখন এই তিনটি শব্দ সহকারে তপস্যা, দান ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন বুঝতে হবে তিনি কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করছেন। কৃষ্ণভাবনা হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান সমন্বিত অপ্রাকৃত কর্ম, যা অনুশীলন করার ফলে আমরা আমাদের নিত্য আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারি। এই রকম অপ্রাকৃত কর্মে কোন রকম শক্তি ক্ষয় হয় না।

শ্লোক ২৪

তস্মাদ্ ওঁ ইত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—সেই হেতু; **ওঁ**—ওঁ-কার; **ইতি**—এই শব্দ; **উদাহৃত্য**—উচ্চারণ করে; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **দান**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **ক্রিয়াঃ**—ক্রিয়াসমূহ; **প্রবর্তন্তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **বিধানোক্তাঃ**—শাস্ত্রের বিধান অনুসারে; **সততম্**—সর্বদাই; **ব্রহ্মবাদিনাম্**—ব্রহ্মবাদীদের।

গীতার গান

সেজন্য ব্রাহ্মণগণ 'ওম্' উচ্চারণে ।
যজ্ঞাদি বিধান করে ব্রহ্ম আচরণে ॥

অনুবাদ

সেই হেতু ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ক্রিয়াসমূহ সর্বদাই ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ (*ঋক্ বেদ* ১/২২/২০)। শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ-কমল হচ্ছে পরা ভক্তির পরম আশ্রয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম হচ্ছে সমস্ত কর্মের সার্থকতা।

শ্লোক ২৫

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

তৎ ইতি—'তৎ' এই শব্দ; অনভিসন্ধায়—আকাঙ্ক্ষা না করে; ফলম্—ফলের; যজ্ঞ—যজ্ঞ; তপঃ—তপস্যা; ক্রিয়াঃ—ক্রিয়া; দান—দান; ক্রিয়াঃ—ক্রিয়া; চ—ও; বিবিধাঃ—নানাবিধ; ক্রিয়ন্তে—অনুষ্ঠিত হয়; মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ—মুক্তিকামীদের দ্বারা।

গীতার গান

অতএব যজ্ঞ দান তপস্যার ফল।
অন্যাভিলাষ নহে ভক্তির কারণ ॥
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী সেজন্য যজ্ঞ দান করে।
সেই সে যজ্ঞাদি ফল বিদিত সংসারে ॥

অনুবাদ

মুক্তিকামীরা ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণ-পূর্বক নানা প্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, দান আদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

তাৎপর্য

চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে হলে জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কর্ম করা উচিত নয়। চিন্ময় জগৎ ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার পরম উদ্দেশ্য নিয়ে সমস্ত কর্ম করা উচিত।

শ্লোক ২৬-২৭

**সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥**

সদ্ভাবে—ব্রহ্মের ভাব অবলম্বন করে; সাধুভাবে—ভক্তের ভাব অবলম্বন করে; চ—ও; সৎ—সৎ শব্দ; ইতি—এভাবে; এতৎ—এই; প্রযুজ্যতে—প্রযুক্ত হয়; প্রশস্তে—শুভ; কর্মণি—কর্মসমূহে; তথা—তেমনই; সচ্ছব্দঃ—'সৎ' শব্দ; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; যুজ্যতে—ব্যবহৃত হয়; যজ্ঞে—যজ্ঞে; তপসি—তপস্যায়; দানে—দানে; চ—ও; স্থিতিঃ—অবস্থিতি; সৎ—সৎ; ইতি—এভাবে; চ—এবং; উচ্যতে—

উচ্চারিত হয়; কর্ম—কর্ম; চ—ও; এব—অবশ্যই; তৎ—সেই; অর্থীয়ম্—অর্থে; সৎ—সৎ; ইতি—এই; এব—অবশ্যই; অভিধীয়তে—অভিহিত হয়।

গীতার গান

সৎ সে শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ব্রহ্মপর ।
সে উদ্দেশ্যে যত কর্ম সব ব্রহ্মপর ॥
যজ্ঞ দান তপ কার্য সে উদ্দেশ্যে করে ।
লৌকিক বৈদিক কর্ম ব্রহ্ম নাম ধরে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সৎভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়। তেমনই শুভ কর্মসমূহে 'সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে 'সৎ' শব্দ উচ্চারিত হয়। যেহেতু ঐ সকল কর্ম ব্রহ্মোদ্দেশক হলেই 'সৎ' শব্দে অভিহিত হয়।

তাৎপর্য

প্রশস্তে কর্মণি কথাগুলির অর্থ এই যে, বৈদিক শাস্ত্রে নানা রকম পবিত্রকারক কাজকর্ম করার নির্দেশ দেওয়া আছে, যা শৈশবে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত পালন করা উচিত। জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত পবিত্রকারক কর্তব্যগুলি অনুষ্ঠান করা হয়। এই সমস্ত কাজকর্মে *ওঁ তৎ সৎ* মন্ত্র উচ্চারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *সদ্ভাবে* ও *সাধুভাবে* শব্দগুলি দিব্য অবস্থাদি নির্দেশ করে। কৃষ্ণভাবনাময় কাজকর্মকে বলা হয় সত্ত্ব এবং যিনি কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, তাঁকে বলা হয় 'সাধু'। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/২৫) বলা হয়েছে যে, সাধুসঙ্গ করার ফলে অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায়। এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* যে কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে *সতাং প্রসঙ্গাৎ*। সাধুসঙ্গ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। যখন দীক্ষা বা উপবীত দান করা হয়, তখন *ওঁ তৎ সৎ* শব্দগুলি উচ্চারণ করা হয়। তেমনই, সব রকম যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে পরমতত্ত্ব অর্থাৎ *ওঁ তৎ সৎ। তদর্থীয়ম্* শব্দটি আরও বোঝাচ্ছে, পরম-তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে এমন যে কোন কিছুর প্রতি সেবা নিবেদন, যেমন রান্না করা ও মন্দিরে সহায়তা করা অথবা ভগবানের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে অন্য যে কোন রকম কাজকর্ম। সমস্ত কর্মকে পবিত্র করে তোলার উদ্দেশ্যে *ওঁ তৎ সৎ* শব্দগুলি বহুভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সব কিছুকে সম্যক্‌ভাবে পরিপূর্ণ করে তোলে।

শ্লোক ২৮

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

অশ্রদ্ধয়া—অশ্রদ্ধা সহকারে; **হুতম্**—হোম; **দত্তম্**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **তপ্তম্**—অনুষ্ঠিত; **কৃতম্**—করা হয়; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **অসৎ**—সৎ নয়; **ইতি**—এভাবে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ন**—না; **চ**—ও; **তৎ**—সে সমস্ত ক্রিয়া; **প্রেত্য**—পরলোকে; **নো**—না; **ইহ**—ইহলোকে।

গীতার গান

সে শ্রদ্ধা বিনা যাহা কর্ম কৃত হয় ।
অসৎ কর্ম তার নাম শাস্ত্রেতে নির্ণয় ॥
অসৎ কর্ম শুদ্ধ নহে ইহ পরকালে ।
শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগে সেই ফল ফলে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! অশ্রদ্ধা সহকারে হোম, দান বা তপস্যা যা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয় 'অসৎ'। সেই সমস্ত ক্রিয়া ইহলোকে ও পরলোকে ফলদায়ক হয় না।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উদ্দেশ্য রহিত যা কিছুই করা হয়, তা যজ্ঞ হোক, দান হোক বা তপস্যাই হোক, তা সবই নিরর্থক। তাই এই শ্লোকটিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সেই সমস্ত কর্ম জঘন্য। সব কিছুই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরব্রহ্মের জন্য করা উচিত। এই বিশ্বাস না থাকলে এবং যথার্থ পথপ্রদর্শক না থাকলে কখনই কোন ফল লাভ হবে না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরম-তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস-পরায়ণ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশাদি অনুসরণের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। এই নীতি অনুসরণ না করলে কেউই সাফল্য লাভ করতে পারে না। তাই সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রথম থেকেই কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের অনুশীলন করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। সব কিছু সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার এটিই হচ্ছে পন্থা।

বদ্ধ অবস্থায় মানুষ দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, অথবা কুবের আদি যক্ষদের পূজা করার প্রতি আসক্ত থাকে। রজ ও তমোগুণ থেকে সত্ত্বগুণ শ্রেয়। কিন্তু যিনি প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করেছেন, তিনি এই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণেরই অতীত। যদিও ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করার পন্থা রয়েছে, তবুও যদি কেউ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করার ফলে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করতে পারেন, সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা এবং এই অধ্যায়ে সেটিই অনুমোদিত হয়েছে। এভাবেই জীবন সার্থক করতে হলে, সর্ব প্রথমে সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তখন পরম-তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হবে। কালক্রমে সেই বিশ্বাস যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় ভগবৎ-প্রেম। এই প্রেমই হচ্ছে জীবসমূহের পরম লক্ষ্য। তাই, সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করা উচিত। সেটিই হচ্ছে সপ্তদশ অধ্যায়ের বক্তব্য।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—'শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।
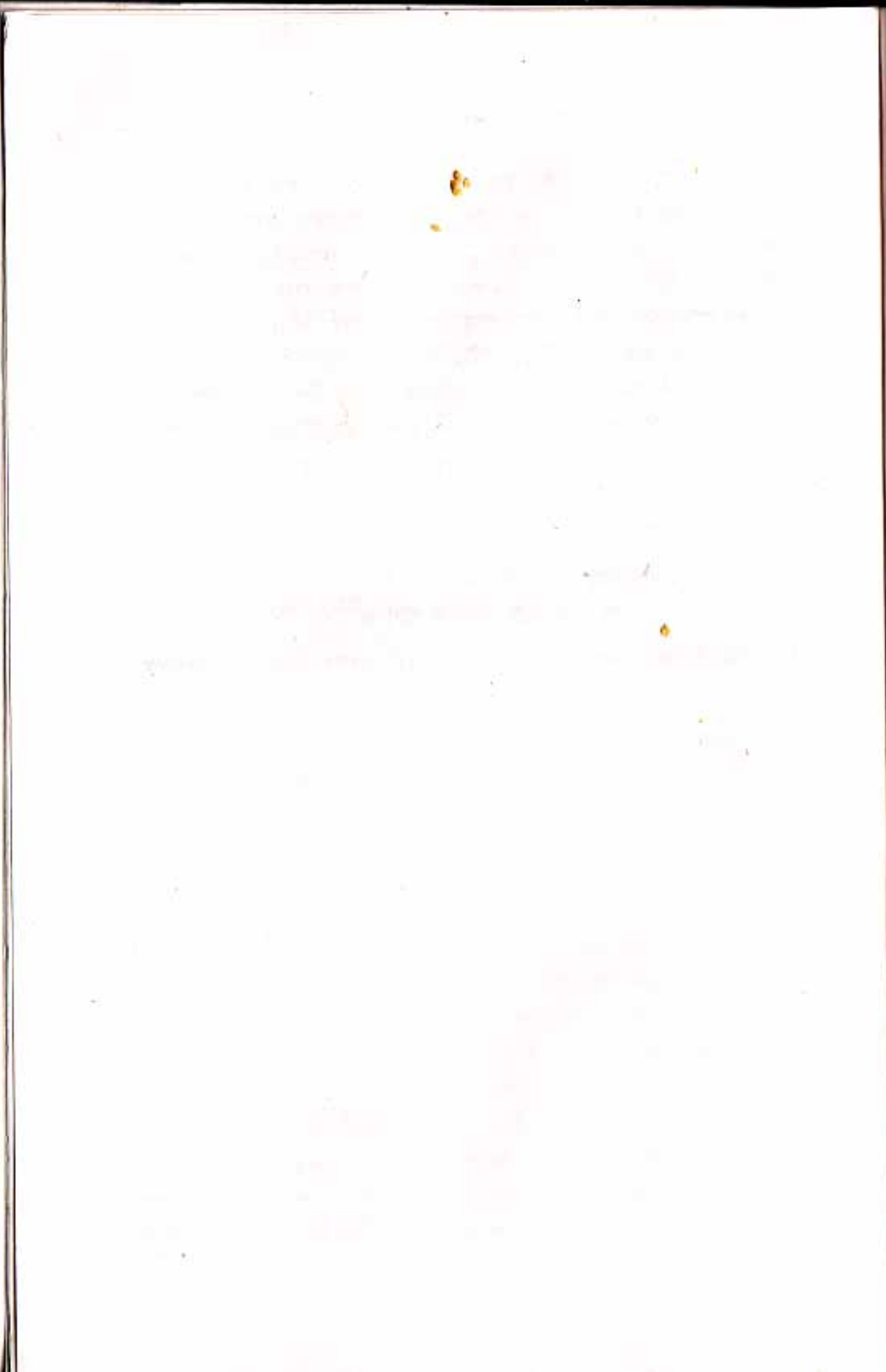
অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **সন্ন্যাসস্য**—সন্ন্যাসের; **মহাবাহো**—হে মহাবাহো; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **বেদিতুম্**—জানতে; **ত্যাগস্য**—ত্যাগের; **চ**—ও; **হৃষীকেশ**—হে হৃষীকেশ; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **কেশিনিসূদন**—হে কেশিহন্তা।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

সন্ন্যাসের তত্ত্ব কিবা ইচ্ছা সে শুনিতে ।
হৃষীকেশ কহ তাই মোরে বুঝাইতে ॥
কেশিনিসূদন কহ ত্যাগের মহিমা ।
শুনিতে আনন্দ হয় নাহি পরিসীমা ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতা* সতেরটি অধ্যায়েই সমাপ্ত। অষ্টাদশ অধ্যায়টি হচ্ছে পূর্ব অধ্যায়গুলিতে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পরিপূরক সারাংশ। *ভগবদ্গীতার* প্রতিটি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুত্ব সহকারে উপদেশ দিচ্ছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। সেই একই বিষয়বস্তু জ্ঞানের গুহ্যতম পন্থারূপে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে ভক্তিযোগের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—*যোগিনামপি সর্বেষাম্*....."সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি সর্বদাই তাঁর অন্তরে আমাকে চিন্তা করেন, তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ।" পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে শুদ্ধ ভক্তি, তার প্রকৃতি এবং তার অনুশীলনের বর্ণনা করা হয়েছে। শেষ ছয়টি অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ, অপ্রাকৃত প্রকৃতি ও ভগবৎ-সেবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত, যিনি *ওঁ তৎ সৎ* শব্দগুলির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছেন, যা পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুকেই নির্দেশ করে। *ভগবদ্গীতার* তৃতীয় পর্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন ছাড়া আর কিছুই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। পূর্বতন আচার্যগণের দ্বারা এবং *ব্রহ্মসূত্র* বা *বেদান্ত-সূত্রের* উদ্ধৃতি সহকারে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। কোন কোন নির্বিশেষবাদীরা মনে করেন যে, *বেদান্তসূত্র* জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার কেবল তাঁদেরই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *বেদান্ত-সূত্রের* উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ঙ্গম করা। কারণ, ভগবান নিজেই হচ্ছেন *বেদান্ত-সূত্রের* প্রণেতা এবং তিনিই হচ্ছেন বেদান্তবেত্তা। সেই কথা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি শাস্ত্রের, প্রতিটি *বেদেরই* প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। *ভগবদ্গীতায়* সেই কথা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমগ্র বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই অষ্টাদশ অধ্যায়েও সমস্ত উপদেশের সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। বৈরাগ্য ও জড়া প্রকৃতির তিনগুণের ঊর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়াই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* দুটি পৃথক বিষয়বস্তু—ত্যাগ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে অর্জুন স্পষ্টভাবে জানতে চাইছেন। এভাবেই তিনি এই দুটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন।

ভগবানকে সম্বোধন করে এখানে যে দুটি শব্দ 'হৃষীকেশ' ও 'কেশিনিসূদন' ব্যবহার করা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। হৃষীকেশ হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আমাদের মানসিক শান্তি লাভের জন্য সব সময় সাহায্য করেন। অর্জুন তাঁকে অনুরোধ করছেন, সব কিছুর সারমর্ম এমনভাবে বর্ণনা করতে যাতে তিনি তাঁর মনের সাম্যভাব বজায় রেখে অবিচলিত চিত্ত হতে পারেন। তবুও তাঁর মনে সন্দেহ রয়েছে এবং সন্দেহকে সব সময় অসুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণকে তিনি 'কেশিনিসূদন' বলে সম্বোধন করছেন। কেশী ছিলেন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ অসুর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে হত্যা করেছিলেন। এখন অর্জুন প্রত্যাশা করছেন যে, তাঁর মনের সন্দেহরূপী অসুরটিকেও শ্রীকৃষ্ণ নাশ করবেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ৷
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কাম্যানাম্**—কাম্য; **কর্মনাম্**—কর্মসমূহের; **ন্যাসম্**—ত্যাগকে; **সন্ন্যাসম্**—সন্ন্যাস; **কবয়ঃ**—পণ্ডিতগণ; **বিদুঃ**—জানেন; **সর্ব**—সমস্ত; **কর্ম**—কর্ম; **ফল**—ফল; **ত্যাগম্**—ত্যাগকে; **প্রাহুঃ**—বলেন; **ত্যাগম্**—ত্যাগ; **বিচক্ষণাঃ**—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

কাম্যকর্ম পরিত্যাগ সন্ন্যাস সে হয় ৷
সর্বকর্ম ফলত্যাগ ত্যাগ পরিচয় ॥
বিচক্ষণ করি যত করিল নির্ণয় ৷
সেই সে সন্ন্যাস আর ত্যাগ নাম হয় ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে জানেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সমস্ত কর্মফল ত্যাগকে ত্যাগ বলে থাকেন।

তাৎপর্য

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত যে কর্ম, তা ত্যাগ করতে হবে। সেটিই হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য যে কর্ম, তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যজ্ঞ সম্পাদনের বিভিন্ন বিধি-বিধান বৈদিক শাস্ত্রে আছে। পুত্র লাভের জন্য অথবা স্বর্গ লাভের জন্য বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়, কিন্তু কামনার বশবর্তী হয়ে যজ্ঞ করা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তা বলে, নিজের অন্তর পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা পারমার্থিক বিজ্ঞানে উন্নতি লাভের জন্য যে সমস্ত যজ্ঞ, তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

ত্যাজ্যম্—ত্যাজ্য; **দোষবৎ**—দোষযুক্ত; **ইতি**—সেই হেতু; **একে**—এক শ্রেণীর; **কর্ম**—কর্ম; **প্রাহুঃ**—বলেন; **মনীষিণঃ**—মনীষীগণ; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **দান**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **কর্ম**—কর্ম; **ন**—নয়; **ত্যাজ্যম্**—ত্যাজ্য; **ইতি**—এভাবে; **চ**—এবং; **অপরে**—অন্যেরা।

গীতার গান

মনীষীগণ সর্ব কর্ম ত্যাগ করে ।
যজ্ঞ দান তপক্রিয়া নহে, কহয়ে অপরে ॥

অনুবাদ

এক শ্রেণীর মনীষীগণ বলেন যে, কর্ম দোষযুক্ত, সেই হেতু তা পরিত্যজ্য। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্মকে অত্যাজ্য বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে এমন অনেক কার্যকলাপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। আবার সেই সঙ্গে এটিও বলা হয়েছে যে, পশুহত্যা করা অত্যন্ত ঘৃণ্য কর্ম। যদিও যজ্ঞে পশুবলির

নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পশু হত্যা করার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যজ্ঞে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পশুটিকে নবজীবন দান করা। কখনও কখনও যজ্ঞে বলি দেওয়ার মাধ্যমে পশুটিকে নতুন পশুর জীবন দেওয়া হত এবং কখনও কখনও পশুটিকে তৎক্ষণাৎ মনুষ্য-জীবনে উন্নীত করা হত। কিন্তু এই সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলেন যে, পশুহত্যা সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত, আবার কেউ বলেন যে, কোন বিশেষ যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া মঙ্গলজনক। যজ্ঞ সম্বন্ধে এই সমস্ত সন্দেহের নিরসন ভগবান নিজেই এখন করছেন।

শ্লোক ৪

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥

নিশ্চয়ম্—নিশ্চয় সিদ্ধান্ত; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার; **তত্র**—সেই; **ত্যাগে**—ত্যাগ সম্বন্ধে; **ভরতসত্তম**—হে ভারতশ্রেষ্ঠ; **ত্যাগঃ**—ত্যাগ; **হি**—অবশ্যই; **পুরুষব্যাঘ্র**—হে পুরুষব্যাঘ্র; **ত্রিবিধঃ**—তিন প্রকার; **সংপ্রকীর্তিতঃ**—কীর্তিত হয়েছে।

গীতার গান

তার মধ্যে যে সিদ্ধান্ত কহি তাহা শুন।
ত্রিবিধ সে ত্যাগ হয় ভরতসত্তম ॥

অনুবাদ

হে ভরতসত্তম! ত্যাগ সম্বন্ধে আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! শাস্ত্রে ত্যাগও তিন প্রকার বলে কীর্তিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ত্যাগ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকলেও, এখানে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রায় দিচ্ছেন, যা চরম সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা উচিত। যে যাই বলুন, বেদ হচ্ছে ভগবান প্রদত্ত নীতিবিশেষ। এখানে ভগবান নিজেই উপস্থিত থেকে যা বলছেন, তাঁর নির্দেশকে চরম বলে গ্রহণ করা উচিত। ভগবান বলেছেন যে, প্রকৃতির যে গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম ত্যাগ করা হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু বিবেচনা করা উচিত।

শ্লোক ৫

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

যজ্ঞ—যজ্ঞ; **দান**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **কর্ম**—কর্ম; **ন**—নয়; **ত্যাজ্যম্**—ত্যাজ্য; **কার্যম্**—করা কর্তব্য; **এব**—অবশ্যই; **তৎ**—তা; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **দানম্**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **পাবনানি**—পবিত্র করে; **মনীষীণাম্**—মনীষীদের পর্যন্ত।

গীতার গান

স্বরূপত যজ্ঞদান কভু ত্যাজ্য নয় ।
সকল সময়ে তাহা কার্য যোগ্য হয় ॥
বদ্ধজীব আছে যত তাদের কর্তব্য ।
মনীষী পাবন সেই যজ্ঞ দান কার্য ॥

অনুবাদ

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাজ্য নয়, তা অবশ্যই করা কর্তব্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষীদের পর্যন্ত পবিত্র করে।

তাৎপর্য

যোগীদের উচিত মানব-সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম সম্পাদন করা। মানুষকে পরমার্থের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী অনেক শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিবাহ অনুষ্ঠানকেও এই রকম একটি পবিত্র কর্ম বলে গণ্য করা হয়। তাকে বলা হয় 'বিবাহ-যজ্ঞ'। একজন সন্ন্যাসী, যিনি সব কিছু ত্যাগ করেছেন এবং পারিবারিক সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, তাঁর পক্ষে কি বিবাহ অনুষ্ঠানে উৎসাহ দান করা উচিত? ভগবান এখানে বলেছেন যে, মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য যে যজ্ঞ, তা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। বিবাহ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে সংযত করে শান্ত করা, যাতে সে পরমার্থ সাধনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই 'বিবাহ-যজ্ঞ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করা উচিত এবং তাদের এভাবেই অনুপ্রাণিত করা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কর্তব্য। সন্ন্যাসীর কখনই স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়। কিন্তু তার অর্থ

এই নয় যে, যারা জীবনের নিম্নস্তরে রয়েছে, যারা যুবক, তারা বিবাহ করে সহধর্মিণী গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত থাকবে। শাস্ত্রে নির্দেশিত সব কয়টি যজ্ঞই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করার জন্যই সাধিত হয়। তাই, নিম্নতর স্তরে সেগুলি বর্জন করা উচিত নয়। তেমনই, হৃদয়কে নির্মল করার উদ্দেশ্যে দান করা হয়। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী, যোগ্য পাত্রে যদি দান করা হয়, তা হলে তা পারমার্থিক উন্নতির সহায়ক।

শ্লোক ৬

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

এতানি—এই সমস্ত; **অপি**—অবশ্যই; **তু**—কিন্তু; **কর্মাণি**—কর্ম; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ফলানি**—ফলসমূহ; **চ**—ও; **কর্তব্যানি**—কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করা উচিত; **ইতি**—ইহাই; **মে**—আমার; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **নিশ্চিতম্**—নিশ্চিত; **মতম্**—অভিমত; **উত্তমম্**—উত্তম।

গীতার গান

যে কার্যের অনুষ্ঠান ফলসঙ্গ ত্যাগ ।
কর্তব্যের অনুরোধে শুধু তাহে রাগ ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! এই সমস্ত কর্ম আসক্তি ও ফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম অভিমত।

তাৎপর্য

যদিও সব কয়টি যজ্ঞই পবিত্র, তবুও তা অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে কোন রকম ফলের আশা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য যে সমস্ত যজ্ঞ, তা বর্জন করতে হবে। কিন্তু যে সমস্ত যজ্ঞ মানুষের অস্তিত্বকে পবিত্র করে এবং তাদের পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করে, তা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি লাভের সহায়ক সব কিছুকে সর্বতোভাবে গ্রহণ

করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে, যে সমস্ত কার্যকলাপ ভগবদ্ভক্তি লাভের সহায়ক তা গ্রহণ করা উচিত। সেটিই হচ্ছে ধর্মের সর্বোচ্চ নীতি। ভগবদ্ভক্তি সাধনের সহায়ক যে কোন রকমের কার্য, যজ্ঞ বা দান ভগবদ্ভক্তের গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৭

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥

নিয়তস্য—নিত্য; **তু**—কিন্তু; **সন্ন্যাসঃ**—ত্যাগ; **কর্মণঃ**—কর্মের; **ন**—নয়; **উপপদ্যতে**—উপযুক্ত; **মোহাৎ**—মোহবশত; **তস্য**—তার; **পরিত্যাগঃ**—পরিত্যাগ; **তামসঃ**—তামসিক; **পরিকীর্তিতঃ**—বলা হয়।

গীতার গান

নির্দিষ্ট কর্মের ত্যাগ নহে সে বিধান ।
মোহেতে সে ত্যাগ হয় তামসিক জ্ঞান ॥

অনুবাদ

কিন্তু নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহবশত তার ত্যাগ হলে, তাকে তামসিক ত্যাগ বলা হয়।

তাৎপর্য

জড় সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কর্ম তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম মানুষকে পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপে উন্নীত করে, যেমন ভগবানের জন্য রান্না করা, ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা এবং ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করা অনুমোদন করা হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সন্ন্যাসীর নিজের জন্য রান্না করা উচিত নয়। নিজের জন্য রান্না করা নিষিদ্ধ, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের জন্য রান্না করতে কোন বাধা নেই। তেমনই, শিষ্যকে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্য সন্ন্যাসী বিবাহ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন। এই সমস্ত কর্মগুলিকে যদি কেউ পরিত্যাগ করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তমোগুণে কর্ম করছে।

শ্লোক ৮

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

দুঃখম্—দুঃখজনক; **ইতি**—এভাবে; **এব**—অবশ্যই; **যৎ**—যে; **কর্ম**—কর্ম; **কায়**—দৈহিক; **ক্লেশ**—ক্লেশের; **ভয়াৎ**—ভয়ে; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করেন; **সঃ**—তিনি; **কৃত্বা**—করে; **রাজসম্**—রাজসিক; **ত্যাগম্**—ত্যাগ; **ন**—না; **এব**—অবশ্যই; **ত্যাগ**—ত্যাগের; **ফলম্**—ফল; **লভেৎ**—লাভ করেন।

গীতার গান

দুঃখ হয় তার জন্য কর্মত্যাগ করে ।
কিংবা কর্মত্যাগ করে কায়ক্লেশ ডরে ॥
রাজসিক ত্যাগ সেই ফল নাহি পায় ।
সেই যে কহিনু যত শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

অনুবাদ

যিনি নিত্যকর্মকে দুঃখজনক বলে মনে করে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই সেই রাজসিক ত্যাগ করে ত্যাগের ফল লাভ করেন না।

তাৎপর্য

অর্থ উপার্জন করাকে ফলাশ্রয়ী সকাম কর্ম বলে মনে করে কৃষ্ণভক্তের অর্থ উপার্জন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কাজকর্ম করে অর্থ উপার্জন করে সেই অর্থ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করা হয়, অথবা খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা যদি পারমার্থিক কৃষ্ণভক্তির সহায়ক হয়, তা হলে সেই সমস্ত কর্মগুলি কষ্টদায়ক বলে তার ভয়ে সেগুলির অনুশীলন থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। এই ধরনের ত্যাগ রাজসিক মনোভাবাপন্ন। রাজসিক কর্মের ফল সব সময় ক্লেশদায়ক হয়ে থাকে। সেই মনোভাব নিয়ে কেউ যদি কর্ম পরিত্যাগ করেন, তা হলে তিনি ত্যাগের যথার্থ সুফল কখনই অর্জন করেন না।

শ্লোক ৯

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

কার্যম্—কর্তব্য; **ইতি এব**—এই মনে করে; **যৎ**—যে; **কর্ম**—কর্ম; **নিয়তম্**—নিত্য; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠান করা হয়; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ফলম্**—ফল; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **সঃ**—সেই; **ত্যাগঃ**—ত্যাগ; **সাত্ত্বিকঃ**—সাত্ত্বিক; **মতঃ**—আমার মতে।

গীতার গান

কর্তব্য জানিয়া যেবা সর্ব কর্ম করে ।
ফলত্যাগ করিবারে সাত্ত্বিক নাম ধরে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে যে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, আমার মতে সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক।

তাৎপর্য

এমন মনোভাব নিয়ে সর্বদাই নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত যেন ফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কাজ করা হয়। এমন কি, কাজের ধরনের প্রতিও অনাসক্ত হওয়া উচিত। কৃষ্ণভাবনাময় কোন ভক্ত যদি কখনও কোন কারখানাতেও কাজ করেন, তখন তিনি কারখানার কাজের প্রতি আসক্ত হন না এবং কারখানার শ্রমিকদের প্রতিও আসক্ত হন না। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্য কাজ করেন এবং যখন তিনি কর্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তখন তাঁর সেই কর্ম অপ্রাকৃত স্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্লোক ১০

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **দ্বেষ্টি**—বিদ্বেষ করেন; **অকুশলম্**—অশুভ; **কর্ম**—কর্মে; **কুশলে**—শুভ কর্মে; **ন**—না; **অনুষজ্জতে**—আসক্ত হন; **ত্যাগী**—ত্যাগী; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণে; **সমাবিষ্টঃ**—আবিষ্ট; **মেধাবী**—বুদ্ধিমান; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **সংশয়ঃ**—সমস্ত সংশয়।

গীতার গান

কর্তব্যের অনুরোধে অকুশলও করে ।
আসক্তি নাহি সে কুশল কর্মের তরে ॥

মেধাবী যে ত্যাগী সত্ত্ব সমাবিষ্ট হয় ।
ছিন্ন তার হয়ে যায় সকল সংশয় ॥

অনুবাদ

সত্ত্বগুণে আবিষ্ট, মেধাবী ও সমস্ত সংশয়-ছিন্ন ত্যাগী অশুভ কর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং শুভ কর্মে আসক্ত হন না।

তাৎপর্য

যে মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় বা সত্ত্বগুণময়, তিনি কাউকে বা শরীরের পক্ষে ক্লেশদায়ক কোন কিছুকেই ঘৃণা করেন না। তিনি শারীরিক দুঃখ-কষ্টের পরোয়া না করে যথাস্থানে ও যথাসময়ে তাঁর কর্তব্য পালন করে চলেন। ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত এই সমস্ত মানুষদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং তাঁদের কার্যকলাপ সর্ব প্রকারেই সন্দেহাতীত বলে জানতে হবে।

শ্লোক ১১

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

ন—নয়; **হি**—অবশ্যই; **দেহভৃতা**—দেহধারী জীবের; **শক্যম্**—সম্ভব; **ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করা; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **অশেষতঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **কর্ম**—কর্ম; **ফল**—ফল; **ত্যাগী**—পরিত্যাগী; **সঃ**—তিনি; **ত্যাগী**—ত্যাগী; **ইতি**—এরূপ; **অভিধীয়তে**—অভিহিত হন।

গীতার গান

দেহধারী জীব কর্মত্যাগ নাহি করে ।
কর্মফল ত্যাগ করি ত্যাগী নাম ধরে ॥

অনুবাদ

অবশ্যই দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যিনি সমস্ত কর্মফল পরিত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী বলে অভিহিত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, কেউ কখনও কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। তাই, কর্মফল ভোগের আশা না করে যিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করেন, যিনি সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ত্যাগী। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের বহু সভ্য আছেন, যাঁরা অফিসে, কলকারখানায় অথবা অন্য জায়গায় খুব কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং তাঁরা যা রোজগার করছেন, তা সবই সংঘকে দান করছেন। এই সমস্ত মহাত্মারাই যথার্থ সন্ন্যাসী। এঁরাই যথার্থ ত্যাগের জীবন যাপন করছেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিভাবে কর্মফল ত্যাগ করতে হয় এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেই কর্মফল ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১২

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

অনিষ্টম্—নরক প্রাপ্তিরূপ; **ইষ্টম্**—স্বর্গ প্রাপ্তিরূপ; **মিশ্রম্**—মিশ্র; **চ**—এবং; **ত্রিবিধম্**—তিন প্রকার; **কর্মণঃ**—কর্মের; **ফলম্**—ফল; **ভবতি**—হয়; **অত্যাগিনাম্**—ত্যাগরহিত ব্যক্তিদের; **প্রেত্য**—পরলোকে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **সন্ন্যাসিনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **ক্বচিৎ**—কখনও।

গীতার গান

অনিষ্ট ইষ্ট বা মিশ্র কর্মফল হয় ।
কিন্তু সন্ন্যাসীর সেই কিছু ভোগ নয় ॥

অনুবাদ

যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেননি, তাঁদের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র—এই তিন প্রকার কর্মফল ভোগ হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীদের কখনও ফলভোগ করতে হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে যে মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করছেন, তিনি সর্বদাই মুক্ত। তাই তাঁকে মৃত্যুর পরে তাঁর কর্মফল-স্বরূপ সুখ বা দুঃখ কিছুই ভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ১৩

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চ—পাঁচটি; **এতানি**—এই; **মহাবাহো**—হে মহাবাহো; **কারণানি**—কারণ; **নিবোধ**—অবগত হও; **মে**—আমার থেকে; **সাংখ্যে**—বেদান্ত শাস্ত্রে; **কৃতান্তে**—সিদ্ধান্তে; **প্রোক্তানি**—কথিত; **সিদ্ধয়ে**—সিদ্ধির উদ্দেশ্যে; **সর্ব**—সমস্ত; **কর্মণাম্**—কর্মের।

গীতার গান

পঞ্চ সে কারণ হয় সকল কার্যের ।
মহাবাহো শুন সেই কহি সে তোমারে ॥
বেদান্ত সিদ্ধান্ত সেই শাস্ত্রের নির্ণয় ।
ভালমন্দ যাহা কিছু সেই সে পর্যায় ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে সমস্ত কর্মের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট হয়েছে, আমার থেকে তা অবগত হও।

তাৎপর্য

প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই যখন একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তা হলে এটি কিভাবে সম্ভব যে, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষকে তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ কোনটিই ভোগ করতে হয় না? ভগবান *বেদান্ত* দর্শনের দৃষ্টান্ত দিয়ে এখানে বিশ্লেষণ করছেন কি করে তা সম্ভব। তিনি বলেছেন যে, সমস্ত কার্যের পিছনে পাঁচটি কারণ আছে এবং সমস্ত কার্যের সাফল্যের পিছনেও এই পাঁচটি কারণ আছে বলে বিবেচনা করতে হবে। *সাংখ্য* কথাটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের বৃন্ত এবং *বেদান্তকে* সমস্ত আচার্যেরা জ্ঞানের চরম বৃন্ত বলে গ্রহণ করেছেন। এমন কি, শঙ্করাচার্য পর্যন্ত *বেদান্ত-সূত্রকে* এভাবেই স্বীকার করেছেন। তাই, এই সমস্ত শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা যথাযথভাবে আলোচনা করা উচিত।

সব কিছুর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ বা নিষ্পত্তি হচ্ছে পরমাত্মার ইচ্ছা। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*। তিনি সকলকে তার

পূর্বের কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নানা রকম কাজে নিযুক্ত করছেন। অন্তর্যামীরূপে তিনি যে নির্দেশ দেন, সেই নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করলে, এই জন্মে বা পরজন্মে কোন কর্মফল উৎপাদন করে না।

শ্লোক ১৪

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

অধিষ্ঠানম্—স্থান; **তথা**—ও; **কর্তা**—কর্তা; **করণম্**—করণ; **চ**—এবং; **পৃথগ্‌বিধম্**—নানা প্রকার; **বিবিধাঃ**—বিবিধ; **চ**—এবং; **পৃথক্**—পৃথক; **চেষ্টাঃ**—প্রচেষ্টা; **দৈবম্**—দৈব; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **অত্র**—এখানে; **পঞ্চমম্**—পাঁচটি।

গীতার গান

অধিষ্ঠান কর্তা আর করণ পৃথক ।
বিবিধ সে চেষ্টা দৈব এ পঞ্চশীর্ষক ॥

অনুবাদ

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্তা, নানা প্রকার করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ, বিবিধ প্রচেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ পরমাত্মা—এই পাঁচটি হচ্ছে কারণ।

তাৎপর্য

অধিষ্ঠানম্ শব্দটির দ্বারা শরীরকে বোঝানো হয়েছে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ আত্মা কর্মের ফলাদি সৃষ্টি করছেন এবং সেই কারণে তাঁকে বলা হয় কর্তা। আত্মাই যে জ্ঞাতা ও কর্তা, সেই কথা *শ্রুতি* শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। *এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা* (*প্রশ্ন উপনিষদ* ৪/৯)। *বেদান্ত-সূত্রের জ্ঞোঽত এব* (২/৩/১৮) এবং *কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ* (২/৩/৩৩) শ্লোকেও তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে কাজ করার যন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় আত্মা নানাভাবে কাজ করে। প্রতিটি কাজের জন্য নানা রকম প্রয়াস করতে হয়। কিন্তু সকলের সমস্ত কার্যকলাপ নির্ভর করে পরমাত্মার ইচ্ছার উপরে, যিনি সকলের হৃদয়ে বন্ধুরূপে বিরাজ করছেন। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম কারণ। এই অবস্থায়, যিনি অন্তর্যামী পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবা করে চলেছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই

কোন কর্মের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হন না। যাঁরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময়, তাঁদের কোন কর্মের জন্যই তাঁরা নিজেরা শেষ পর্যন্ত দায়ী হন না। সব কিছুই নির্ভর করে পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছার উপর।

শ্লোক ১৫

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

শরীর—দেহ; **বাক্**—বাক্য; **মনোভিঃ**—মনের দ্বারা; **যৎ**—যে; **কর্ম**—কর্ম; **প্রারভতে**—আরম্ভ করে; **নরঃ**—মানুষ; **নায্যম্**—ন্যায়যুক্ত; **বা**—অথবা; **বিপরীতম্**—বিপরীত; **বা**—অথবা; **পঞ্চ**—পাঁচটি; **এতে**—এই; **তস্য**—তার; **হেতবঃ**—কারণ।

গীতার গান

শরীর বচন মন কর্ম তৎ দ্বারা।
ন্যায্য বা অন্যায্য যত কর্ম সারা ॥
সবার কারণ হয় সেই পঞ্চবিধ।
সকল কার্যের হয় সেই সে হেতব ॥

অনুবাদ

শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মানুষ যে কর্ম আরম্ভ করে, তা ন্যায্যই হোক অথবা অন্যায্যই হোক, এই পাঁচটি তার কারণ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লিখিত 'ন্যায্য' এবং তার বিপরীত 'অন্যায্য' শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ন্যায্য কর্ম শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং অন্যায্য কর্ম শাস্ত্রবিধির অবহেলা করে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে কাজই হোক না কেন, তার সম্যক্ অনুষ্ঠানের জন্য এই পঞ্চবিধ কারণ প্রয়োজন।

শ্লোক ১৬

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র—সেখানে; এবম্—এভাবে; সতি—হলেও; কর্তারম্—কর্তারূপে; আত্মানম্—নিজেকে; কেবলম্—কেবল; তু—কিন্তু; যঃ—যে; পশ্যতি—দর্শন করে; অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ—বুদ্ধির অভাববশত; ন—না; সঃ—সেই; পশ্যতি—দর্শন করতে পারে; দুর্মতিঃ—দুর্মতি।

গীতার গান

মূর্খ যারা কর্তা সাজে নিজ মনগড়া।
না বুঝিয়া কারণ সে শুধু কর্তা ছাড়া ॥

অনুবাদ

অতএব, কর্মের পাঁচটি কারণের কথা বিবেচনা না করে যে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, বুদ্ধির অভাববশত সেই দুর্মতি যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে না।

তাৎপর্য

কোন মূর্খ লোক বুঝতে পারে না যে, পরম বন্ধুরূপে পরমাত্মা তার হৃদয়ে বসে আছেন এবং তিনি তার সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করছেন। যদিও কর্মক্ষেত্র, কর্মকর্তা, প্রচেষ্টা ও ইন্দ্রিয়সমূহ—এই চারটি হচ্ছে জড় কারণ, কিন্তু পরম কারণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সুতরাং, চারটি জড় কারণকেই কেবল দেখা উচিত নয়, পরম নিমিত্ত যে কারণ, তাকেও দেখা উচিত। যে পরমেশ্বরকে দেখতে পায় না, সে নিজেকেই কর্তা বলে মনে করে।

শ্লোক ১৭

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

যস্য—যাঁর; ন—নেই; অহংকৃতঃ—অহংকারের; ভাবঃ—ভাব; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; যস্য—যাঁর; ন—না; লিপ্যতে—লিপ্ত হয়; হত্বা অপি—হত্যা করেও; সঃ—তিনি; ইমান্—এই সমস্ত; লোকান্—প্রাণীকে; ন—না; হন্তি—হত্যা করেন; ন—না; নিবধ্যতে—আবদ্ধ হন।

গীতার গান

অতএব যে না হয় অহঙ্কারে মত্ত।
বুদ্ধি যার অহংভাবে নাহি হয় লিপ্ত ॥

কর্তব্যের অনুরোধে যদি বিশ্ব মারে।
কাহাকেও মারে না সে কিংবা কর্ম করে ॥

অনুবাদ

যাঁর অহঙ্কারের ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি এই সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করেও হত্যা করেন না এবং হত্যার কর্মফলে আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে, যুদ্ধ না করার যে বাসনা তা উদয় হচ্ছে অহঙ্কার থেকে। অর্জুন নিজেকেই কর্তা বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু তিনি অন্তরে ও বাইরে পরম অনুমোদনের কথা বিবেচনা করেননি। কেউ যদি পরম অনুমোদন সম্বন্ধে অবগত হতে না পারে, তা হলে তিনি কেন কর্ম করবেন? কিন্তু যিনি কর্মের করণ, নিজেকে কর্তা এবং পরমেশ্বর ভগবানকে পরম অনুমোদনকারী বলে জানেন, তিনি সব কিছু সুচারুভাবে করতে পারেন। এই ধরনের মানুষ কখনই মোহাচ্ছন্ন হন না। ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এবং তার দায়িত্বের উদয় হয় অহঙ্কার, নাস্তিকতা অথবা কৃষ্ণভাবনার অভাব থেকে। যিনি পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিচালনায় কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করে চলেছেন, তিনি যদি হত্যাও করেন, তা হলেও তা হত্যা নয় এবং তিনি কখনই এই ধরনের হত্যা করার জন্য তার ফল ভোগ করেন না। কোন সৈনিক যখন তার সেনাপতির আদেশ অনুসারে শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে, তখন তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। কিন্তু কোন সৈনিক যদি তার নিজের ইচ্ছায় কাউকে হত্যা করে, তা হলে অবশ্যই বিচারালয়ে তার বিচার হবে।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **জ্ঞেয়ম্**—জ্ঞেয়; **পরিজ্ঞাতা**—জ্ঞাতা; **ত্রিবিধা**—তিন প্রকার; **কর্ম**—কর্মের; **চোদনা**—প্রেরণা; **করণম্**—ইন্দ্রিয়গুলি; **কর্ম**—কর্ম; **কর্তা**—কর্তা; **ইতি**—এই; **ত্রিবিধঃ**—তিন প্রকার; **কর্ম**—কর্মের; **সংগ্রহঃ**—আশ্রয়।

গীতার গান

কর্মের প্রেরণা হয় জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ।
কর্মের সংগ্রহ সে করণ কর্মকর্তা ॥

অনুবাদ

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মের প্রেরণা; করণ, কর্ম ও কর্তা—এই তিনটি কর্মের আশ্রয়।

তাৎপর্য

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনের অনুপ্রেরণায় আমাদের সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম সাধিত হয়। কাজের সহায়ক উপকরণাদি, আসল কাজটি এবং তার কর্মকর্তা—এদের বলা হয় কাজের উপাদান। মানুষের যে কোন কাজকর্মে এই উপাদানগুলি থাকে। কাজ করার আগে খানিকটা উদ্দীপনা থাকে, যাকে বলা হয় অনুপ্রেরণা। কাজটি ঘটবার আগে যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তা হচ্ছে সূক্ষ্ম ধরনেরই কাজ। তারপর কাজটি ক্রিয়ার রূপ নেয়। প্রথমে আমাদের চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছা—এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং তাকে বলা হয় উদ্দীপনা। কর্ম করার অনুপ্রেরণা যদি শাস্ত্র বা গুরুদেবের নির্দেশ থেকে আসে, তা হলে তা অভিন্ন। যখন অনুপ্রেরণা রয়েছে এবং কর্তা রয়েছে, তখন মনসহ ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে প্রকৃত কার্য সাধিত হয়। মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। যে কোন কার্যের সমস্ত উপাদানগুলিকে বলা হয় কর্মসংগ্রহ।

শ্লোক ১৯

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—ও; **কর্তা**—কর্তা; **চ**—ও; **ত্রিধা**—ত্রিবিধ; **এব**—অবশ্যই; **গুণভেদতঃ**—গুণভেদ হেতু; **প্রোচ্যতে**—কথিত হয়; **গুণসংখ্যানে**—বিভিন্ন গুণ সম্বন্ধে; **যথাবৎ**—যথাযথ রূপে; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **তানি**—সেই সমস্ত; **অপি**—ও।

গীতার গান

জ্ঞান আর কর্তা হয় ত্রিবিধ গুণ ভেদে।
কহিব সে ত্রিবিধ ভেদ তোমাকে সংক্ষেপে ॥

অনুবাদ

প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা তিন প্রকার বলে কথিত হয়েছে। সেই সমস্তও যথাযথ রূপে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

চতুর্দশ অধ্যায়ে জড়া প্রকৃতির গুণের তিনটি বিভাগ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সেই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সত্ত্বগুণ হচ্ছে জ্ঞানোদ্ভাসিত, রজোগুণ হচ্ছে জড়-জাগতিক ও বৈষয়িক এবং তমোগুণ হচ্ছে আলস্য ও কর্ম বিমুখতার সহায়ক। জড়া প্রকৃতির সব কয়টি গুণই হচ্ছে বন্ধন। তাদের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায় না। এমন কি, সত্ত্বগুণের মধ্যেও মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সপ্তদশ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন গুণে অধিষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পূজা-পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের জ্ঞান, কর্তা ও কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২০

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

সর্বভূতেষু—সমস্ত প্রাণীতে; **যেন**—যার দ্বারা; **একম্**—এক; **ভাবম্**—ভাব; **অব্যয়ম্**—অব্যয়; **ঈক্ষতে**—দর্শন হয়; **অবিভক্তম্**—অবিভক্ত; **বিভক্তেষু**—পরস্পর ভিন্ন; **তৎ**—সেই; **জ্ঞানম্**—জ্ঞানকে; **বিদ্ধি**—জানবে; **সাত্ত্বিকম্**—সাত্ত্বিক।

গীতার গান

এক জীব আত্মা নানা কর্মফল ভেদে।
মনুষ্যাদি সর্বদেহে সে বর্তমান ক্ষেদে ॥
অব্যয় সে জীব হয় একতত্ত্ব জ্ঞান।
বিভিন্নতে এক দেখে সেই সাত্ত্বিক জ্ঞান ॥

অনুবাদ

যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীতে এক অবিভক্ত চিন্ময় ভাব দর্শন হয়, অনেক জীব পরস্পর ভিন্ন হলেও চিন্ময় সত্তায় তারা এক, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলে জানবে।

তাৎপর্য

যিনি দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি, জলজ বা উদ্ভিজ্জ সমস্ত জীবের মধ্যেই এক চিন্ময় আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী। প্রতিটি জীবের মধ্যে একটি চিন্ময় আত্মা রয়েছে, যদিও জীবগুলি তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দেহ অর্জন করেছে। সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী, পরমেশ্বর ভগবানের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্ট শক্তি থেকেই প্রত্যেক জীবের দেহে জীবনী-শক্তির প্রকাশ ঘটে। এভাবেই প্রতিটি জীবদেহে জীবনীশক্তি-স্বরূপ এক উৎকৃষ্টা পরা প্রকৃতিকে দর্শন করাই হচ্ছে সাত্ত্বিক দর্শন। দেহের বিনাশ হলেও সেই জীবনী-শক্তিটি অবিনশ্বর। জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। যেহেতু বদ্ধ জীবনে জড় অস্তিত্বের নানা রকম রূপ আছে, তাই জীবনীশক্তিকে ঐভাবে বহুধা বিভক্ত বলে মনে হয়। এই ধরনের নির্বিশেষ জ্ঞান হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধিরই একটি অঙ্গ।

শ্লোক ২১

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্ ।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

পৃথক্ত্বেন—পৃথকরূপে; **তু**—কিন্তু; **যৎ**—যে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **নানাভাবান্**—ভিন্ন ভিন্ন ভাব; **পৃথগ্‌বিধান্**—নানাবিধ; **বেত্তি**—জানে; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—প্রাণীতে; **তৎ**—সেই; **জ্ঞানম্**—জ্ঞানকে; **বিদ্ধি**—জানবে; **রাজসম্**—রাজসিক।

গীতার গান

বিভিন্ন জীবের যেই পৃথকত্ব দেখে ।
রাজসিক তার জ্ঞান নানাভাবে থাকে ॥

অনুবাদ

যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আত্মা অবস্থিত বলে পৃথকরূপে দর্শন হয়, সেই জ্ঞানকে রাজসিক বলে জানবে।

তাৎপর্য

জড় দেহটি হচ্ছে জীব এবং দেহটি নষ্ট হয়ে গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে চেতনাও নষ্ট হয়ে যায় বলে যে ধারণা, তাকে বলা হয় রাজসিক জ্ঞান। সেই জ্ঞান অনুসারে দেহের বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেতনার প্রকাশ। এ ছাড়া পৃথক কোন আত্মা নেই, যার থেকে চেতনার প্রকাশ হয়। দেহটি হচ্ছে যেন সেই আত্মা এবং এই দেহের ঊর্ধ্বে পৃথক কোন আত্মা নেই। এই ধরনের জ্ঞান অনুসারে চেতনা হচ্ছে সাময়িক, অথবা স্বতন্ত্র কোন আত্মা নেই। কিন্তু সর্বব্যাপক এক আত্মা রয়েছে, যা পূর্ণ জ্ঞানময় এবং এই দেহটি হচ্ছে সাময়িক অজ্ঞানতার প্রকাশ, অথবা এই দেহের অতীত কোনও বিশেষ জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা নেই। এই ধরনের সমস্ত ধারণাগুলিকেই রজোগুণ-জাত বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ২২

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যৎ—যে; **তু**—কিন্তু; **কৃৎস্নবৎ**—পরিপূর্ণের ন্যায়; **একস্মিন্**—কোন একটি; **কার্যে**—কার্যে; **সক্তম্**—আসক্ত; **অহৈতুকম্**—কারণ রহিত; **অতত্ত্বার্থবৎ**—প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হয়ে; **অল্পম্**—তুচ্ছ; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই; **তামসম্**—তামসিক; **উদাহৃতম্**—কথিত হয়।

গীতার গান

দেহকে সর্বস্ব বুঝি যে জ্ঞান উদ্ভব ।
অতত্ত্বজ্ঞ অল্পবুদ্ধি তামসিক সব ॥

অনুবাদ

আর যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হয়ে, কোন একটি বিশেষ কার্যে পরিপূর্ণের ন্যায় আসক্তির উদয় হয়, সেই তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের 'জ্ঞান' সর্বদাই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, কারণ বদ্ধ জীবনে প্রত্যেক

জীব তমোগুণে জন্মগ্রহণ করে থাকে। যে মানুষ শাস্ত্রীয় অনুশাসন মতে কিংবা শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে প্রামাণ্য সূত্রে জ্ঞানের বিকাশ সাধন করেনি, দেহ-সম্পর্কিত তার সেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। শাস্ত্রীয় অনুশাসন মতো কর্ম সাধনের কোন চিন্তাভাবনাই সে করে না। তার কাছে অর্থ-সম্পদই হচ্ছে ভগবান এবং জ্ঞান হচ্ছে দেহগত চাহিদার তৃপ্তিসাধন। পরম তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে এই ধরনের জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। এটি অনেকটা সাধারণ একটি পশুর জ্ঞানেরই মতো—শুধুমাত্র আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা ও মৈথুন সংক্রান্ত জ্ঞান। এই ধরনের জ্ঞানকে এখানে তমোগুণ-প্রসূত বলে অভিহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে যে, এই দেহের ঊর্ধ্বে চিন্ময় আত্মা সংক্রান্ত যে জ্ঞান, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক জ্ঞান। মনোধর্ম ও জাগতিক যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে যে সমস্ত মতবাদ ও ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান, তা হচ্ছে রজোগুণাশ্রিত এবং কেবলমাত্র দেহসুখ ভোগের উদ্দেশ্যে যে জ্ঞান, তা হচ্ছে তমোগুণাশ্রিত।

শ্লোক ২৩

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

নিয়তম্—নিত্য; **সঙ্গরহিতম্**—আসক্তি রহিত হয়ে; **অরাগদ্বেষতঃ**—রাগ ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত হয়; **অফলপ্রেপ্সুনা**—ফলের কামনাশূন্য; **কর্ম**—কর্ম; **যৎ**—যে; **তৎ**—তাকে; **সাত্ত্বিকম্**—সাত্ত্বিক; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

রাগ দ্বেষ সঙ্গ বিনা যে নিয়ত কর্ম ।
সে জানিবে সব সাত্ত্বিকের ধর্ম ॥

অনুবাদ

ফলের কামনাশূন্য ও আসক্তি রহিত হয়ে রাগ ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয় ।

তাৎপর্য

শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে সমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রম-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিধিবদ্ধ বৃত্তিমূলক কর্তব্যকর্মাদি অনাসক্তভাবে কর্তৃত্ববোধ বর্জন করে সম্পাদিত

হলে এবং সেই কারণেই অনুরাগ অথবা বিদ্বেষমুক্ত হয়ে, পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি কিংবা আত্ম-উপভোগ রহিত হয়ে সম্পাদিত হলে, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

শ্লোক ২৪

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

যৎ—যে; **তু**—কিন্তু; **কামেপ্সুনা**—ফলের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত; **কর্ম**—কর্ম; **সাহঙ্কারেণ**—অহঙ্কার যুক্ত হয়ে; **বা**—অথবা; **পুনঃ**—পুনরায়; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **বহুলায়াসম্**—বহু কষ্টসাধ্য; **তৎ**—সেই; **রাজসম্**—রাজসিক; **উদাহৃতম্**—অভিহিত হয়।

গীতার গান

ফলের কামনা কর্ম অহঙ্কার সহ।
কষ্টসাধ্য যত রাজস সমূহ ॥

অনুবাদ

কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ও অহঙ্কারযুক্ত হয়ে বহু কষ্টসাধ্য করে যে কর্মের অনুষ্ঠান হয়, সেই কর্ম রাজসিক বলে অভিহিত হয়।

শ্লোক ২৫

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অনুবন্ধম্—ভাবী বন্ধন; **ক্ষয়ম্**—ক্ষয়; **হিংসাম্**—হিংসা; **অনপেক্ষ্য**—পরিণতির কথা বিবেচনা না করে; **চ**—ও; **পৌরুষম্**—নিজ সামর্থ্যের; **মোহাৎ**—মোহবশত; **আরভ্যতে**—আরম্ভ হয়; **কর্ম**—কর্ম; **যৎ**—যে; **তৎ**—তাকে; **তামসম্**—তামসিক; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

না বুঝিয়া মোহবশে অনুবন্ধ কর্ম ।
হিংসা পরতাপ আদি তামসিক ধর্ম ॥

অনুবাদ

ভাবী বন্ধন, ধর্ম জ্ঞানাদির ক্ষয়, হিংসা এবং নিজ সামর্থ্যের পরিণতির কথা বিবেচনা না করে মোহবশত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে তামসিক কর্ম বলা হয়।

তাৎপর্য

রাষ্ট্রের কাছে বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি যমদূতদের কাছে আমাদের সমস্ত কর্মের কৈফিয়ত দিতে হয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম হয়ে থাকে ধ্বংসাত্মক, কারণ তা শাস্ত্র-নির্দেশিত ধর্মের অনুশাসনাদি ধ্বংস করে। অনেক ক্ষেত্রেই তা হিংসাভিত্তিক হয় এবং অন্য জীবকে কষ্ট দেয়। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম করা হয়ে থাকে। একে বলা হয় মোহ এবং এই ধরনের সমস্ত মোহযুক্ত কাজই হচ্ছে তমোগুণ-জাত।

শ্লোক ২৬

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

মুক্তসঙ্গঃ—সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত; **অনহংবাদী**—অহঙ্কারশূন্য; **ধৃতি**—ধৃতি; **উৎসাহ**—উদ্যম; **সমন্বিতঃ**—সমন্বিত; **সিদ্ধি**—সিদ্ধি; **অসিদ্ধ্যোঃ**—অসিদ্ধিতে; **নির্বিকারঃ**—নির্বিকার; **কর্তা**—কর্তা; **সাত্ত্বিকঃ**—সাত্ত্বিক; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

মুক্তসঙ্গ অনহঙ্কার ধৃতি উৎসাহপূর্ণ ।
নির্বিকার সিদ্ধাসিদ্ধি সাত্ত্বিক সে ধন্য ॥

অনুবাদ

সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার—এরূপ কর্তাকেই সাত্ত্বিক বলা হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই প্রকৃতির জড় গুণগুলির অতীত। তাঁর উপরে ন্যস্ত হয়েছে যে সমস্ত কর্ম, সেগুলির ফলের আকাঙ্ক্ষা তিনি করেন না। কারণ, তিনি গর্ব ও অহঙ্কারের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন। তবুও সেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি সর্বদাই উৎসাহ নিয়ে কাজ করে চলেন। যে দুঃখ-দুর্দশা, বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়, তার জন্য তিনি দুশ্চিন্তা করেন না। তিনি সর্বদাই উৎসাহী। তিনি সফলতা বা বিফলতা কোনটিরই পরোয়া করেন না। তিনি সুখ ও দুঃখ উভয়ের প্রতিই সমভাবাপন্ন। এই ধরনের কর্তা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২৭

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

রাগী—কর্মাসক্ত; **কর্মফল**—কর্মফলে; **প্রেপ্সুঃ**—আকাঙ্ক্ষী; **লুব্ধঃ**—লোভী; **হিংসাত্মকঃ**—হিংসা-পরায়ণ; **অশুচিঃ**—অশুচি; **হর্ষশোকান্বিতঃ**—হর্ষ ও শোকযুক্ত; **কর্তা**—কর্তা; **রাজসঃ**—রাজসিক; **পরিকীর্তিতঃ**—কথিত হয়।

গীতার গান

কর্মাসক্ত ফলে লোভ হিংসুক অশুচি ।
রাজসিক কর্তা সেই হর্ষশোকে রুচি ॥

অনুবাদ

কর্মাসক্ত, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপ্রিয়, অশুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত যে কর্তা, সে রাজসিক কর্তা বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

বিশেষ কোন কর্মের প্রতি বা তার ফলের প্রতি কোন মানুষের গভীর আসক্ত হয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে জড়-জাগতিক বিষয়াদি, ঘরবাড়ি ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তাঁর অত্যধিক আসক্তি। এই ধরনের মানুষের উচ্চতর জীবনে উন্নীত হওয়ার কোন অভিলাষ নেই। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পৃথিবীটিকে যতদূর সম্ভব জড়-জাগতিক পদ্ধতিতে আরামদায়ক করে তোলা। সে স্বভাবতই অত্যন্ত লোভী এবং

সে মনে করে যে, যা কিছু সে লাভ করেছে তা সবই নিত্য এবং তা কখনই হারিয়ে যাবে না। এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত পরশ্রীকাতর এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যে কোন জঘন্য কাজ করতে প্রস্তুত। তাই, এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত অশুচি এবং তার উপার্জন পবিত্র না অপবিত্র, সেই সম্বন্ধে সে পরোয়া করে না। তার কাজ যদি সফল হয়, তখন সে খুব খুশি হয় এবং তাঁর কাজ যদি বিফল হয়, তা হলে তার দুঃখের অন্ত থাকে না। এই ধরনের কর্তা রজোগুণে আচ্ছন্ন।

শ্লোক ২৮

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অযুক্তঃ—অনুচিত কার্যপ্রিয়; **প্রাকৃতঃ**—জড় চেষ্টাযুক্ত; **স্তব্ধঃ**—অনম্র; **শঠঃ**—বঞ্চক; **নৈষ্কৃতিকঃ**—অন্যের অবমাননাকারী; **অলসঃ**—অলস; **বিষাদী**—বিষাদযুক্ত; **দীর্ঘসূত্রী**—দীর্ঘসূত্রী; **চ**—ও; **কর্তা**—কর্তা; **তামসঃ**—তামসিক; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

অযুক্ত প্রাকৃত স্তব্ধ নৈষ্কৃতি অলস ।
দীর্ঘসূত্রী বিষাদী বা কর্তা সে তামস ॥

অনুবাদ

অনুচিত কার্যপ্রিয়, জড় চেষ্টাযুক্ত, অনম্র, শঠ, অন্যের অবমাননাকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী যে কর্তা, তাকে তামসিক কর্তা বলা হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে আমরা জানতে পারি কি ধরনের কর্ম করা উচিত এবং কি ধরনের কর্ম করা উচিত নয়। যারা এই সমস্ত অনুশাসন মানে না, তারা অনুচিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই ধরনের মানুষেরা সাধারণত বিষয়ী হয়। তারা প্রকৃতির গুণ অনুসারে কর্ম করে, কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে কাজ করে না। এই ধরনের কর্মীরা সাধারণত খুব একটা ভদ্র হয় না। সাধারণত তারা অত্যন্ত ধূর্ত এবং অপরকে অপদস্থ করতে খুব পটু। তারা অত্যন্ত অলস, তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হলেও ঠিকমতো করে না এবং পরে করব বলে তা সরিয়ে রাখে।

তাই তাদের বিষণ্ণ বলে মনে হয়। তারা যে-কোন কার্য সম্পাদনে বিলম্ব করে; যে কাজটি এক ঘণ্টার মধ্যে করা সম্ভব, তা তারা বছরের পর বছর ফেলে রাখে। এই ধরনের কর্মীরা তমোগুণে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ২৯

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির; **ভেদম্**—ভেদ; **ধৃতেঃ**—ধৃতির; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **গুণতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ দ্বারা; **ত্রিবিধম্**—তিন প্রকার; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **প্রোচ্যমানম্**—যেভাবে আমি বলছি; **অশেষেণ**—বিস্তারিতভাবে; **পৃথক্ত্বেন**—পৃথকভাবে; **ধনঞ্জয়**—হে ধনঞ্জয়।

গীতার গান

বুদ্ধির যে তিন ভেদ ধৃতি আর গুণ ।
ধনঞ্জয় অশেষ বিচার তার শুন ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ অনুসারে বুদ্ধির ও ধৃতির যে ত্রিবিধ ভেদ আছে, তা আমি বিস্তারিতভাবে ও পৃথকভাবে বলছি, তুমি শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে তিনটি ভাগে বিভক্ত জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা সম্বন্ধে বর্ণনা করে, ভগবান এখন একইভাবে কর্তার বুদ্ধি ও ধৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করছেন।

শ্লোক ৩০

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে ।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

প্রবৃত্তিম্—প্রবৃত্তি; **চ**—ও; **নিবৃত্তিম্**—নিবৃত্তি; **চ**—ও; **কার্য**—কার্য; **অকার্যে**—অকার্য; **ভয়**—ভয়; **অভয়ে**—অভয়; **বন্ধম্**—বন্ধন; **মোক্ষম্**—মুক্তি; **চ**—ও; **যা**—যে; **বেত্তি**—জানতে পারা যায়; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **সা**—সেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **সাত্ত্বিকী**—সাত্ত্বিকী।

গীতার গান

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কার্য অকার্য বিচার ।
ভয়াভয় বন্ধ মুক্তি সত্ত্ববুদ্ধি তার ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি—এই সকলের পার্থক্য জানতে পারা যায়, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।

তাৎপর্য

কর্ম যখন শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রবৃত্তি বা করণীয় কর্ম এবং যে কর্ম করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি, তা করা উচিত নয়। যে মানুষ শাস্ত্রের নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়, সে কর্ম এবং তার প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বুদ্ধির দ্বারা পার্থক্য নিরূপণের যে উপলব্ধির বিকাশ হয়, তা হচ্ছে সত্ত্বগুণাশ্রিত।

শ্লোক ৩১

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্যমেব চ ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **ধর্মম্**—ধর্ম; **অধর্মম্**—অধর্ম; **চ**—ও; **কার্যম্**—কার্য; **চ**—ও; **অকার্যম্**—অকার্য; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **অযথাবৎ**—অসম্যক রূপে; **প্রজানাতি**—জানতে পারা যায়; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **সা**—সেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **রাজসী**—রাজসিকী।

গীতার গান

ধর্মাধর্ম কার্যাকার্য অযথাবৎ জানে ।
রাজসিক সেই বুদ্ধি শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

অনুবাদ

যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য আদির পার্থক্য অসম্যক্ রূপে জানতে পারা যায়, সেই বুদ্ধি রাজসিকী।

শ্লোক ৩২

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

অধর্মম্—অধর্মকে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **ইতি**—এভাবেই; **যা**—যে; **মন্যতে**—মনে করে; **তমসা**—মোহের দ্বারা; **আবৃতা**—আবৃত; **সর্বার্থান্**—সমস্ত বস্তুকে; **বিপরীতান্**—বিপরীত; **চ**—ও; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **সা**—সেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **তামসী**—তামসিকী।

গীতার গান

ধর্মকে অধর্ম মানে অধর্মকে ধর্ম ।
বিপরীত সে তামস বুদ্ধি আর কর্ম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সমস্ত বস্তুকে বিপরীত বলে মনে করে, তমসাবৃত সেই বুদ্ধিই তামসিকী।

তাৎপর্য

তমোগুণাশ্রিত বুদ্ধিবৃত্তি সব সময়ে যেভাবে কাজ করা উচিত, তার বিপরীতটাই করে। যেগুলি আসলে ধর্ম নয়, সেগুলিকেই তারা ধর্ম বলে মেনে নেয়, আর প্রকৃত ধর্মকে বর্জন করে। তামসিক লোকেরা মহাত্মাকে মনে করে সাধারণ মানুষ, আর সাধারণ মানুষকে মহাত্মা বলে মেনে নেয়। সকল কাজেই তারা কেবল ভুল পথটি গ্রহণ করে। তাই, তাদের বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন।

শ্লোক ৩৩

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

ধৃত্যা—ধৃতির দ্বারা; **যয়া**—যে; **ধারয়তে**—ধারণ করে; **মনঃ**—মন; **প্রাণ**—প্রাণ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **ক্রিয়াঃ**—ক্রিয়াসকলকে; **যোগেন**—যোগ অভ্যাস দ্বারা; **অব্যভিচারিণ্যা**—অব্যভিচারিণী; **ধৃতিঃ**—ধৃতি; **সা**—সেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **সাত্ত্বিকী**—সাত্ত্বিকী।

গীতার গান

যে ধৃতির দ্বারা ধরে প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়া ।
অব্যভিচারিণী ভক্তি সাত্ত্বিকী সে ধিয়া ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগ অভ্যাস দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী।

তাৎপর্য

যোগ হচ্ছে পরমাত্মাকে জানার একটি উপায়। ধৃতি বা দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে যিনি পরম আত্মাতে একাগ্র হয়েছেন এবং মন, প্রাণ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে পরমেশ্বরে একাগ্র করেছেন, তিনি ভক্তিযোগে কৃষ্ণভাবনার সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের ধৃতি সত্ত্বগুণাশ্রিত। এখানে *অব্যভিচারিণ্যা* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির দ্বারা সেই সমস্ত মানুষদের কথা বলা হচ্ছে, যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা আর অন্য কোন কার্যকলাপের দ্বারা কখনই পথভ্রষ্ট হন না।

শ্লোক ৩৪

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন ।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যয়া—যে; **তু**—কিন্তু; **ধর্মকামার্থান্**—ধর্ম, অর্থ ও কামকে; **ধৃত্যা**—ধৃতির দ্বারা; **ধারয়তে**—ধারণ করে; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **প্রসঙ্গেন**—সঙ্গবশত; **ফলাকাঙ্ক্ষী**—ফলের আকাঙ্ক্ষী; **ধৃতিঃ**—ধৃতি; **সা**—সেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **রাজসী**—রাজসিকী।

গীতার গান

যে ধৃতির দ্বারা ধরে ধর্ম, অর্থ, কাম ।
ফলাকাঙ্ক্ষী রাজসিক হয় তার নাম ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! হে পার্থ! যে ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে, সেই ধৃতি রাজসী।

তাৎপর্য

যে মানুষ সব রকম ধর্ম অনুষ্ঠান বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বদাই ফলের আকাঙ্ক্ষা করে, যার একমাত্র বাসনা হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা এবং যার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলি এভাবেই নিযুক্ত হয়েছে, সে রজোগুণাশ্রিত।

শ্লোক ৩৫

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **স্বপ্নম্**—স্বপ্ন; **ভয়ম্**—ভয়; **শোকম্**—শোক; **বিষাদম্**—বিষাদ; **মদম্**—মদ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **ন**—না; **বিমুঞ্চতি**—ত্যাগ করে; **দুর্মেধা**—বুদ্ধিহীনা; **ধৃতিঃ**—ধৃতি; **সা**—সেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **তামসী**—তামসী।

গীতার গান

যে ধৃতি দ্বারা নহে স্বপ্ন ভয় ত্যাগ ।
তামসী সে ধৃতি দুর্মেধা আর মদ ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ আদিকে ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীনা ধৃতিই তামসী।

তাৎপর্য

এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, সাত্ত্বিক মানুষেরা স্বপ্ন দেখে না। এখানে 'স্বপ্ন' বলতে বোঝাচ্ছে অত্যধিক নিদ্রা। সত্ত্ব, রজ বা তম যে গুণই হোক না কেন, স্বপ্ন সর্বদাই থাকে। স্বপ্ন দেখাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যারা বেশি না ঘুমিয়ে পারে না, যারা জড় জগৎকে ভোগ করার গর্বে গর্বিত না হয়ে পারে না, যারা জড় জগতে কর্তৃত্ব করার স্বপ্ন দেখছে এবং যাদের প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় আদি সেভাবেই নিযুক্ত, তারা তমোগুণের ধৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৬

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

সুখম্—সুখ; **তু**—কিন্তু; **ইদানীম্**—এখন; **ত্রিবিধম্**—তিন প্রকার; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার কাছে; **ভরতর্ষভ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; **অভ্যাসাৎ**—অভ্যাসের দ্বারা; **রমতে**—রমণ করে; **যত্র**—যেখানে; **দুঃখ**—দুঃখের; **অন্তম্**—অন্ত; **চ**—ও; **নিগচ্ছতি**—লাভ করে।

গীতার গান

ত্রিবিধ সে সুখ শুন ভারত ঋষভ ।
জড় সুখে মজে জীব কিন্তু দুঃখ সব ॥
সে সুখ সে উপরতি দুঃখ অন্ত হয় ।
সংসারের মায়াসুখ তবে হয় ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে ভরতর্ষভ! এখন তুমি আমার কাছে ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। বদ্ধ জীব পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই সুখে রমণ করে এবং যার দ্বারা সমস্ত দুঃখের অন্তলাভ করে থাকে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব বারবার জড় সুখ উপভোগ করতে চেষ্টা করে। এভাবেই সে চর্বিত বস্তু চর্বণ করে। কিন্তু কখন কখন এই ধরনের সুখ উপভোগ করতে করতে কোন মহাত্মার সঙ্গ লাভ করার ফলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, বদ্ধ জীব সর্বদাই কোন না কোন রকমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় রত থাকে। কিন্তু সাধুসঙ্গের প্রভাবে সে যখন বুঝতে পারে যে, তা কেবল একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি, তখন সে তার যথার্থ কৃষ্ণভাবনায় জাগরিত হয়ে ওঠে। তখন সে এভাবেই আবর্তনশীল তথাকথিত সুখের কবল থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৩৭

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

যৎ—যে; তৎ—তা; অগ্রে—প্রথমে; বিষম্ ইব—বিষের মতো; পরিণামে—অবশেষে; অমৃত—অমৃত; উপমম্—তুল্য; তৎ—সেই; সুখম্—সুখ; সাত্ত্বিকম্—সাত্ত্বিক; প্রোক্তম্—কথিত হয়; আত্ম—আত্ম সম্বন্ধীয়; বুদ্ধি—বুদ্ধির; প্রসাদজম্—নির্মলতা থেকে জাত।

গীতার গান

অগ্রেতে বিষের সম পশ্চাতে অমৃত ।
যে সুখের পরিচয় সে হয় সাত্ত্বিক ॥
সে সুখের লাভ হয় আত্মপ্রসাদেতে ।
আত্মবুদ্ধি ভাগ্যবান যোগ্য যে তাহাতে ॥

অনুবাদ

যে সুখ প্রথমে বিষের মতো কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য এবং আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা থেকে জাত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

আত্মজ্ঞান লাভের পথে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে ভগবানের প্রতি মনকে একাগ্র করবার জন্য নানা রকমের বিধি-নিষেধের অনুশীলন করতে হয়। এই সমস্ত বিধিগুলি অত্যন্ত কঠিন, বিষের মতো তিক্ত। কিন্তু কেউ যদি এই সমস্ত বিধিগুলির অনুশীলনের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি প্রকৃত অমৃত পান করতে শুরু করেন এবং জীবনকে যথার্থভাবে উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৮

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

বিষয়—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের; সংযোগাৎ—সংযোগের ফলে; যৎ—যা; তৎ—তা; অগ্রে—প্রথমে; অমৃতোপমম্—অমৃতের মতো; পরিণামে—অবশেষে; বিষম্ ইব—বিষের মতো; তৎ—সেই; সুখম্—সুখ; রাজসম্—রাজস; স্মৃতম্—কথিত হয়।

গীতার গান

ইন্দ্রিয়ের সংযোগেতে বিষয়ের ভোগ ।
অমৃতের মত অন্তে কিন্তু ভবরোগ ॥
পরিণামে বিষয়ের বিষ হয় লাভ ।
রাজসিক সেই সুখ জীবের স্বভাব ॥

অনুবাদ

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সুখ প্রথমে অমৃতের মতো এবং পরিণামে বিষের মতো অনুভূত হয়, সেই সুখকে রাজসিক বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

একজন যুবক যখন একজন যুবতীর সান্নিধ্যে আসে, তখন যুবকটির ইন্দ্রিয়গুলি যুবতীটিকে দেখবার জন্য, তাকে স্পর্শ করবার জন্য এবং যৌন সম্ভোগ করবার জন্য তাকে প্ররোচিত করতে থাকে। এই ধরনের ইন্দ্রিয়সুখ প্রথমে অত্যন্ত সুখদায়ক হতে পারে, কিন্তু পরিণামে অথবা কিছু কাল পরে, তা বিষবৎ হয়ে ওঠে। তারা একে অপরকে ছেড়ে চলে যায় অথবা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। তখন শোক, দুঃখ আদির উদয় হয়। এই ধরনের সুখ সর্বদাই রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মিলনের ফলে উদ্ভূত যে সুখ, তা সর্বদাই দুঃখদায়ক এবং তা সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত।

শ্লোক ৩৯

**যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥**

যৎ—যে; **অগ্রে**—প্রথমে; **চ**—ও; **অনুবন্ধে**—শেষে; **চ**—ও; **সুখম্**—সুখ; **মোহনম্**—মোহজনক; **আত্মনঃ**—আত্মার; **নিদ্রা**—নিদ্রা; **আলস্য**—আলস্য; **প্রমাদ**—প্রমাদ; **উত্থম্**—উৎপন্ন হয়; **তৎ**—তা; **তামসম্**—তামসিক; **উদাহৃতম্**—কথিত হয়।

গীতার গান

যাহা অগ্রে অনুবন্ধে সুখের মোহন ।
নিদ্রালস প্রমাদোত্থ তামসিক জন ॥

অনুবাদ

যে সুখ প্রথমে ও শেষে আত্মার মোহজনক এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়, তা তামসিক সুখ বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

আলস্য ও নিদ্রার যে সুখ তা অবশ্যই তামসিক এবং যে জানে না কিভাবে কর্ম করা উচিত এবং কিভাবে কর্ম করা উচিত নয়, তাও তামসিক। তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষদের কাছে সবই মোহজনক। তার শুরুতেও সুখ নেই এবং পরিণতিতেও সুখ নেই। রজোগুণে আচ্ছন্ন মানুষদের বেলায় শুরুতে এক ধরনের ক্ষণিক সুখ থাকতে পারে এবং পরিণামে তা হয় দুঃখদায়ক, কিন্তু তামসিক মানুষদের বেলায় শুরু ও শেষ সর্ব অবস্থাতেই কেবল দুঃখ।

শ্লোক ৪০

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

ন—নেই; **তৎ**—সেই; **অস্তি**—আছে; **পৃথিব্যাম্**—পৃথিবীতে; **বা**—অথবা; **দিবি**—স্বর্গে; **দেবেষু**—দেবতাদের মধ্যে; **বা**—অথবা; **পুনঃ**—পুনরায়; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **প্রকৃতিজৈঃ**—প্রকৃতিজাত; **মুক্তম্**—মুক্ত; **যৎ**—যে; **এভিঃ**—এই; **স্যাৎ**—হয়; **ত্রিভিঃ**—তিন; **গুণৈঃ**—গুণ থেকে।

গীতার গান

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত নর দেবলোকে।
কেহ নহে মুক্ত সেই ত্রিগুণ ত্রিলোকে ॥

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে এমন কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই, যে প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে সারা জগৎ জুড়ে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের যে সমষ্টিগত প্রভাব, তার সারমর্ম বিশ্লেষণ করছেন।

শ্লোক ৪১

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়; বিশাম্—বৈশ্য; শূদ্রাণাম্—শূদ্রদের; চ—এবং; পরন্তপ—হে পরন্তপ; কর্মাণি—কর্মসমূহ; প্রবিভক্তানি—বিভাগ হয়েছে; স্বভাব—স্বভাব; প্রভবৈঃ—জাত; গুণৈঃ—গুণসমূহের দ্বারা।

গীতার গান

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পরন্তপ ।
স্বভাব প্রভাবে গুণ হয় কর্ম সব ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ! স্বভাবজাত গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসমূহ বিভক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৪২

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

শমঃ—অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম; দমঃ—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম; তপঃ—তপস্যা; শৌচম্—শৌচ; ক্ষান্তিঃ—সহিষ্ণুতা; আর্জবম্—সরলতা; এব—অবশ্যই; চ—এবং; জ্ঞানম্—শাস্ত্রীয় জ্ঞান; বিজ্ঞানম্—তত্ত্ব-উপলব্ধি; আস্তিক্যম্—ধর্মপরায়ণতা; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণের; কর্ম—কর্ম; স্বভাবজম্—স্বভাবজাত।

গীতার গান

শম দম তপ শৌচ ক্ষান্তি সে আর্জব ।
জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য ব্রহ্মকর্ম ভাব ॥

অনুবাদ

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এগুলি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।

শ্লোক ৪৩

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শৌর্যম্—পরাক্রম; **তেজঃ**—তেজ; **ধৃতিঃ**—ধৈর্য; **দাক্ষ্যম্**—কর্মে কুশলতা; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **অপলায়নম্**—পলায়ন না করা; **দানম্**—দান; **ঈশ্বর**—প্রভুত্ব; **ভাবঃ**—ভাব; **চ**—এবং; **ক্ষাত্রম্**—ক্ষত্রিয়ের; **কর্ম**—কর্ম; **স্বভাবজম্**—স্বভাবজাত।

গীতার গান

শৌর্য তেজ ধৃতি দাক্ষ্য যুদ্ধে না পালায় ।
দান ঈশ ভাব যত ক্ষত্রিয়ে যুয়ায় ॥

অনুবাদ

শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও শাসন ক্ষমতা—এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।

শ্লোক ৪৪

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃষি—কৃষি; **গোরক্ষ্য**—গোরক্ষা; **বাণিজ্যম্**—বাণিজ্য; **বৈশ্য**—বৈশ্যের; **কর্ম**—কর্ম; **স্বভাবজম্**—স্বভাবজাত; **পরিচর্যা**—পরিচর্যা; **আত্মকম্**—আত্মক; **কর্ম**—কর্ম; **শূদ্রস্য**—শূদ্রের; **অপি**—ও; **স্বভাবজম্**—স্বভাবজাত।

গীতার গান

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্যকর্ম হয় ।
শূদ্র যে স্বভাব তার পরিচর্যা করায় ॥

অনুবাদ

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত।

শ্লোক ৪৫

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

স্বে স্বে—নিজ নিজ; **কর্মণি**—কর্মে; **অভিরতঃ**—নিরত; **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **লভতে**—লাভ করে; **নরঃ**—মানুষ; **স্বকর্ম**—স্বীয় কর্মে; **নিরতঃ**—যুক্ত; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **যথা**—যেভাবে; **বিন্দতি**—লাভ করে; **তৎ**—তা; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

উচ্চ নীচ যত কর্ম সবে সিদ্ধি হয় ।
স্বকর্ম করিয়া গুণ সংসার তরয় ॥

অনুবাদ

নিজ নিজ কর্মে নিরত মানুষ সিদ্ধি লাভ করে থাকে। স্বীয় কর্মে যুক্ত মানুষ যেভাবে সিদ্ধি লাভ করে, তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ৪৬

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

যতঃ—যাঁর থেকে; **প্রবৃত্তিঃ**—প্রবৃত্তি; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **সর্বম্**—সমস্ত; **ইদম্**—এই; **ততম্**—ব্যাপ্ত; **স্বকর্মণা**—তার নিজের কর্মের দ্বারা; **তম্**—তাঁকে; **অভ্যর্চ্য**—অর্চন করে; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **বিন্দতি**—লাভ করে; **মানবঃ**—মানুষ।

গীতার গান

যিনি ব্যষ্টি সমষ্টি বা জগৎ কারণ ।
যাঁহা হতে ভূতগণের বাসনা জীবন ॥
স্বকর্ম করিয়া যদি সেই প্রভু ভজে ।
সিদ্ধিলাভ হয় তার সংসারে না মজে ॥

অনুবাদ

যাঁর থেকে সমস্ত জীবের পূর্ব বাসনারূপ প্রবৃত্তি হয়, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁকে মানুষ তার নিজের কর্মের দ্বারা অর্চন করে সিদ্ধি লাভ করে।

তাৎপর্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের আদি উৎস। *বেদান্তসূত্রে* তার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ*। সুতরাং, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকটি জীবের প্রাণের উৎস। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দুটি শক্তি—অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সর্বব্যাপ্ত। তাই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর শক্তিসহ আরাধনা করা। সাধারণত বৈষ্ণব ভক্তেরা ভগবানকে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সহ উপাসনা করেন। তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিকৃত প্রতিবিম্ব। বহিরঙ্গা শক্তিটি হচ্ছে পটভূমি, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করে সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সমস্ত দেব-দেবী, সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু—সকলেরই পরমাত্মা এবং সর্বত্র বিরাজ করছেন। তাই সকলেরই এটি জানা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে তাদের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। সকলেরই উচিত সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হওয়া। এই শ্লোকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশের দ্বারা তারা ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ধরনের কর্মে নিযুক্ত রয়েছে এবং সেই সকল কর্মের ফলের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্তব্য। কেউ যদি সর্বদাই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে এভাবেই চিন্তা করেন, তা হলে ভগবানের কৃপার ফলে তিনি অচিরেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করবেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। *ভগবদ্গীতায়* (১২/৭) ভগবান বলেছেন—*তেষামহং সমুদ্ধর্তা*। এই প্রকার ভক্তকে উদ্ধার করার ভার পরমেশ্বর ভগবান নিজেই গ্রহণ করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। যে কোন রকম কর্মেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, যদি তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, তা হলে তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ৪৭

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রেয়ান্—শ্রেয়; **স্বধর্মঃ**—স্বধর্ম; **বিগুণঃ**—অসম্যক রূপে অনুষ্ঠিত; **পরধর্মাৎ**—পরধর্ম অপেক্ষা; **স্বনুষ্ঠিতাৎ**—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত; **স্বভাবনিয়তম্**—স্বভাব-বিহিত; **কর্ম**—কর্ম; **কুর্বন্**—করে; **ন**—না; আপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়; **কিল্বিষম্**—পাপ।

গীতার গান

অসম্যক অনুষ্ঠিত নিজ ধর্ম শ্রেয় ।
সুষ্ঠু আচরণ করে পরধর্মে ভয় ॥
নিজ স্বভাব নিয়ত যেই কর্ম অনুষ্ঠান ।
নিষ্পাপ হইবে তাহে শাস্ত্রের বিধান ॥

অনুবাদ

উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক রূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্মই শ্রেয়। মানুষ স্বভাব-বিহিত কর্ম করে কোন পাপ প্রাপ্ত হয় না।

তাৎপর্য

মানুষের স্বধর্ম *ভগবদ্গীতায়* নির্দিষ্ট হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্তব্যকর্ম নির্ধারিত হয়েছে। অপরের ধর্মকর্ম অনুকরণ করা কারও পক্ষে উচিত নয়। যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে শূদ্রের কাজকর্ম করার প্রতি আকৃষ্ট, তার পক্ষে কৃত্রিমভাবে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করা উচিত নয়। তার জন্ম যদি ব্রাহ্মণ পরিবারেও হয়ে থাকে, তা হলেও নয়। এভাবেই স্বভাব অনুসারে তার কর্ম করা উচিত। কোন কাজই ঘৃণ্য নয়, যদি তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণের বৃত্তিমূলক কর্তব্য অবশ্যই সাত্ত্বিক। কিন্তু কেউ যদি স্বভাবগতভাবে সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন না হয়, তা হলে তার ব্রাহ্মণের বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয় বা শাসককে কত রকমের ভয়ানক কাজ করতে হয়। তাকে হিংসার আশ্রয় নিয়ে শত্রু হত্যা করতে হয় এবং কূটনীতির খাতিরে কখনও কখনও তাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়। এই ধরনের হিংসা ও ছলনা রাজনীতির মধ্যে থাকেই। কিন্তু তা বলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণের ধর্ম আচরণ করা উচিত নয়।

পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি সাধনের জন্য কর্ম করা উচিত। যেমন, অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়। তিনি তাঁর বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু সেই যুদ্ধ যদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে অধঃপতনের ভয় থাকে না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লাভ করবার জন্য ব্যবসায়ীকে কত মিথ্যা কথা বলতে হয়। সে যদি তা না করেন, তা হলে ব্যবসায়ে তার কোন লাভ হবে না। ব্যবসায়ী কখনও বলে, "ও বাবু! আপনার জন্য আমি

কোন লাভ করছি না," কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, লাভ না করে ব্যবসায়ী বাঁচতে পারে না। সুতরাং ব্যাপারী যখন বলে যে, সে লাভ করছে না, তখন সেটিকে এক নিছক মিথ্যা কথা বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু তা বলে ব্যাপারীর মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু সে এমন একটি বৃত্তিতে নিযুক্ত রয়েছে, যেখানে মিথ্যা কথা বলতে হয়, তাই সেই বৃত্তি সে ছেড়ে দেবে আর ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করবে। সেই রকম নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি। কেউ ক্ষত্রিয় হন, বৈশ্য হন বা শূদ্রই হন না কেন, যদি তিনি তাঁর বৃত্তি অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করেন, তা হলে কিছুই আসে যায় না। এমন কি ব্রাহ্মণদেরও নানা রকমের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে কখন কখন পশুহত্যা করতে হয়, কারণ যজ্ঞে পশু বলি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। তেমনই, ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্মে নিরত হয়ে শত্রুকে হত্যা করে, তাতে কোন পাপ হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে এই সমস্ত বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে ও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মানুষের কাজ করা উচিত। আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য যা কিছু করা হয়, তা হচ্ছে বন্ধনের কারণ। সিদ্ধান্ত-স্বরূপ এখানে বলা যায় যে, প্রত্যেকের উচিত তার স্বাভাবিক গুণ অনুসারে নিয়োজিত থাকা এবং সমস্ত কাজকর্মের পরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা।

শ্লোক ৪৮

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

সহজম্—সহজাত; **কর্ম**—কর্ম; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **সদোষম্**—দোষযুক্ত; **অপি**—হলেও; **ন**—নয়; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **সর্বারম্ভাঃ**—সমস্ত কর্ম; **হি**—যেহেতু; **দোষেণ**—দোষের দ্বারা; **ধূমেন**—ধূমের দ্বারা; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইব**—যেমন; **আবৃতাঃ**—আবৃত।

গীতার গান

সদোষ সহজ কর্ম কভু নহে আজ ।
তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হৃদি সদা ভজ ॥
জগতের সব কাজ দোষ বিনা নয় ।
অগ্নেতে যথা কদা ধূম দেখা যায় ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! সহজাত কর্ম দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। যেহেতু অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই সমস্ত কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত থাকে।

তাৎপর্য

মায়াবদ্ধ জীবনে সব কাজই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত। এমন কি কেউ যদি ব্রাহ্মণও হন, তা হলেও তাঁকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় যাতে পশু বলি দিতে হয়। তেমনই, ক্ষত্রিয় যতই পুণ্যবান হোন না কেন, তাঁকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি তা পরিহার করতে পারেন না। তেমনই, একজন বৈশ্য, তা তিনি যতই পুণ্যবান হোন না কেন, ব্যবসায়ে টিকে থাকতে হলে তাঁর লাভের অঙ্কটি তাঁকে কখনও লুকিয়ে রাখতে হয় অথবা কখনও তাঁকে কালোবাজারি করতে হয়। এগুলি অবশ্যম্ভাবী। এগুলিকে পরিহার করা যায় না। তেমনই, কোন শূদ্রকে যখন কোন অসৎ মনিবের দাসত্ব করতে হয়, তখন তাকে তার মনিবের আজ্ঞা পালন করতেই হয়, যদিও তা করা উচিত নয়। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, মানুষকে তার স্বধর্ম করে যেতে হয়, কেন না সেগুলি তার নিজেরই স্বভাবজাত।

এখানে একটি খুব সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আগুন যদিও পবিত্র, তবুও তাতে ধোঁয়া থাকে। কিন্তু সেই ধোঁয়া আগুনকে অপবিত্র করে না। আগুনে যদিও ধোঁয়া আছে, তবুও আগুনকে সবচেয়ে পবিত্র বস্তু বলে গণ্য করা হয়। কেউ যদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণের ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তা হলে তার পক্ষে কোনও নিশ্চয়তা নেই যে, ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে কোন অপ্রিয় কর্তব্য থাকবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, এই জড় জগতে কেউই জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আগুন ও ধোঁয়ার দৃষ্টান্তটি খুবই সঙ্গত। শীতের সময় কেউ যখন আগুন পোহায়, কখনও কখনও ধোঁয়া তার চোখ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলিকে বিব্রত করে, কিন্তু এই সব বিরক্তিকর অবস্থা সত্ত্বেও তাকে আগুনের সদ্ব্যবহার করতেই হয়। তেমনই, কয়েকটি বিরক্তিকর ব্যাপার আছে বলেই স্বভাবজাত বৃত্তি পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বরং, নিজের বৃত্তিমূলক কর্ম অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত। সেটিই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের আলোচ্য বিষয়। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যখন কোন

বিশেষ বৃত্তিমূলক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই বিশেষ কর্মের সমস্ত ত্রুটিগুলি পবিত্র হয়ে যায়। ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে কর্মফল যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন মানুষ অন্তরে আত্মাকে দর্শন করে এবং সেটিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি।

শ্লোক ৪৯

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

অসক্তবুদ্ধিঃ—আসক্তিশূন্য বুদ্ধি; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **জিতাত্মা**—সংযতচিত্ত; **বিগতস্পৃহঃ**—স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি; **নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্**—নৈষ্কর্মরূপ সিদ্ধি; **পরমাম্**—পরম; **সন্ন্যাসেন**—স্বরূপত কর্মত্যাগ দ্বারা; **অধিগচ্ছতি**—লাভ করেন।

গীতার গান

দোষাংশ ত্যাগেতে যথা গুণাংশ গ্রহণ।
নিজ সত্তা শুদ্ধ করি স্বধর্ম সাধন ॥
অনাসক্ত বুদ্ধি জিত আত্মা স্পৃহাহীন।
নৈষ্কর্ম সিদ্ধি সে হয় সন্ন্যাস প্রবীণ ॥

অনুবাদ

জড় বিষয়ে আসক্তিশূন্য বুদ্ধি, সংযতচিত্ত ও ভোগস্পৃহাশূন্য ব্যক্তি স্বরূপত কর্ম ত্যাগপূর্বক নৈষ্কর্মরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

তাৎপর্য

যথার্থ ত্যাগের অর্থ হচ্ছে নিজেকে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা। তাই মনে করা উচিত যে, কর্মফল ভোগ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আমরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ, তাই আমাদের সমস্ত কর্মের প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছেন ভগবান। সেটিই যথার্থ কৃষ্ণভাবনা। কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত মানুষই হচ্ছেন যথার্থ সন্ন্যাসী। এই মনোভাব অবলম্বন করার ফলে মানুষ যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারেন। কারণ, তিনি তখন যথার্থভাবে পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কাজ করেন। এভাবেই তিনি আর কোন রকম বিষয়ের

প্রতি আসক্ত হন না। তিনি তখন ভগবৎ সেবালব্ধ দিব্য আনন্দ ব্যতীত আর কোন রকম সুখভোগের প্রতি অনুরক্ত হন না। বলা হয় যে, সন্ন্যাসী তাঁর পূর্বকৃত সমস্ত কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত তথাকথিত সন্ন্যাস গ্রহণ না করেই, আপনা থেকেই এই মুক্ত স্তরে অধিষ্ঠিত হন। চিত্তবৃত্তির এই অবস্থাকে বলা হয় *যোগারূঢ়* বা যোগের সিদ্ধ অবস্থা। এই সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে, *যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ*—যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, তাঁর কর্মফল ভোগের আর কোন ভয় থাকে না।

শ্লোক ৫০

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধিম্—সিদ্ধি; **প্রাপ্তঃ**—লাভ করে; **যথা**—যেভাবে; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মকে; **তথা**—তা; **আপ্নোতি**—লাভ করেন; **নিবোধ**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার কাছে; **সমাসেন**—সংক্ষেপে; **এব**—অবশ্যই; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **নিষ্ঠা**—স্তর; **জ্ঞানস্য**—জ্ঞানের; **যা**—যা; **পরা**—অপ্রাকৃত।

গীতার গান

সিদ্ধিলাভ করি যথা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় ।
সংক্ষেপেতে কহি শুন তার পরিচয় ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম সিদ্ধি লাভ করে জীব যেভাবে জ্ঞানের পরা নিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তা আমার কাছে সংক্ষেপে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ভগবান অর্জুনের কাছে বর্ণনা করেছেন কিভাবে মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্য সমস্ত কাজ করার মাধ্যমে কেবল তার বৃত্তিমূলক কর্মে যুক্ত থেকে অনায়াসে পরম সিদ্ধির স্তর লাভ করতে পারে। শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তি সাধনের জন্য কর্মফল ত্যাগ করার মাধ্যমে অনায়াসে ব্রহ্ম-উপলব্ধির পরম স্তর লাভ করা যায়। সেটিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধির পন্থা। জ্ঞানের যথার্থ সিদ্ধি হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনা লাভ করা, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫১-৫৩

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা; বিশুদ্ধয়া—বিশুদ্ধ; যুক্তঃ—যুক্ত হয়ে; ধৃত্যা—ধৃতির দ্বারা; আত্মানম্—মনকে; নিয়ম্য—নিয়ন্ত্রিত করে; চ—ও; শব্দাদীন্—শব্দ আদি; বিষয়ান্—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে; রাগ—আসক্তি; দ্বেষৌ—দ্বেষ; ব্যুদস্য—বর্জন করে; চ—ও; বিবিক্তসেবী—নির্জন স্থানে বাস করে; লঘ্বাশী—অল্প আহার করে; যতবাক্—বাক্ সংযত করে; কায়—দেহ; মানসঃ—মন; ধ্যানযোগপরঃ—ধ্যানযোগে যুক্ত হয়ে; নিত্যম্—সর্বদা; বৈরাগ্যম্—বৈরাগ্য; সমুপাশ্রিতঃ—আশ্রয় গ্রহণ করে; অহঙ্কারম্—অহঙ্কার; বলম্—বল; দর্পম্—দর্প; কামম্—কাম; ক্রোধম্—ক্রোধ; পরিগ্রহম্—জড় বিষয় গ্রহণ; বিমুচ্য—মুক্ত হয়ে; নির্মমঃ—মমতাশূন্য; শান্তঃ—শান্ত; ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্ম-অনুভবে; কল্পতে—সমর্থ হন।

গীতার গান

বিশুদ্ধ সে বুদ্ধিযুক্ত ধৃতি নিয়মিত।
শব্দাদি বিষয় ত্যাগ রাগ দ্বেষজিত ॥
বিবিক্ত যে লঘুভোজী যত বাক্ মন।
ধ্যানযোগ পরা নিত্য বৈরাগ্য সাধন ॥
অহঙ্কার বল দর্প কাম পরিগ্রহ।
ক্রোধ আর যত আছে অসৎ আগ্রহ ॥
নির্মম যে শান্ত যেই ব্রহ্ম অনুভবে।
নিশ্চিত সমর্থ হয় তাহাতে সম্ভবে ॥

অনুবাদ

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনকে ধৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, শব্দ আদি ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, রাগ ও দ্বেষ বর্জন করে, নির্জন স্থানে বাস করে, অল্প আহার করে, দেহ, মন ও বাক্ সংযত করে, সর্বদা ধ্যানযোগে যুক্ত হয়ে বৈরাগ্য আশ্রয় করে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, মমত্ব বোধশূন্য শান্ত পুরুষ ব্রহ্ম-অনুভবে সমর্থ হন।

তাৎপর্য

বুদ্ধির সাহায্যে নির্মল হলে মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন। এভাবেই মানুষ চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সদা সর্বদাই সমাধিস্থ থাকেন। তখন আর তিনি ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়ের প্রতি আসক্ত হন না এবং তখন তিনি তাঁর কাজকর্মে রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত হন। এই ধরনের নিরাসক্ত মানুষ স্বভাবতই নিরিবিলি জায়গায় থাকতে ভালবাসেন। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করেন না এবং তিনি তাঁর দেহ ও মনের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন। তখন আর তাঁর মিথ্যা অহঙ্কার থাকে না, কারণ তিনি তখন তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেন না। নানা রকম জড় পদার্থ আহরণ করে তাঁর দেহটিকে স্থূল ও শক্তিশালী করে তোলার কোন বাসনাও তখন আর থাকে না। যেহেতু তখন আর তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না, তাই মিথ্যা দর্পও থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় মানুষ তখন যা পায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অভাব হলে ক্রুদ্ধ হন না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় আহরণ করার কোনও রকম প্রচেষ্টা তিনি তখন করেন না। এভাবেই মানুষ যখন সর্বতোভাবে অহঙ্কারমুক্ত হন, তখন তিনি সমস্ত জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হন এবং সেটিই হচ্ছে ব্রহ্ম-অনুভবের স্তর। সেই স্তরকে বলা হয় *ব্রহ্মভূত* স্তর। মানুষ যখন জড় জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি শান্ত হন এবং কোন কিছুতেই আর ক্ষুব্ধ হন না। *ভগবদ্গীতায়* (২/৭০) সেই কথা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

"বিষয়কামী ব্যক্তি কখনও শান্তি লাভ করে না। জলরাশি যেমন সদা পরিপূর্ণ এবং স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করেও তাকে ক্ষোভিত করতে পারে না, কামসমূহও

তেমন কোন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হয়েও তাকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন।"

শ্লোক ৫৪

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত; **প্রসন্নাত্মা**—প্রসন্নচিত্ত; **ন**—না; **শোচতি**—শোক করেন; **ন**—না; **কাঙ্ক্ষতি**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **সমঃ**—সমদর্শী; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—প্রাণীর প্রতি; **মদ্ভক্তিম্**—আমার ভক্তি; **লভতে**—লাভ করেন; **পরাম্**—পরা।

গীতার গান

ব্রহ্ম অনুভব হলে প্রসন্নাত্মা হয় ।
শোক আর আকাঙ্ক্ষা সে নির্মল নিশ্চয় ॥
সর্বভূত সমবুদ্ধি তার পরিচয় ।
নির্গুণ আমার ভক্তি তবে লাভ হয় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরা ভক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীর কাছে *ব্রহ্মভূত* অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াটা হচ্ছে শেষ কথা। কিন্তু সবিশেষবাদী বা শুদ্ধ ভক্তদের শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত হবার জন্য আরও অগ্রসর হতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্তিযোগে যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মভূত হয়ে *ব্রহ্মভূত* স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মভূত না হলে তাঁর সেবা করা যায় না। ব্রহ্ম-অনুভূতিতে সেব্য ও সেবকের মধ্যে কোন ভেদ নেই, তবুও উচ্চতর চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মধ্যে ভেদ রয়েছে।

জড় জীবনের ধারণা নিয়ে কেউ যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কর্ম করেন, তাতে দুর্ভোগ থাকে। কিন্তু চিৎ-জগতে যখন কেউ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা

করেন, সেই সেবায় কোন দুর্ভোগ নেই। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত কোন কিছুর জন্য অনুশোচনা অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না। যেহেতু ভগবান পূর্ণ, তাই জীব যখন ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তিনিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। তিনি তখন সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত নির্মল নদীর মতো। কৃষ্ণভক্ত যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন কিছুরই চিন্তা করেন না, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবে সর্বদাই উৎফুল্ল। ভগবানের সেবায় সম্যক্‌ভাবে নিযুক্ত থাকার ফলে তিনি জাগতিক লাভ অথবা ক্ষতির জন্য কখনই অনুশোচনা করেন না। জড় সুখভোগের প্রতি তাঁর আর কোন আসক্তি থাকে না। কারণ তিনি জানেন যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ এবং তাই তারা তাঁর নিত্য দাস। তিনি জড় জগতে কাউকেই উচ্চ অথবা নীচ বলে গণ্য করেন না। উচ্চ-নীচবোধ ক্ষণস্থায়ী এবং এই ক্ষণস্থায়ী অনিত্য জগতের সঙ্গে ভক্তের কোন সম্পর্ক থাকে না। তাঁর কাছে পাথর আর সোনার একই দাম। এটিই হচ্ছে *ব্রহ্মভূত* স্তর এবং শুদ্ধ ভক্ত অনায়াসে এই স্তরে উন্নীত হতে পারেন। ভগবদ্ভক্তির এই পরম পবিত্র স্তরে পৌঁছলে, পরব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া বা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাশ করার ধারণা অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে হয় এবং স্বর্গ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে আকাশকুসুম বলে মনে হয়। তখন ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতোই প্রতিভাত হয়। বিষদাঁত ভাঙা সাপের কাছ থেকে যেমন কোন রকম ভয় থাকে না, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলি থেকে আর কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না, যখন তারা আপনা থেকেই সংযত হয়। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যারা ভবরোগে ভুগছে, তাদের পক্ষে এই জগৎ দুঃখময়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কাছে সমগ্র জগৎটি বৈকুণ্ঠ বা চিৎ-জগতের মতো। এই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষও ভক্তের কাছে একটি পিপীলিকার থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি এই যুগে শুদ্ধ ভক্তি প্রচার করেছেন, তাঁর কৃপায় ভগবদ্ভক্তির এই পরম নির্মল স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫৫

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

ভক্ত্যা—শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **অভিজানাতি**—জানতে পারেন; **যাবান্**—যে রকম; **যঃ চ অস্মি**—স্বরূপত আমি হই; **তত্ত্বতঃ**—যথার্থরূপে; **ততঃ**—তারপর; **মাম্**—আমাকে; **তত্ত্বতঃ**—যথার্থরূপে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **বিশতে**—প্রবেশ করতে পারেন; **তদনন্তরম্**—তার পরে।

গীতার গান

নির্গুণ ভক্তিতে জানে আমার স্বরূপ ।
সবিশেষ নির্বিশেষ তত্ত্বত যে রূপ ॥
সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবেশে আমাতে ।
আমি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ যাতে ॥

অনুবাদ

ভক্তির দ্বারা কেবল স্বরূপত আমি যে রকম হই, সেরূপে আমাকে কেউ তত্ত্বত জানতে পারেন। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বত জেনে, তার পরে তিনি আমার ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

তাৎপর্য

অভক্তেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনই জানতে পারে না। মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারাও তাঁকে জানতে পারা যায় না। কেউ যদি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে চায়, তা হলে তাকে শুদ্ধ ভক্তের তত্ত্বাবধানে শুদ্ধ ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান তার কাছে সর্বদাই আচ্ছাদিত থেকে যাবে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) আগেই বলা হয়েছে, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য*—তিনি সকলের কাছে প্রকাশিত হন না। কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ ভগবানকে জানতে পারে না। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগে যিনি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তিনিই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পারেন। এই জ্ঞান লাভে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোন সাহায্য করতে পারে না।

কৃষ্ণতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি পূর্ণরূপে অবগত হয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের আলয় চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করার যোগ্য হন। *ব্রহ্মভূত* অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ স্বাতন্ত্র্যহীন হওয়া নয়। সেই স্তরেও ভগবৎ-সেবা রয়েছে এবং যেখানে ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবা রয়েছে, সেখানে অবশ্যই ভগবান, ভক্ত ও ভক্তিযোগের পন্থা রয়েছে। এই প্রকার জ্ঞানের কখনও বিনাশ হয় না, এমন কি মুক্তির পরেও বিনাশ হয় না। মুক্তির অর্থ হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি। চিন্ময় জীবনেও সেই একই স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, একই ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, তবে সেই স্বাতন্ত্র্য, সেই ব্যক্তিত্ব হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময়। এখানে *বিশতে* —'আমাতে প্রবেশ

করেন', কথাটির ভ্রান্ত অর্থ করা উচিত নয়, যা অদ্বৈতবাদীরা করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে জীব নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে এক হয়ে যায়। না। *বিশতে* কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, জীব তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রবেশ করে এবং ভগবানের সঙ্গ লাভ করে তাঁর সেবা করতে পারে। যেমন, একটি সবুজ পাখি একটি সবুজ গাছে প্রবেশ করে সেই গাছটির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য নয়, সেই গাছটির ফল উপভোগ করবার জন্য। নির্বিশেষবাদীরা সাধারণত সমুদ্রে নদীর মিশে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। সেটি নির্বিশেষবাদীদের আনন্দের উৎস হতে পারে, কিন্তু সবিশেষবাদীরা সমুদ্রস্থিত জলচর প্রাণীর মতো তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। সমুদ্রের গভীরে গেলে দেখা যায় সেখানে কত অসংখ্য প্রাণী রয়েছে। কেবল সমুদ্রের উপরটি দেখে সমুদ্র সম্বন্ধে জানা যায় না। সমুদ্রের গভীরে যে সমস্ত প্রাণী রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে।

শুদ্ধ ভগবৎ-সেবার প্রভাবে ভক্ত তত্ত্বগতভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। একাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কেবলমাত্র ভগবৎ সেবার মাধ্যমেই ভগবানকে জানা যায়। এখানেও সেই কথা সত্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা যায় এবং তাঁর ধামে প্রবেশ করা যায়।

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে *ব্রহ্মভূত* স্তরে অধিষ্ঠিত হলে ভগবানের কথা শোনার মাধ্যমে ভক্তিযোগ শুরু হয়। কেউ যখন ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তখন আপনা থেকেই *ব্রহ্মভূত* অবস্থার বিকাশ হয় এবং জড় কলুষ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কাম ও লোভ বিদূরিত হয়। ভক্তের হৃদয় থেকে কাম ও বাসনা যতই বিদূরিত হয়, ততই তিনি ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবার প্রতি আসক্ত হন এবং সেই আসক্তির ফলে তিনি তখন জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হন। জীবনের সেই অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* সেই কথা বলা হয়েছে। মুক্তির পরেও ভক্তির অনুশীলন বা দিব্য ভগবৎ সেবা বর্তমান থাকে। সেই সম্বন্ধে *বেদান্তসূত্রে* (৪/১/১২) বলা হয়েছে—*আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্*। অর্থাৎ মুক্তির পরেও ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবা বর্তমান থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভক্তিযুক্ত যথার্থ মুক্তির বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, জীবের যথার্থ স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার নামই হচ্ছে মুক্তি। জীবের স্বরূপের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে—প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অণুসদৃশ

অংশ। তাই জীবের স্বরূপ হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। মুক্তির পরে এই সেবা কখনও বন্ধ হয়ে যায় না। যথার্থ মুক্তি হচ্ছে জীবনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৫৬

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

সর্ব—সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্ম; **অপি**—ও; **সদা**—সর্বদা; **কুর্বাণঃ**—অনুষ্ঠান করে; **মৎ**—আমার; **ব্যপাশ্রয়ঃ**—আশ্রয়ে; **মৎ**—আমার; **প্রসাদাৎ**—প্রসাদে; **অবাপ্নোতি**—লাভ করেন; **শাশ্বতম্**—নিত্য; **পদম্**—ধাম; **অব্যয়ম্**—অব্যয়।

গীতার গান

ভক্তিতে প্রাপ্তি সে হয় ভগবদ্ স্বরূপ ।
প্রেমাপুমার্থ মহান নাম যার রূপ ॥
সেই প্রেমাশ্রয়ে যেই সর্ব কর্ম করে ।
আমার প্রসাদে পরব্যোম লাভ করে ॥

অনুবাদ

আমার শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা সমস্ত কর্ম করেও আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয় ধাম লাভ করেন।

তাৎপর্য

মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ কথাটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে। জড় কলুষমুক্ত হবার জন্য শুদ্ধ ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান বা তাঁর প্রতিনিধি গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন। শুদ্ধ ভক্তের ভগবৎ সেবার কোন সময়-সীমা নেই। তিনি সর্বদাই চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণরূপে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় যুক্ত। যে ভক্ত এভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয়। সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পরিণামে তিনি ভগবৎ-ধামে বা কৃষ্ণলোকে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সেই পরম ধামে কোন পরিবর্তন নেই। সেখানে সব কিছুই নিত্য, অবিনশ্বর ও পূর্ণ জ্ঞানময়।

শ্লোক ৫৭

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

চেতসা—বুদ্ধির দ্বারা; **সর্বকর্মাণি**—সমস্ত কর্ম; **ময়ি**—আমাতে; **সংন্যস্য**—অর্পণ করে; **মৎপরঃ**—মৎপরায়ণ হয়ে; **বুদ্ধিযোগম্**—ভগবদ্ভক্তি; **উপাশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক; **মচ্চিত্তঃ**—মদ্‌গতচিত্ত; **সততম্**—সর্বদাই; **ভব**—হও।

গীতার গান

সেই প্রেমাশ্রয়ে হও মচ্চিত্ত সতত ।
আমার লাগিয়া সর্ব কার্যে হও রত ॥
সেই বুদ্ধিযোগ নাম আমার আশ্রয় ।
যাহার প্রভাবে কার্য সর্বসিদ্ধি হয় ॥

অনুবাদ

তুমি বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে, বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক সর্বদাই মদ্‌গতচিত্ত হও।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কেউ যখন কর্ম করেন, তখন তিনি নিজেকে সমস্ত জগতের প্রভু বলে মনে করে কাজ করেন না। তিনি কাজ করেন সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা পরিচালিত, তাঁর একান্ত অনুগত দাসরূপে। দাসের কোনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকে না। তিনি কাজ করেন কেবল তাঁর প্রভুর আদেশ অনুসারে। পরম প্রভুর দাসরূপে যিনি কর্ম করছেন, তাঁর লাভ অথবা ক্ষতির প্রতি কোন রকম আসক্তি থাকে না। তিনি কেবল তাঁর প্রভুর আদেশ অনুসারে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো তাঁর কর্তব্য করে চলেন। এখন, কেউ তর্ক করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে অর্জুন কর্ম করছিলেন, কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণ এখানে নেই, তখন কিভাবে কর্ম করা উচিত? কেউ যদি এই গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে, তা হলে তার ফল একই। এই শ্লোকে *মৎপরঃ* সংস্কৃত শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই এবং এভাবেই কর্ম করার সময় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা

উচিত—"এই বিশেষ কাজটি করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিযুক্ত করেছেন।" এভাবেই কাজ করলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হবে। এটিই হচ্ছে যথার্থ কৃষ্ণভাবনা। এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, খামখেয়ালীর বশে যা ইচ্ছা তাই করে ফলটি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত নয়। সেই ধরনের কাজকর্ম কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযুক্ত ভগবৎ সেবা নয়। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা উচিত। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের সেই নির্দেশ গুরু-পারম্পর্যে সদ্‌গুরুর মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই গুরুর আদেশ পালন করাটাই জীবনের মুখ্য কর্তব্য বলে গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে চলেন, তা হলে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তজীবনে তাঁর সিদ্ধি অনিবার্য।

শ্লোক ৫৮

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

মচ্চিত্তঃ—মদ্‌গতচিত্ত হয়ে; **সর্ব**—সমস্ত; **দুর্গাণি**—প্রতিবন্ধক; **মৎ**—আমার; **প্রসাদাৎ**—প্রসাদে; **তরিষ্যসি**—উত্তীর্ণ হবে; **অথ**—কিন্তু; **চেৎ**—যদি; **ত্বম্**—তুমি; **অহঙ্কারাৎ**—অহঙ্কার-বশত; **ন**—না; **শ্রোষ্যসি**—শোন; **বিনঙ্ক্ষ্যসি**—বিনষ্ট হবে।

গীতার গান

মচ্চিত্ত যেই সে তরে আমার প্রসাদে ।
সর্বদুঃখ সংসারে দুঃখ বা বিবাদে ॥
আমার সে উপদেশ যেবা নাহি মানে ।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বিনাশে আপনে ॥

অনুবাদ

এভাবেই মদ্‌গতচিত্ত হলে তুমি আমার প্রসাদে সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু তুমি যদি অহঙ্কার-বশত আমার কথা না শোন, তা হলে বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্ত তাঁর জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত কর্তব্যকর্ম, তা সম্পন্ন

করবার জন্য অনর্থক উদ্বিগ্ন হন না। সব রকমের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকে এই মহা মুক্তির কথা মূর্খ লোকেরা বুঝতে পারে না। কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে যিনি কর্ম করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। তাঁর যে বন্ধু তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ তাঁর সেবা করে চলেছেন, তাঁর সমস্ত সুখ-সুবিধার দিকে তিনি তখন দৃষ্টি রাখেন এবং নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেন। তাই, কারও পক্ষেই দেহাত্ম বুদ্ধিজাত অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিপথগামী হওয়া উচিত নয়। কখনই নিজেকে জড়া প্রকৃতির নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্ত বলে মনে করা উচিত নয়, অথবা আমাদের নিজেদের ইচ্ছামতো কাজকর্ম করবার স্বাধীনতা আমাদের আছে বলে মনে করা উচিত নয়। প্রত্যেকেই জড় জগতের কঠোর আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু যখনই তিনি কৃষ্ণভাবনাময় কাজকর্ম করতে শুরু করেন, তখনই তিনি জড় জগতের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হন। খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত, কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবানের সেবা যে করছে না, সে এই জড় জগতের ঘূর্ণিপাকে, জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছে। কোন বদ্ধ জীবই জানে না কি করা তাঁর উচিত এবং কি করা তাঁর উচিত নয়। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণভক্ত, তিনি কোন কিছুর পরোয়া না করে তাঁর কাজকর্ম করে চলেন। কারণ তাঁর অন্তর থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রতিটি কাজকর্মে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁর গুরুদেব তা অনুমোদন করেন।

শ্লোক ৫৯

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

যৎ—যদি; **অহঙ্কারম্**—অহঙ্কারকে; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় করে; **ন যোৎস্যে**—যুদ্ধ করব না; **ইতি**—এরূপ, **মন্যসে**—মনে কর; **মিথ্যা এষঃ**—মিথ্যা হবে; **ব্যবসায়ঃ**—সংকল্প; **তে**—তোমার; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **নিযোক্ষ্যতি**—নিযুক্ত করবে।

গীতার গান

অহঙ্কার করি বল যুদ্ধ না করিবে।
মিথ্যা সে প্রতিজ্ঞা তুমি করিবে স্বভাবে ॥

অনুবাদ

যদি অহঙ্কারকে আশ্রয় করে 'যুদ্ধ করব না' এরূপ মনে কর, তা হলে তোমার সংকল্প মিথ্যাহি হবে। কারণ, তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে।

তাৎপর্য

অর্জুন ছিলেন যুদ্ধবিশারদ এবং ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই যুদ্ধ করাটাই ছিল তাঁর কর্তব্য। কিন্তু মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর গুরু, পিতামহ ও বন্ধুদের হত্যা করলে তাঁর পাপ হবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেকে তাঁর সমস্ত কর্মের কর্তা বলে মনে করেছিলেন, যেন এই সমস্ত কর্মের শুভ ও অশুভ ফলগুলি তিনিই পরিচালনা করেছিলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান যে সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন, সেটি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সেটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের বিস্মৃতি। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ—সেই অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান নির্দেশ দেন এবং মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার জীবনকে সার্থক করে তোলার জন্য ভক্তিযোগে ভগবানের সেই নির্দেশগুলি পালন করা। ভগবান যেভাবে মানুষের ভবিতব্য নিরূপণ করতে পারেন, সেই রকম আর কেউই পারে না। তাই, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ বা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। কোন রকম ইতস্তত না করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আদেশ পালন করা উচিত। তা হলে সর্ব অবস্থাতেই নিরাপদে থাকা যায়।

শ্লোক ৬০

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা ।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

স্বভাবজেন—স্বভাবজাত; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **নিবদ্ধঃ**—বশবর্তী হয়ে; **স্বেন**—তোমার নিজের; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **কর্তুম্**—করতে; **ন**—না; **ইচ্ছসি**—ইচ্ছা করছ; **যৎ**—যা; **মোহাৎ**—মোহবশত; **করিষ্যসি**—করবে; **অবশঃ**—অবশভাবে; **অপি**—যদিও; **তৎ**—তা।

গীতার গান

স্বভাবজ কর্ম তব অবশ্য সাধিবে ।
কৌন্তেয় নির্বন্ধ সব নিজ কর্মভাবে ॥

অতএব মোহবশে ইচ্ছা নাহি কর ।
অবশে করিবে সেই তুমি অতঃপর ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! মোহবশত তুমি এখন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছ না, কিন্তু তোমার নিজের স্বভাবজাত কর্মের দ্বারা বশবর্তী হয়ে অবশভাবে তুমি তা করতে প্রবৃত্ত হবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কেউ যদি কর্ম করতে রাজি না হয়, তা হলে সে প্রকৃতির যে গুণে অবস্থিত, সেই গুণ অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য হয়। প্রত্যেকেই প্রকৃতির গুণের বিশেষ সংমিশ্রণের দ্বারা প্রভাবিত এবং সেভাবেই কাজ করছে। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে নিজেকে নিযুক্ত করে, সে মহিমান্বিত হয়।

শ্লোক ৬১

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **হৃদ্দেশে**—হৃদয়ে; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **তিষ্ঠতি**—অবস্থান করছেন; **ভ্রাময়ন্**—ভ্রমণ করান; **সর্বভূতানি**—সমস্ত জীবকে; **যন্ত্র**—যন্ত্রে; **আরূঢ়ানি**—আরোহণ করিয়ে; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা।

গীতার গান

ঈশ্বর আছে সে সর্বভূতের হৃদয়ে ।
কর্ম কর্মফল সব নিয়ন্ত্রণ করয়ে ॥
মায়ার যন্ত্রেতে তিনি সবারে ঘুরায় ।
ভুক্তি বাঞ্ছা করে জীব যেই যথা চায় ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন এবং সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।

তাৎপর্য

অর্জুন পরম জ্ঞাতা ছিলেন না এবং যুদ্ধ করা বা না করা সম্বন্ধে তাঁর বিবেচনা তাঁর সীমিত বিচার শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, জীবাত্মাই সর্বেসর্বা নয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান বা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে তাদের পরিচালনা করেন। দেহত্যাগ করার পর জীব তার অতীতের কথা ভুলে যায়। কিন্তু পরমাত্মা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞাতারূপে তার সমস্ত কর্মের সাক্ষী থাকেন। তাই, জীবের সমস্ত কর্মগুলি পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবের যা প্রাপ্য তা সে প্রাপ্ত হয় এবং পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতিজাত এক-একটি দেহে আরূঢ় হয়ে এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে থাকে। জীব যখনই একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়, তখনই তাকে সেই শরীরের ধর্ম অনুসারে কর্ম করতে হয়। যেমন, কোন মানুষ যখন একটি দ্রুতগামী গাড়িতে বসে থাকেন, তখন তিনি মন্থরগামী গাড়ির আরোহী থেকে দ্রুতগতিতে গমন করেন, যদিও জীব বা গাড়ির চালক একই মানুষ হতে পারেন। তেমনই, পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি কোন নির্দিষ্ট জীবের জন্য কোন বিশেষ রকমের দেহ তৈরি করেন যাতে সে তার অতীতের বাসনা অনুসারে কর্ম করতে পারে। জীব স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়। নিজেকে কখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবান থেকে স্বাধীন বলে মনে করা উচিত নয়। জীব সর্বদাই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই তার কর্তব্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা এবং সেটিই হচ্ছে পরবর্তী শ্লোকের নির্দেশ।

শ্লোক ৬২

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥

তম্—তাঁর; **এব**—অবশ্যই; **শরণম্**—শরণ; **গচ্ছ**—গ্রহণ কর; **সর্বভাবেন**—সর্বতোভাবে; **ভারত**—হে ভারত; **তৎপ্রসাদাৎ**—তাঁর প্রসাদে; **পরাম্**—পরা; **শান্তিম্**—শান্তি; **স্থানম্**—ধাম; **প্রাপ্স্যসি**—প্রাপ্ত হবে; **শাশ্বতম্**—নিত্য।

গীতার গান

তাঁহার চরণে লও সর্বতো শরণ ।
প্রসাদে হইবে সর্ব বাঞ্ছিত পূরণ ॥

পরা শান্তি পাবে আর শাশ্বত যে স্থান ।
সর্বলাভ সে প্রসাদে দুঃখ নিবারণ ॥

অনুবাদ

হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং নিত্য ধাম প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

তাই প্রতিটি জীবের কর্তব্য, সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাঁর শরণাগত হওয়া এবং তার ফলে জীব জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই আত্ম-সমর্পণের ফলে জীব যে কেবল এই জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়, তাই নয়, পরিণামে সে পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করে। চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে বর্ণনা করে বৈদিক শাস্ত্রে (*ঋক্ বেদ* ১/২২/২০) বলা হয়েছে—*তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*। যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিই ভগবানের রাজ্য, তাই জাগতিক সব কিছুই প্রকৃতপক্ষে চিন্ময়, কিন্তু *পরমং পদম্* বলতে বিশেষ করে ভগবানের নিত্য ধামকে বোঝানো হচ্ছে, যাকে বলা হয় চিৎ-জগৎ বা বৈকুণ্ঠলোক।

ভগবদ্গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*—ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তাই, হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজমান পরমাত্মার কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করা। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন ইতিমধ্যেই পরমেশ্বর বলে মেনে নিয়েছেন। দশম অধ্যায়ে তাঁকে *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম* রূপে স্বীকার করা হয়েছে। অর্জুন কেবল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং সমস্ত জীবের পরম ধাম বলে গ্রহণ করেছেন, তাই নয়, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি সমস্ত মহাত্মারাও যে শ্রীকৃষ্ণকে সেই স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন, তিনি সেই কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৬৩

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

ইতি—এভাবেই; **তে**—তোমাকে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **আখ্যাতম্**—বর্ণিত হল; **গুহ্যাৎ**—গুহ্য থেকে; **গুহ্যতরম্**—গুহ্যতর; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **এতৎ**—এটি; **অশেষেণ**—সম্পূর্ণরূপে; **যথা**—যা; **ইচ্ছসি**—ইচ্ছা কর; **তথা**—তা; **কুরু**—কর।

গীতার গান

গুহ্য গুহ্যতর জ্ঞান কহিলাম আমি ।
ভালমন্দ বিচার যে সে করিবে তুমি ॥
বিচার করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা কর ।
উপদেশ আমার সে নিত্য তুমি স্মর ॥

অনুবাদ

এভাবেই আমি তোমাকে গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞান বর্ণনা করলাম। তুমি তা সম্পূর্ণরূপে বিচার করে যা ইচ্ছা হয় তাই কর।

তাৎপর্য

ভগবান ইতিমধ্যেই অর্জুনের কাছে *ব্রহ্মভূত* সম্বন্ধে জ্ঞানের বিশ্লেষণ করেছেন। যিনি *ব্রহ্মভূত* অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি প্রসন্ন; তিনি কখনও অনুশোচনা করেন না, বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। গুহ্য তত্ত্ব লাভ করার ফলে তা সম্ভব হয়। পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানের রহস্যও শ্রীকৃষ্ণ উন্মোচিত করেছেন। এটিও ব্রহ্মজ্ঞান, কিন্তু এটি উচ্চতর।

এখানে *যথেচ্ছসি তথা কুরু* কথাটির অর্থ হচ্ছে—"যা ইচ্ছা হয় তাই কর"—ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভগবান জীবের ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করেন না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে জীবনের মান উন্নত করা যায়। অর্জুনকে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপদেশ হচ্ছে, হৃদি-অন্তঃস্থ পরমাত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করা। যথার্থ বিবেচনার মাধ্যমে পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হতে সম্মত হওয়া উচিত। তা মানব-জীবনের পরম সিদ্ধির স্তর কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। যুদ্ধ করবার জন্য অর্জুন সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করাটা সমস্ত জীবের পরম স্বার্থ। এটি পরমেশ্বর ভগবানের স্বার্থ নয়। আত্মসমর্পণের পূর্বে বুদ্ধি দিয়ে এই সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিচার করার স্বাধীনতা

সকলেরই রয়েছে; পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ গ্রহণ করার সেটিই হচ্ছে উত্তম পন্থা। এই নির্দেশ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্গুরুর কাছ থেকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৬৪

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

সর্বগুহ্যতমম্—সবচেয়ে গোপনীয়; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার থেকে; **পরমম্**—পরম; **বচঃ**—উপদেশ; **ইষ্টঃ**—প্রিয়; **অসি**—হও; **মে**—আমার; **দৃঢ়ম্**—অতিশয়; **ইতি**—এভাবে; **ততঃ**—সেই হেতু; **বক্ষ্যামি**—বলছি; **তে**—তোমার; **হিতম্**—হিতের জন্য।

গীতার গান

তদপেক্ষা গুহ্যতম আর তুমি শুন।
অত্যন্ত সে প্রিয় তুমি তাই সে বচন ॥

অনুবাদ

তুমি আমার কাছ থেকে সবচেয়ে গোপনীয় পরম উপদেশ শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, সেই হেতু তোমার হিতের জন্যই আমি বলছি।

তাৎপর্য

ভগবান অর্জুনকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা হচ্ছে গুহ্য (ব্রহ্মজ্ঞান) এবং গুহ্যতর (সকলের হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজমান পরমাত্মার জ্ঞান) আর এখন তিনি দান করছেন গুহ্যতম জ্ঞান—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ কর। নবম অধ্যায়ের শেষে তিনি বলেছেন, *মন্মনাঃ*—'সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর।' *ভগবদ্গীতার* মূল শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে এখানে সেই নির্দেশেরই পুনরুক্তি করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* সারাংশরূপ এই যে পরম শিক্ষা, তা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারে না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের এটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যা বলছেন, তা হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের সারাতিসার এবং তা কেবল অর্জুনের কাছেই গ্রহণীয় নয়, সমস্ত জীবের পক্ষেই তা গ্রহণীয়।

শ্লোক ৬৫

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

মন্মনাঃ—মদ্‌গতচিত্ত; **ভব**—হও; **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **মদ্‌যাজী**—আমার পূজক; **মাম্**—আমাকে; **নমস্কুরু**—নমস্কার কর; **মাম্**—আমাকে; **এব**—অবশ্যই; **এষ্যসি**—প্রাপ্ত হবে; **সত্যম্**—সত্যই; **তে**—তোমার কাছে; **প্রতিজানে**—প্রতিজ্ঞা করছি; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **অসি**—তুমি হও; **মে**—আমার।

গীতার গান

মন্মনা মদ্ভক্ত হও মোরে নমস্কার ।
আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার ॥

অনুবাদ

তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তা হলে তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এই জন্য আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

তত্ত্বজ্ঞানের গুহ্যতম অংশ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া এবং সর্বদাই তাঁর চিন্তা করে তাঁর জন্য কর্ম সাধন করা। পেশাধারী ধ্যানী হওয়া উচিত নয়। জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা যায়। সর্বক্ষণ এমনভাবে কাজকর্ম করা উচিত, যাতে সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপগুলি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনুষ্ঠান করা যায়। জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত যাতে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তারই উদয় না হয়। ভগবান এখানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, যিনি এভাবেই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনা লাভ করেছেন, তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যাবেন, যেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখোমুখি হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভ করতে পারবেন। তত্ত্বজ্ঞানের এই গূঢ়তম অংশটি অর্জুনকে বলা হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় বন্ধু। অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পরম বন্ধুতে পরিণত হতে পারেন এবং অর্জুনের মতো সার্থকতা অর্জন করতে পারেন।

এই কথাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপে মনকে একাগ্র করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যে রূপে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর গোপবালক, যাঁর মুখমণ্ডল

অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত এবং মাথায় যাঁর ময়ূরের পালক। *ব্রহ্মসংহিতা* ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভগবানের আদিরূপ শ্রীকৃষ্ণে মনকে নিবদ্ধ করা উচিত। ভগবানের অন্যান্য রূপেও অভিনিবেশ করা উচিত নয়। বিষ্ণু, নারায়ণ, রাম, বরাহ আদি ভগবানের অনন্ত রূপ রয়েছে। কিন্তু অর্জুনের সম্মুখে যে রূপ নিয়ে ভগবান প্রকট হয়েছিলেন, ভক্তের উচিত সেই রূপেই মনকে একাগ্র করা। শ্রীকৃষ্ণের রূপে মনকে একাগ্র করাই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানের গুহ্যতম অংশ এবং অর্জুনের কাছে ভগবান তা ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ অর্জুন হচ্ছেন ভগবানের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

শ্লোক ৬৬

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

সর্বধর্মান্—সর্ব প্রকার ধর্ম; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **মাম্**—আমাকে; **একম্**—কেবল; **শরণম্**—শরণাগত; **ব্রজ**—হও; **অহম্**—আমি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **সর্ব**—সমস্ত; **পাপেভ্যঃ**—পাপ থেকে; **মোক্ষয়িষ্যামি**—মুক্ত করব; **মা**—করো না; **শুচঃ**—শোক।

গীতার গান

সর্ব ধর্ম ত্যাগি লও আমার শরণ ।
রক্ষিব তোমাকে আমি সদা সর্বক্ষণ ॥
কোন চিন্তা না করিবে পাপ নাহি হবে ।
আমার শরণে তুমি পরা শান্তি পাবে ॥

অনুবাদ

সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।

তাৎপর্য

ভগবান নানা রকম জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, নানা রকম ধর্মের বর্ণনা করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, পরমাত্মা জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, সমাজ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের বর্ণনা করেছেন, সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান, বৈরাগ্যের জ্ঞান,

মন ও ইন্দ্রিয়-দমন, ধ্যান আদি সব কিছুরই বর্ণনা করেছেন। তিনি বিবিধ উপায়ে নানা রকম ধর্মের বর্ণনা করেছেন। এখন, *ভগবদ্গীতার* সারাংশ বিশ্লেষণ করে ভগবান বলেছেন যে, অর্জুনের উচিত যে সমস্ত ধর্মের কথা তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা সবই পরিত্যাগ করা; তাঁর উচিত কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। সেই শরণাগতি তাঁকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবে, কেন না ভগবান নিজেই তাঁকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, তিনিই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন। এভাবেই কেউ মনে করতে পারে যে, যদি না সে সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে, সে ভগবানের শরণাগতির পন্থা গ্রহণ করতে পারে না। সেই সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত না হয়েও থাকে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে তিনি আপনা হতেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য অন্য কোন কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবের পরম পরিত্রাতা বলে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করা। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের উচিত তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়া।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১/৬৭৬) গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্ ।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

ভক্তিযোগের পন্থায় কেবল এই সমস্ত ধর্মের আচরণ করা উচিত, যা পরিণামে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি প্রদান করবে। কেউ বর্ণ অনুসারে তাঁর স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করার ফলে তিনি যদি কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি লাভ না করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত কর্মই অর্থহীন। যা কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করে না, তা পরিত্যাজ্য। মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। দেহ ও আত্মা একত্রে কিভাবে রক্ষা হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীকৃষ্ণ সেটি দেখবেন। নিজেকে সর্বদা অসহায় বলে মনে করে শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র জীবনের প্রগতির ভিত্তি বলে বিবেচনা করা উচিত। যে মাত্র কেউ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিজেকে ঐকান্তিকভাবে নিযুক্ত করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন। জ্ঞানের অনুশীলন ও যোগসাধনায় ধ্যান

আদি অনুশীলনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় পদ্ধতি ও শোধনকারী পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁকে এই সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয় না। কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে তাঁকে অনর্থক সময় নষ্ট করতে হয় না। এভাবেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত রকম উন্নতিসাধন করে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর রূপে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তাঁর নাম 'শ্রীকৃষ্ণ' কারণ তিনি সর্বাকর্ষক। যিনি শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর, সর্বশক্তিমান, সর্বাকর্ষক রূপে আকৃষ্ট হন, তিনি মহাভাগ্যবান। নানা রকম পরমার্থবাদী রয়েছে—তাঁদের মধ্যে কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতি আসক্ত, কেউ পরমাত্মা রূপের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপের প্রতি আকৃষ্ট এবং সর্বোপরি যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট, তিনি সমস্ত পরমার্থবাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে বলা যায়, পূর্ণ চেতনায় কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে গুহ্যতম জ্ঞান এবং সেটিই হচ্ছে সমস্ত *ভগবদ্গীতার* সারমর্ম। কর্মযোগী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এদের সকলকেই বলা হয় পরমার্থবাদী, কিন্তু যিনি শুদ্ধ ভক্ত তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যে বিশেষ শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে, *মা শুচঃ* —'ভয় করো না, দ্বিধা করো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না', তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ মনে করতে পারেন, সব রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া কি করে সম্ভব, কিন্তু ঐ ধরনের দুশ্চিন্তা নিরর্থক।

শ্লোক ৬৭

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

ইদম্—এই; **তে**—তোমা কর্তৃক; **ন**—নয়; **অতপস্কায়**—সংযমহীন ব্যক্তিকে; **ন**—নয়; **অভক্তায়**—অভক্তকে; **কদাচন**—কখনও; **ন**—নয়; **চ**—ও; **অশুশ্রূষবে**—পরিচর্যাহীনকে; **বাচ্যম্**—বলা উচিত; **ন**—নয়; **চ**—ও; **মাম্**—আমার প্রতি; **যঃ**—যে; **অভ্যসূয়তি**—বিদ্বেষ ভাবাপন্ন।

গীতার গান

অভক্ত বা অতপস্ক পরিচর্যাহীন ।
আমার স্বরূপে এই যার শ্রদ্ধা ক্ষীণ ॥

উপদেশ না করিবে গীতার বচন।
উপরোক্ত লোক সব অধিকারী নন ॥

অনুবাদ

যারা সংযমহীন, অভক্ত, পরিচর্যাহীন এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তাদেরকে কখনও এই গোপনীয় জ্ঞান বলা উচিত নয়।

তাৎপর্য

যে মানুষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তপশ্চর্যা করেনি, যে কখনও ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার প্রচেষ্টা করেনি, যে কখনও শুদ্ধ ভক্তের পরিচর্যা করেনি এবং বিশেষ করে যারা শ্রীকৃষ্ণকে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র বলে মনে করে অথবা যারা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তাদেরকে কখনও এই গুহ্যতম জ্ঞানের কথা শোনানো উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরাও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করছে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এবং *ভগবদ্গীতা* পাঠ করার পেশা গ্রহণ করে *ভগবদ্গীতার* ভ্রান্ত বিশ্লেষণ করছে অর্থ উপার্জনের জন্য। কিন্তু যিনি যথার্থই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে আগ্রহী, তাঁকে অবশ্যই *ভগবদ্গীতার* এই সমস্ত ভাষ্যগুলি বর্জন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, *ভগবদ্গীতার* যথার্থ উদ্দেশ্য তাদের বোধগম্য হয় না। এমন কি যে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশিত সংযত জীবন যাপন করছে, যদি সে কৃষ্ণভক্ত না হয়, তা হলে সেও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। এমন কি যে কৃষ্ণভক্তির অভিনয় করে, কিন্তু ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণসেবায় যুক্ত নয়, সেও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। বহু মানুষ আছে যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কারণ তিনি *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তাঁর ঊর্ধ্বে বা তাঁর সমান আর কেউ নেই। বহু মানুষ আছে যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। এই ধরনের মানুষদের কাছে *ভগবদ্গীতা* শোনানো উচিত নয়, কেন না তারা তা বুঝতে পারবে না। অবিশ্বাসী লোকদের পক্ষে *ভগবদ্গীতা* ও শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণকে না জেনে *ভগবদ্গীতার* ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৬৮

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

যঃ—যিনি; ইদম্—এই; পরমম্—পরম; গুহ্যম্—গোপনীয়; মৎ—আমার; ভক্তেষু—ভক্তদের মধ্যে; অভিধাস্যতি—উপদেশ করেন; ভক্তিম্—ভক্তি; ময়ি—আমার প্রতি; পরাম্—পরা; কৃত্বা—করে; মাম্—আমার কাছে; এব—অবশ্যই; এষ্যতি—আসবেন; অসংশয়ঃ—নিঃসংশয়ে।

গীতার গান

আমার ভক্তকে যেবা উপদেশ করে ।
পরা ভক্তি লাভ করি পাইবে আমারে ॥

অনুবাদ

যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই পরম গোপনীয় গীতাবাক্য উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করে নিঃসংশয়ে আমার কাছে ফিরে আসবেন।

তাৎপর্য

সাধারণত ভক্তসঙ্গে *ভগবদ্গীতা* আলোচনা করার উপদেশ দেওয়া হয়, কারণ অভক্তেরা না পারে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে, না পারে *ভগবদ্গীতার* মর্ম উপলব্ধি করতে। যারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করতে চায় না এবং *ভগবদ্গীতাকে* যথাযথভাবে গ্রহণ করতে চায় না, তাদের কখনই নিজের ইচ্ছামতো *ভগবদ্গীতার* বিশ্লেষণ করে অপরাধী হওয়া উচিত নয়। *ভগবদ্গীতার* অর্থ তাঁদেরই বিশ্লেষণ করা উচিত, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এটি কেবল ভক্তদের বিষয়বস্তু, দার্শনিক জল্পনা-কল্পনাকারীদের জন্য নয়। যিনি ঐকান্তিকভাবে *ভগবদ্গীতাকে* যথাযথভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন, তিনি ভক্তিযোগে উন্নতি সাধন করে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করবেন। এই শুদ্ধ ভক্তির ফলে তিনি নিঃসন্দেহে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ৬৯

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

ন—নেই; চ—এবং; তস্মাৎ—তাঁর থেকে; মনুষ্যেষু—মানুষদের মধ্যে; কশ্চিৎ—কেউ; মে—আমার; প্রিয়কৃত্তমঃ—অধিক প্রিয়কারী; ভবিতা—হবে; ন—না; চ—

এবং; মে—আমার; তস্মাৎ—তাঁর থেকে; অন্যঃ—অন্য; প্রিয়তরঃ—প্রিয়তর; ভুবি—এই পৃথিবীতে।

গীতার গান

তদপেক্ষা নরলোকে প্রিয় নাহি মোর ।
হয় নাই হবে নাই আনন্দে বিভোর ॥

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তাঁর থেকে অধিক প্রিয়কারী আমার কেউ নেই এবং তাঁর থেকে অন্য কেউ আমার প্রিয়তর হবে না।

শ্লোক ৭০

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

অধ্যেষ্যতে—অধ্যয়ন করবেন; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **ইমম্**—এই; **ধর্ম্যম্**—পবিত্র; **সংবাদম্**—কথোপকথন; **আবয়োঃ**—আমাদের উভয়ের; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **যজ্ঞেন**—যজ্ঞের দ্বারা; **তেন**—তাঁর; **অহম্**—আমি; **ইষ্টঃ**—পূজিত; **স্যাম্**—হব; **ইতি**—এই; **মে**—আমার; **মতিঃ**—অভিমত।

গীতার গান

আমার এ উপদেশ যেবা বিচার করিবে ।
তার জ্ঞানযজ্ঞে মোর উপাসনা হবে ॥

অনুবাদ

আর যিনি আমাদের উভয়ের এই পবিত্র কথোপকথন অধ্যয়ন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব। এই আমার অভিমত।

শ্লোক ৭১

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
সোহপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

শ্রদ্ধাবান্—শ্রদ্ধাবান; **অনসূয়ঃ চ**—ও অসূয়া-রহিত; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **অপি**—অবশ্যই; **যঃ**—যে; **নরঃ**—মানুষ; **সঃ অপি**—তিনিও; **মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **শুভান্**—শুভ; **লোকান্**—লোকসমূহ; **প্রাপ্নুয়াৎ**—লাভ করেন; **পুণ্যকর্মণাম্**—পুণ্য কর্মকারীদের।

গীতার গান

শ্রদ্ধাবান হয়ে যারা শ্রবণ করিবে ।
পুণ্যবান তার শুভ লোকপ্রাপ্তি হবে ॥

অনুবাদ

শ্রদ্ধাবান ও অসূয়া-রহিত যে মানুষ গীতা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে পুণ্য কর্মকারীদের শুভ লোকসমূহ লাভ করেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের সপ্তষষ্টিতম শ্লোকে ভগবান স্পষ্টভাবে ভগবৎ-বিদ্বেষী মানুষদের কাছে *গীতার* বাণী শোনাতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, *ভগবদ্গীতা* কেবল ভক্তদের জন্য। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, ভগবদ্ভক্ত জনসাধারণের কাছে *গীতা* পাঠ করছেন, যেখানে সব কয়টি শ্রোতাই ভক্ত নন। তাঁরা কেন প্রকাশ্যভাবে পাঠ করেন? সেই কথার ব্যাখ্যা করে এখানে বলা হয়েছে যে, যদিও সকলেই ভক্ত নয়, তবুও অনেকে আছেন যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। এই ধরনের মানুষেরা সাধু-বৈষ্ণবের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার ফলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন এবং তারপর যেখানে সমস্ত সাধু-মহাত্মারা অবস্থান করেন, সেই লোক প্রাপ্ত হন। সুতরাং, কেবল *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করার ফলে, এমন কি যে ব্যক্তি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভের প্রয়াসী নন, তিনিও পুণ্যকর্মের ফল লাভ করেন। এভাবেই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সকলকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এবং ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সুযোগ দান করেন।

সাধারণত যাঁরা পাপমুক্ত, যাঁরা পুণ্যবান, তাঁরা সহজেই কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন। এখানে *পুণ্যকর্মণাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন যাঁরা ভক্তিযোগ সাধন করে পুণ্য অর্জন করেছেন, কিন্তু শুদ্ধ নন, তাঁরা যেখানে ধ্রুব মহারাজ তত্ত্বাবধান করছেন, সেই ধ্রুবলোক লাভ করেন। ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, তিনি যে গ্রহে বাস করেন, তাকে বলা হয় ধ্রুবলোক বা ধ্রুবতারা।

শ্লোক ৭২

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

কচ্চিৎ—হয়েছে কি; **এতৎ**—এই; **শ্রুতম্**—শ্রুত; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **একাগ্রেণ**—একাগ্র; **চেতসা**—চিত্তে; **কচ্চিৎ**—হয়েছে কি; **অজ্ঞান**—অজ্ঞান-জনিত; **সম্মোহঃ**—মোহ; **প্রণষ্টঃ**—বিদূরিত; **তে**—তোমার; **ধনঞ্জয়**—হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)।

গীতার গান

ধনঞ্জয়, কহ এবে কিবা শঙ্কা হল দূর ।
একাগ্রেতে উপদেশ শুনিয়া প্রচুর ॥
হে পার্থ, কিবা তব অজ্ঞান অন্ধকার ।
প্রনষ্ট হইয়া গেল তব দুঃখ ভার ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! হে ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করেছ কি? তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ বিদূরিত হয়েছে কি?

তাৎপর্য

ভগবান অর্জুনের গুরুর মতো আচরণ করছিলেন। তাই, সমগ্র *ভগবদ্‌গীতার* যথাযথ অর্থ অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন কি না তা জিজ্ঞেস করা কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। অর্জুন যদি তাঁর অর্থ ঠিক মতো না বুঝতেন, তা হলে ভগবান কোন বিশেষ বিষয় বা সম্পূর্ণ *ভগবদ্‌গীতা* প্রয়োজন হলে আবার ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছ থেকে *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করেন, তাঁর সমস্ত অজ্ঞানতা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। *ভগবদ্‌গীতা* কোন কবি বা সাহিত্যিকের লেখা সাধারণ কোন গ্রন্থ নয়। তা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী। কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর যথার্থ প্রতিনিধির কাছ থেকে এই বাণী শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই মুক্ত পুরুষরূপে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৭৩

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **নষ্টঃ**—দূর হয়েছে; **মোহঃ**—মোহ; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **লব্ধা**—লাভ করেছি; **ত্বৎপ্রসাদাৎ**—তোমার কৃপায়; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **স্থিতঃ**—যথাজ্ঞানে অবস্থিত; **অস্মি**—হয়েছি; **গত**—দূর হয়েছে; **সন্দেহঃ**—সমস্ত সংশয়; **করিষ্যে**—আমি পালন করব; **বচনম্**—আদেশ; **তব**—তোমার।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

নষ্ট মোহ স্মৃতি লাভ তোমার প্রসাদে ।
অচ্যুত, সন্দেহ গেল নাহি সে বিষাদে ॥
স্থিত আমি নিজ কার্যে তোমার বচন ।
নিশ্চয়ই করিব আমি ঘুচিল বন্ধন ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি লাভ করেছি। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে এবং যথাজ্ঞানে অবস্থিত হয়েছি। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করব।

তাৎপর্য

অর্জুনের আদর্শস্বরূপ সমস্ত জীবেরই স্বরূপগত অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা উচিত। আত্মসংযম করা তাদের ধর্ম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, জীবের স্বরূপ হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস। সেই কথা ভুলে জীব জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু পরমেশ্বরের সেবা করার ফলে সে মুক্ত ভগবৎ দাসে পরিণত হয়। দাসত্ব করাটাই হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। হয় সে মায়ার দাসত্ব করে, নয় পরমেশ্বর ভগবানের দাসত্ব করে। সে যখন

পরমেশ্বরের দাসত্ব করে, তখন সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু সে যখন বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দাসত্ব বরণ করে, তখন সে অবশ্যই বন্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব জড় জগতের দাসত্ব করে। সে তখন কামনা-বাসনার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তবু সে নিজেকে সমস্ত জগতের মালিক বলে মনে করে। একেই বলা হয় মায়া। মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন তার মোহ কেটে যায় এবং সে স্বেচ্ছায় পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করে। চরম মোহ অর্থাৎ জীবকে ধরে রাখবার জন্য মায়ার চরম ফাঁদ হচ্ছে নিজেকে ভগবান বলে মনে করা। জীব মনে করে যে, সে আর বদ্ধ আত্মা নয়, সে ভগবান। সে এতই মূঢ় যে, সে ভেবে দেখে না যে, যদি সে ভগবান হত, তা হলে তার মনে এই সংশয় কেন? সেই কথা সে ভেবে দেখে না। তাই সেটিই হচ্ছে মায়ার চরম ফাঁদ। প্রকৃতপক্ষে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা এবং তাঁর আদেশ অনুসারে কর্ম করতে সম্মত হওয়া।

এই শ্লোকে *মোহ* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যা জ্ঞানের বিরোধী, তাকে বলা হয় *মোহ*। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে প্রতিটি জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের দাস বলে জানতে পারা। কিন্তু নিজেকে সেই রকম চিন্তা করার পরিবর্তে জীব মনে করে যে, সে একজন দাস নয়, সে হচ্ছে এই জড় জগতের মালিক, কেন না সে জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। সেটিই হচ্ছে তার মোহ। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কৃপার দ্বারা এই মোহ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জীব যখনই এই মোহ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করতে সম্মত হয়।

কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে বদ্ধ জীবাত্মা জানতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সকলের প্রভু, যিনি পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সব কিছুর অধীশ্বর। তিনি তাঁর ভক্তকে যা ইচ্ছা তাই দান করতে পারেন; তিনি সকলেরই বন্ধু এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। তিনি এই জড়া প্রকৃতির ও সমস্ত জীবের নিয়ন্তা। তিনি অনন্ত কালেরও নিয়ন্তা এবং তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য ও সমগ্র শক্তিতে পরিপূর্ণ। পরম পুরুষোত্তম ভগবান ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারেন। যে তাঁকে জানে না, সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন; সে ভক্ত হতে পারে না—সে মায়ার দাস। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছ থেকে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করার পর অর্জুন সমস্ত মোহ থেকে মুক্ত হলেন। তিনি জানতে পারলেন

যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁর বন্ধুই নন, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। বাস্তবিকপক্ষে তখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারলেন। সুতরাং, *ভগবদ্গীতা* পাঠ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পারা। মানুষ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জুন যখন বুঝতে পারলেন যে, অনাবশ্যক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে যুদ্ধ করতে সম্মত হলেন। তিনি আবার তাঁর অস্ত্র ধনুর্বাণ তুলে নিলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করবার জন্য।

শ্লোক ৭৪

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **ইতি**—এভাবেই; **অহম্**—আমি; **বাসুদেবস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **পার্থস্য**—অর্জুনের; **চ**—ও; **মহাত্মনঃ**—দুই মহাত্মার; **সংবাদম্**—সংবাদ; **ইমম্**—এই; **অশ্রৌষম্**—শ্রবণ করেছিলাম; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **রোমহর্ষণম্**—রোমাঞ্চকর।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিল ঃ

সেই যে শুনেছি আমি কৃষ্ণার্জুন কথা।
অদ্ভুত সংবাদ রোমহর্ষণ সর্বথা ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—এভাবেই আমি কৃষ্ণ ও অর্জুন দুই মহাত্মার এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ শ্রবণ করেছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার শুরুতে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সচিব সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কি হল?" তাঁর গুরুদেব ব্যাসদেবের কৃপার ফলে সঞ্জয়ের হৃদয়ে সমস্ত

ঘটনাগুলি প্রকাশিত হল। এভাবেই তিনি রণাঙ্গনের মূল ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করলেন। এই বাক্যালাপ অপূর্ব, কারণ পূর্বে দুজন অতি মহান পুরুষের মধ্যে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কখনই হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এটি অপূর্ব, কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর স্বরূপ ও তাঁর শক্তি সম্বন্ধে তাঁর অতি মহান ভক্ত অর্জুনের মতো জীবের কাছে বর্ণনা করেছেন। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তা হলে আমাদের জীবন সুখদায়ক ও সার্থক হবে। সঞ্জয় তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং যেমনভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেভাবেই তিনি সেই কথোপকথন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করেন। এখন এখানে স্থির সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত অর্জুন বর্তমান, সেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ৭৫

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্ ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ—ব্যাসদেবের কৃপায়; **শ্রুতবান্**—শ্রবণ করেছি; **এতৎ**—এই; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **অহম্**—আমি; **পরম্**—পরম; **যোগম্**—যোগ; **যোগেশ্বরাৎ**—যোগেশ্বর; **কৃষ্ণাৎ**—শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **কথয়তঃ**—বর্ণনাকারী; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

গীতার গান

ব্যাসের প্রসাদে আমি শুনিলাম সেই ।
পরম সে গুহ্যতম তুলনা যে নেই ॥
এই যোগ যোগেশ্বর কৃষ্ণ সে কহিল ।
সাক্ষাৎ তাঁহার মুখে আমি সে শুনিল ॥

অনুবাদ

ব্যাসদেবের কৃপায়, আমি এই পরম গোপনীয় যোগ সাক্ষাৎ বর্ণনাকারী স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব ছিলেন সঞ্জয়ের গুরুদেব এবং সঞ্জয় এখানে স্বীকার করছেন যে, ব্যাসদেবের কৃপার ফলে তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে

পেরেছেন। অর্থাৎ, সরাসরিভাবে নিজের চেষ্টার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায় না। তাঁকে জানতে হয় গুরুদেবের কৃপার মাধ্যমে। ভগবৎ-তত্ত্ব দর্শনের উপলব্ধি যদিও সরাসরি, কিন্তু গুরুদেব হচ্ছেন তার স্বচ্ছ মাধ্যম। সেটিই হচ্ছে গুরু-পরম্পরার রহস্য। সদ্‌গুরুর কাছে সরাসরিভাবে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করা যায়, যেমন অর্জুন শ্রবণ করেছিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক অতীন্দ্রিয়বাদী ও যোগী রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হও। যিনি তা করেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*যোগিনামপি সর্বেষাম্*।

নারদ মুনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য এবং ব্যাসদেবের গুরুদেব। তাই ব্যাসদেবও হচ্ছেন অর্জুনের মতো সৎ শিষ্য, কারণ তিনি গুরু-পরম্পরায় রয়েছেন আর সঞ্জয় হচ্ছেন ব্যাসদেবের শিষ্য। তাই, ব্যাসদেবের আশীর্বাদে সঞ্জয়ের ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হয়েছে এবং তিনি সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁর কথা শ্রবণ করতে পেরেছেন। যিনি সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করতে পারেন, তিনি এই রহস্যাবৃত জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারেন। কেউ যদি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত না হন, তা হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন না। তাই তাঁর জ্ঞান সর্বদাই অসম্পূর্ণ, অন্তত *ভগবদ্গীতা* সম্বন্ধে।

ভগবদ্গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—সমস্ত যোগের পন্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই সমস্ত যোগের ঈশ্বর। আমাদের বুঝতে হবে যে, অর্জুন তাঁর অসীম সৌভাগ্যের ফলে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছিলেন, তেমনই ব্যাসদেবের আশীর্বাদে সঞ্জয়ও শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সরাসরিভাবে শ্রবণ করতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সরাসরিভাবে শ্রবণ করা এবং ব্যাসদেবের মতো সদ্‌গুরুর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ব্যাসদেবেরও প্রতিনিধি। তাই, বৈদিক প্রথা অনুসারে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে তাঁর শিষ্যরা ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করেন।

শ্লোক ৭৬

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **সংস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **সংস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **সংবাদম্**—সংবাদ; **ইমম্**—এই; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **কেশব**—শ্রীকৃষ্ণ; **অর্জুনয়োঃ**—এবং অর্জুনের; **পুণ্যম্**—পুণ্যজনক; **হৃষ্যামি**—হরষিত হচ্ছি; **চ**—ও; **মুহুর্মুহুঃ**—বারংবার।

গীতার গান

স্মরণ করিয়া রাজা পুনঃ পুনঃ সেই।
অদ্ভুত সংবাদ স্মরি হৃষ্ট আমি হই ॥
কেশব আর অর্জুন কথা পুণ্য গীতা।
মুহুর্মুহু শুনে নিত্য সর্বহিতে রতা ॥

অনুবাদ

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই পুণ্যজনক অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করতে করতে আমি বারংবার রোমাঞ্চিত হচ্ছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার উপলব্ধি এতই দিব্য যে, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সম্বন্ধে অবগত হন, তখনই তিনি পবিত্র হন এবং তাঁদের কথা আর তিনি ভুলতে পারেন না। এটিই হচ্ছে ভক্ত-জীবনের চিন্ময় অবস্থা। পক্ষান্তরে বলা যায়, কেউ যখন নির্ভুল উৎস সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে *গীতা* শ্রবণ করেন, তখনই তিনি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রভাবে উত্তরোত্তর দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হতে থাকে এবং পুলকিত চিত্তে জীবন উপভোগ করা যায়। তা কেবল ক্ষণিকের জন্য নয়, প্রতি মুহূর্তে সেই দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়।

শ্লোক ৭৭

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

তৎ—তা; **চ**—ও; **সংস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **সংস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **রূপম্**—রূপ; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **বিস্ময়ঃ**—বিস্ময়; **মে**—আমার;

মহান্—অতিশয়; **রাজন্**—হে রাজন্; **হৃষ্যামি**—হরষিত হচ্ছি; **চ**—ও; **পুনঃ পুনঃ**—বারংবার।

গীতার গান

স্মরণ করিয়া সেই অদ্ভুত স্বরূপ ।
পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট মন হয় অপরূপ ॥

অনুবাদ

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপ স্মরণ করতে করতে আমি অতিশয় বিস্ময়াভিভূত হচ্ছি এবং বারংবার হরষিত হচ্ছি।

তাৎপর্য

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, ব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জয়ও সেই রূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন। এই কথা অবশ্য বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে কখনও এই রূপ দেখাননি। তা কেবল অর্জুনকেই দেখানো হয়েছিল, তবুও শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তখন কতিপয় মহান ভক্তও তা দেখতে পেরেছিলেন এবং ব্যাসদেব ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ব্যাসদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান ভক্ত এবং তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার বলে গণ্য করা হয়। যে অদ্ভুত রূপ অর্জুনকে দেখানো হয়েছিল, ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য সঞ্জয়ের কাছে সেই রূপ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই রূপ স্মরণ করে সঞ্জয় পুনঃ পুনঃ বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৮

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

যত্র—যেখানে; **যোগেশ্বরঃ**—যোগেশ্বর; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **যত্র**—যেখানে; **পার্থঃ**—পৃথাপুত্র; **ধনুর্ধরঃ**—ধনুর্ধর; **তত্র**—সেখানে; **শ্রীঃ**—ঐশ্বর্য; **বিজয়ঃ**—বিজয়; **ভূতিঃ**—অসাধারণ শক্তি; **ধ্রুবা**—নিশ্চিতভাবে; **নীতিঃ**—নীতি; **মতিঃ মম**—আমার অভিমত।

গীতার গান

যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ পার্থ ধনুর্ধর ।
তথা শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুব নিরন্তর ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ নাহি সে অন্তর ।
শুদ্ধ নাম যার হয় সেই ধুরন্ধর ॥

অনুবাদ

যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই নিশ্চিতভাবে শ্রী, বিজয়, অসাধারণ শক্তি ও নীতি বর্তমান থাকে। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের মাধ্যমে *ভগবদ্গীতা* শুরু হয়। তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি মহারথীদের সাহায্য প্রাপ্ত তাঁর সন্তানদের বিজয় আশা করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী তাঁর পক্ষে থাকবেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা করার পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বললেন, "আপনি বিজয়ের কথা ভাবছেন, কিন্তু আমি মনে করি, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রয়েছেন, সেখানে সৌভাগ্যলক্ষ্মীও থাকবেন।" তিনি সরাসরিভাবে প্রতিপন্ন করলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পক্ষের বিজয় আশা করতে পারেন না। অর্জুনের পক্ষে বিজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের রথের সারথির পদ বরণ করা আর একটি ঐশ্বর্যের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং বৈরাগ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি। এই প্রকার বৈরাগ্যের বহু নিদর্শন রয়েছে, কেন না শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বৈরাগ্যেরও ঈশ্বর।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ হচ্ছিল দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে। অর্জুন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরের বিজয় অনিবার্য ছিল। কে পৃথিবী শাসন করবে তা স্থির করার জন্য যুদ্ধ হচ্ছিল এবং সঞ্জয় ভবিষ্যৎ বাণী করলেন যে, যুধিষ্ঠিরের দিকে শক্তি স্থানান্তরিত হবে। ভবিষ্যৎ বাণী করে আরও বলা হল যে, যুদ্ধজয়ের পরে যুধিষ্ঠির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করবেন। কারণ তিনি কেবল ধার্মিক ও পুণ্যবানই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর নীতিবাদীও। তাঁর সারা জীবনে তিনি একটিও মিথ্যা কথা বলেননি।

অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন অনেক মানুষ *ভগবদ্গীতাকে* যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বন্ধুর কথোপকথন বলে মনে করে। কিন্তু সেই ধরনের কোন গ্রন্থ শাস্ত্র বলে গণ্য হতে পারে না।

কেউ প্রতিবাদ করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে উত্তেজিত করেছিলেন, যা নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এখানে প্রকৃত অবস্থাটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে নীতি সম্বন্ধে চরম উপদেশ। নবম অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশতম শ্লোকে চরম নৈতিক উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ।* মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হতে হবে এবং সমস্ত ধর্মের সারমর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করা (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ নীতি ও ধর্মের শ্রেষ্ঠ পন্থাকে স্থাপিত করছে। অন্যান্য সমস্ত পন্থা মানুষকে পবিত্র করতে পারে এবং এই পথে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* শেষ উপদেশ হচ্ছে সমস্ত ধর্ম ও নীতির শেষ কথা—শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা। সেটিই হচ্ছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত।

ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দার্শনিক মতবাদ ও ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করা হচ্ছে একটি পন্থা, কিন্তু সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করাটা হচ্ছে সর্বোত্তম সিদ্ধি। সেটিই হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষার সারমর্ম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে বিধি-নিষেধের পন্থা জ্ঞানের গুহ্য পথ হতে পারে। যদিও ধর্মের আচার-আচরণ গুহ্য, কিন্তু ধ্যান ও জ্ঞানের অনুশীলন গুহ্যতর। আর কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করাটা হচ্ছে গুহ্যতম নির্দেশ। সেটিই হচ্ছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারমর্ম।

ভগবদ্গীতার আর একটি দিক হচ্ছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। পরমতত্ত্ব তিনভাবে উপলব্ধ হন—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পরমতত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তা হলে জ্ঞানের সমস্ত বিভাগই হচ্ছে সেই উপলব্ধির অংশ-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রাকৃত, কারণ তিনি সর্বদাই তাঁর নিত্য অন্তরঙ্গা শক্তিতে অধিষ্ঠিত। জীবসমূহ তাঁর শক্তির প্রকাশ এবং তারা দুভাবে বিভক্ত—নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। এই সমস্ত জীব অনন্ত এবং তারা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ-বিশেষ। জড় প্রকৃতি চব্বিশটি তত্ত্বে প্রকাশিত। সৃষ্টি অনন্ত কালের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার সৃষ্টি হয় এবং তার লয় হয়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রকাশ পুনঃ পুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়।

ভগবদ্গীতায় পাঁচটি মুখ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে—পরমেশ্বর ভগবান, জড় প্রকৃতি, জীব, নিত্যকাল ও সর্বপ্রকার কর্ম। এই সবই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত ধারণা—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, একস্থানে স্থিত পরমাত্মা এবং অন্য যে কোনরূপ চিন্ময় ধারণা

পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করারই অন্তর্ভুক্ত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, জীব, জড়া প্রকৃতি ও কাল ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়, কিন্তু কোন কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন হচ্ছে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব'। এই দর্শন পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত।

জীব তার স্বরূপে চিন্ময় শুদ্ধ আত্মা। সে পরমাত্মার অণুসদৃশ অংশ-বিশেষ। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে এবং জীব সমূহকে সূর্য-কিরণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেহেতু বদ্ধ জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি, তাই তাদের অপরা প্রকৃতি অথবা পরা প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকার প্রবণতা রয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীব ভগবানের দুই শক্তির মধ্যে অবস্থিত এবং যেহেতু জীব ভগবানের পরা প্রকৃতিজাত, তাই তার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে সে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনাধীন হতে পারে। এভাবেই সে হ্লাদিনী শক্তিতে তার স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করতে পারে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—ত্যাগ সাধনার সার্থক উপলব্ধি বিষয়ক 'মোক্ষযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অনুক্রমণিকা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সংস্কৃত মূল শ্লোক

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম সংখ্যাটি অধ্যায় ও দ্বিতীয়টি শ্লোক সংখ্যা]

অ

আ

ই

দ

ধ

ব

ভ

ম

য

র

বর্তমান সংস্করণ সম্পর্কে টীকা

ভগবদ্‌গীতা যথাযথ গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণের সাথে যে সমস্ত পাঠক-পাঠিকা পরিচিত আছেন, তাঁদের সুবিধার্থে বর্তমান সংস্করণটি সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বতন সংস্করণের এবং বর্তমান সংস্করণের বিষয়বস্তু অভিন্ন, তবু উল্লেখযোগ্য এই যে, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের সম্পাদকমণ্ডলী শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মূল রচনার প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত হওয়ার অভিলাষে তাঁদের মহাফেজখানা থেকে অতি পুরানো পাণ্ডুলিপিগুলি অনুসন্ধান করে বর্তমান সংস্করণটির আদ্যোপান্ত সংশোধন, পরিমার্জন ও সম্পাদনা সম্পন্ন করেছেন।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর ভারত থেকে আমেরিকায় যাওয়ার দুই বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে *ভগবদ্‌গীতা যথাযথ* গ্রন্থের মূল ইংরেজী সংস্করণ *ভগবদ্‌গীতা অ্যাজ্ ইট ইজ্* সম্পূর্ণ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে ম্যাকমিলান কোম্পানি *ঐ গীতার* একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং প্রথম অসংক্ষেপিত সম্পূর্ণ সংস্করণটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমেরিকা থেকে *গীতার* এই ইংরেজী প্রথম সংস্করণটি প্রকাশের আগে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নতুন আমেরিকান সুযোগ্য শিষ্যবর্গ পাণ্ডুলিপি ও প্রেসকপি প্রস্তুতির দুরূহ কাজে বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদকে সাহায্য করেছিলেন। টেপরেকর্ডে বাণীবদ্ধ তাঁর ভাষ্য থেকে যাঁরা অনুলিখন করেছিলেন, তাঁরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর সুদৃঢ় বাচনভঙ্গির ইংরেজী উচ্চারণ অনুধাবনে অসুবিধা বোধ করতেন এবং তাঁর সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলিও তাঁদের কানে অপরিচিত মনে হত। আমেরিকান ভক্তদের মধ্যে সংস্কৃত সম্পাদনার ভারপ্রাপ্ত সকলেই ঐ ভাষায় নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাই, ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদকদের যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গেই পাণ্ডুলিপি ও প্রেসকপি প্রস্তুতির সময়ে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য জায়গাগুলিতে বিচ্যুতি স্বীকার করেই যেতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্যরচনা প্রকাশনার কাজে তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল এবং *ভগবদ্‌গীতা অ্যাজ্ ইট ইজ্* সমগ্র পৃথিবীতে বিদগ্ধ মহলে ও ভক্তসমাজে প্রামাণ্য সংস্করণ হয়ে উঠেছে।

এই বর্তমান সংস্করণটির জন্য অবশ্য শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ বিগত পঁচিশ বছর যাবৎ তাঁর যাবতীয় গ্রন্থাবলী নিয়ে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন। ইংরেজী ভাষার

সম্পাদকেরা তাঁর দর্শনতত্ত্ব ও ভাষাশৈলীর আরও ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অর্জন করেছেন এবং সংস্কৃত ভাষার সম্পাদকেরাও ইতিমধ্যে সুযোগ্য ভাষাতত্ত্ববিদ হয়ে উঠেছেন। আর তাই ইংরেজি ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদ যখন *ভগবদ্গীতা অ্যাজ্ ইট ইজ্* লিখেছিলেন, তখন যে সমস্ত সংস্কৃত ভাষা তিনি পর্যালোচনা করেছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে পাণ্ডুলিপির মধ্যে দুর্বোধ্যতা সম্পাদকদের কাছে এখন সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

তার ফলে এমন এক গ্রন্থাকৃতি পরিণতি লাভ করেছে, যা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত ও প্রামাণ্য। সংস্কৃত তথা ইংরেজী প্রতিশব্দগুলি এখন শ্রীল প্রভুপাদের অন্যান্য গ্রন্থসম্ভারের প্রামাণিকতা অনেক বেশি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে চলেছে এবং তাই হয়ে উঠেছে অনেক সুস্পষ্ট আর যথাযথ। কোনও কোনও জায়গায় অনুবাদকর্ম যদিও ইতিপূর্বে শুদ্ধভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল, তবু মূল সংস্কৃত ও শ্রীল প্রভুপাদের মূল অনুবাদশৈলীর নিবিড় ভাবানুগ করে তোলার উদ্দেশ্যে তা সযত্নে সংশোধিত হয়েছে। আদি সংস্করণে ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য থেকে অনেক অনুচ্ছেদ বাদ পড়ে গিয়েছিল, সেগুলি বর্তমান সংস্করণে যথাযথ স্থানে পুনরুদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে। আর যে সমস্ত সংস্কৃত উদ্ধৃতির উৎস বিবরণ প্রথম সংস্করণে অনুল্লিখিত ছিল, সেগুলি যথাযথভাবে অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার পূর্ণ সূত্র উল্লেখসহ এখন উপস্থাপিত হয়েছে।

বর্তমান বাংলা সংস্করণের অন্যতম অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙালী পাঠকসমাজের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি মূল সংস্কৃত শ্লোক বাংলা অক্ষরে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা ছাড়াও, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত বহুল প্রচারিত *গীতার গান* নামক অনবদ্য গ্রন্থখানি থেকে প্রতিটি শ্লোকের বাংলা পদ্যে ভাবানুবাদও শ্লোকগুলির নীচে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

দৃশ্যপটের অবতারণা

ব্যাপকভাবে প্রকাশিত এবং একক গ্রন্থরূপে পঠিত *ভগবদ্গীতা* প্রাচীন জগতের মহাকাব্যরূপ সংস্কৃত ইতিহাস *মহাভারত* গ্রন্থের একটি দৃশ্যাংশ-স্বরূপ আদিতে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান কলিযুগের ঘটনাবলী অবধি *মহাভারতে* কথিত হয়েছে। এই যুগেরই প্রারম্ভে, আনুমানিক পঞ্চাশত্তম শতাব্দীর পূর্বে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা ও ভক্ত অর্জুনকে *ভগবদ্গীতা* শুনিয়েছিলেন।

তাঁদের পারস্পরিক আলোচনা—যা মানুষের কাছে পরিজ্ঞাত মহত্তম দার্শনিক ও ধর্মীয় সংলাপগুলি ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ও তাঁদের বিপক্ষে পাণ্ডুপুত্রগণ তথা তাঁদের পাণ্ডব জ্ঞাতিভ্রাতাগণের মধ্যে এক বিশাল ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষরূপ যুদ্ধের প্রারম্ভে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভূমণ্ডলের পূর্বতন অধিপতি যে ভরত রাজার নাম থেকে *মহাভারত* নামটি উদ্ভূত হয়েছে, তাঁর বংশানুক্রমে কুরুবংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, তাই যে-সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য ছিল, তা কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুকে প্রদান করা হয়েছিল।

অল্পবয়সে পাণ্ডু মারা গেলে, তাঁর পঞ্চপুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তৎকালীন কার্যকরী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন হন। এভাবেই ধৃতরাষ্ট্রের ও পাণ্ডুর পুত্রগণ একই রাজপরিবারে প্রতিপালিত হন। তাঁরা সকলেই সুদক্ষ দ্রোণের কাছে সমরকৌশলে প্রশিক্ষিত হন এবং শ্রদ্ধাভাজন পিতামহ ভীষ্মের কাছে উপদেশাবলী লাভ করেন।

তা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, বিশেষত জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের ঘৃণা ও ঈর্ষা করত। আর অন্ধ ও দুষ্টমনা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বাদ দিয়ে নিজ পুত্রদেরই রাজ্যের অধিকার দিতে চাইতেন।

তাই ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে, দুর্যোধন পাণ্ডুর তরুণ পুত্রদের বধ করবার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং কেবলমাত্র তাঁদের পিতৃব্য বিদুর ও তাঁদের ভ্রাতৃপ্রতিম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সযত্ন সুরক্ষার মাধ্যমে পাণ্ডবেরা তাঁদের প্রাণান্তকর বহু ষড়যন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন।

এখন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন এবং সমসাময়িক এক রাজবংশে রাজপুত্রের ভূমিকায় লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। এই ভূমিকায় তিনি পাণ্ডবদের

জননী পাণ্ডুপত্নী কুন্তী, অর্থাৎ পৃথার ভ্রাতুষ্পুত্রও হয়েছিলেন। সুতরাং আত্মীয়রূপে এবং ধর্মের নিত্য রক্ষকরূপেও শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুর ন্যায়ধর্মী পুত্রদের প্রতি কৃপা করেছিলেন এবং তাঁদের সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন।

অবশেষে, ধূর্ত দুর্যোধন অবশ্য এক জুয়াখেলায় পাণ্ডবদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানায়। সেই দুর্ভাগ্যজনক ক্রীড়ার মাধ্যমে, দুর্যোধন ও তার ভ্রাতৃবর্গ পাণ্ডবদের সাধ্বী ও একান্ত অনুগতা পত্নী দ্রৌপদীকে অধিকার করে, আর সমবেত সমগ্র রাজপুত্রগণ ও রাজন্যবর্গের সমাবেশের সামনেই তাঁকে বিবস্ত্রা করার মাধ্যমে অপমাণিত করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য হস্তক্ষেপের ফলে তিনি তা থেকে রক্ষা পান, কিন্তু সেই দ্যূতক্রীড়া জালিয়াতিপূর্ণ ও কপটতাপূর্ণ হয়েছিল বলেই পাণ্ডবেরা তাঁদের রাজ্য থেকে বঞ্চিত হন এবং তাঁদের তের বছরের বনবাস গমনে বাধ্য করা হয়।

বনবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে, পাণ্ডবেরা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই দুর্যোধনের কাছ থেকে তাঁদের রাজ্য ফিরে পেতে অনুরোধ জানালে সে স্পষ্টতই তা প্রদান করতে অসম্মত হয়। যেহেতু রাজপুত্রগণ জনসেবা ব্রতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন, তাই পঞ্চপাণ্ডবেরা শুধুমাত্র পাঁচটি গ্রাম ফিরে পাবার অনুরোধে ক্ষান্ত হন। কিন্তু দুর্যোধন উদ্ধতভাবে উত্তর দেয় যে, সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও সে তাঁদের ছেড়ে দেবে না।

এ যাবৎ, পাণ্ডবেরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সহিষ্ণু ও সংযত হয়ে ছিলেন। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে যুদ্ধ অনিবার্য।

তা সত্ত্বেও, ভূমণ্ডলের রাজন্যবর্গ বিভক্ত হয়ে গেলে, কিছু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পক্ষ নিলেন, অন্যেরা পাণ্ডবদের দলে এলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডুপুত্রদের পক্ষে বার্তাবহ দূতের ভূমিকা গ্রহণ করে শান্তির প্রস্তাব আলোচনার উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় যান। তাঁর শান্তির প্রস্তাব আদি প্রত্যাখ্যাত হলে, এবার যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

মহত্তম আদর্শ নীতির বাহক পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে স্বীকার করলেও, ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মভ্রষ্ট পুত্রেরা তা করেনি। তবু শ্রীকৃষ্ণ দুই বিবাদী পক্ষেরই অভিলাষ অনুসারে যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানরূপে, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করবেন না বললেন, তবে যে-পক্ষ চায়, তাঁরা ইচ্ছা করলে শ্রীকৃষ্ণের সেনাবাহিনীর সুযোগ নিতে পারতেন—এবং অপর পক্ষ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশদাতা ও সহায়করূপে পেতে পারেন। রাজনৈতিক ধুরন্ধর দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের সেনাবাহিনী কুক্ষিগত করেন, আর পাণ্ডবেরা ঠিক তেমনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পেতেই আকুল হয়ে ওঠেন।

এভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হচ্ছেন অর্জুনের সারথি, প্রবাদপ্রসিদ্ধ ধনুর্ধরের সারথি হয়ে তাঁর রথের চালক। এই পর্যন্ত এসে আমরা *ভগবদ্গীতার* সূচনাক্ষণে উপনীত হই, যেখানে দুই সেনাবাহিনী সারিবদ্ধভাবে সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখি প্রস্তুত এবং ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর সচিব সঞ্জয়ের কাছে জানতে চাইছেন, "তারপর তারা কি করল?"

দৃশ্যপট প্রস্তুত, এখন কেবল এই অনুবাদকর্ম ও ভাষ্য সম্পর্কে সামান্য টীকা প্রদান প্রয়োজন।

ভগবদ্গীতা ভাষান্তরিত করবার কাজে সাধারণ শ্রেণীর অনুবাদকেরা যে ধারা অনুসরণ করে এসেছেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণের পুরুষসত্তা একপাশে সরিয়ে রেখে তাঁদের নিজেদেরই ভাবধারা ও দর্শনতত্ত্বের জায়গা করে নিয়েছেন। *মহাভারতের* ইতিবৃত্তকে চমকপ্রদ পুরাকাহিনীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন কোনও অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা আদি উপস্থাপনার কাব্যসুলভ এক কাল্পনিক চেহারা মাত্র, কিংবা তিনি বড় জোর এক অতি নগণ্য ঐতিহাসিক পুরুষমাত্র। কিন্তু পুরুষসত্তা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *ভগবদ্গীতার* লক্ষ্য ও সারমর্ম উভয়ই, অন্তত *গীতায়* যা উক্ত হয়েছে, তা থেকে এটিই বোঝায়।

ভাষ্যসহ এই অনুবাদকর্মটি তাই পাঠককে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীত করতে সাহায্য করে—তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে নয়। এই যুক্তিবলে, *ভগবদ্গীতা যথাযথ* অতুলনীয়। আরও অতুলনীয় এই জন্য যে, *ভগবদ্গীতা* পরিপূর্ণভাবে সুসমঞ্জস ভাবদ্যোতক এবং সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গীতার প্রবক্তা এবং এই গীতার চরম লক্ষ্যও বটে, তাই একমাত্র এই অনুবাদকর্মটি যথার্থই এই মহান শাস্ত্র-সম্পদটিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছে।

—প্রকাশক

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রশংসা

আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে ভারতের অন্তহীন বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে নিয়ে আসার জন্য বহু মনীষী বিগত কয়েক বছর ধরে শ্রীল প্রভুপাদের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

* * *

"শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব-সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এক অনবদ্য অবদান।"

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী
ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

"পাশ্চাত্যের অত্যন্ত সক্রিয় ও স্থূল জড়বাদ-প্রসূত, সমস্যা-জর্জরিত, ধ্বংসোন্মুখ, পারমার্থিক চেতনাবিহীন ও অন্তঃসারশূন্য সমাজের কাছে স্বামী ভক্তিবেদান্ত এক মহান বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন। সেই গভীরতা ব্যতীত আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদগুলি কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

টমাস মেরটন
ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্

"ভারতের যোগীদের প্রদত্ত ধর্মের বিবিধ পন্থার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দশম অধস্তন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে সব চাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তি, একনিষ্ঠতা, অদম্য শক্তি ও দক্ষতার দ্বারা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সংগঠন করে যেভাবে হাজার হাজার মানুষকে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উদ্বুদ্ধ করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি বড় বড় শহরে রাধা-কৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত ভক্তিযোগের ভিত্তিতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অবিশ্বাস্য।"

প্রফেসর মহেশ মেহতা
প্রফেসর অভ্ এশিয়ান স্টাডিস,
ইউনিভার্সিটি অভ্ উইণ্ডসর,
অণ্টারিও, কানাডা

"এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু আচার্য এবং এক মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।"

জোসেফ জিন লানজো ডেলভাস্টো
বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক

"শ্রীল প্রভুপাদের বিশাল সাহিত্য-সম্ভারের পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার মাহাত্ম্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতের মানুষেরা অবশ্যই এক সুন্দরতর পৃথিবীতে বাস করার সুযোগ পাবে। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সমস্ত মানব-সমাজের ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহান প্রতীক। ভারতবর্ষের বাইরের জগৎ, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগৎ শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাদের ভারতের কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রদান করেছেন।"

শ্রীবিশ্বনাথ শুক্লা, পি-এইচ. ডি
প্রফেসর অভ্ হিন্দি,
এম, ইউ, আলিগড়,
উত্তরপ্রদেশ

"পাশ্চাত্যে বসবাসকারী একজন ভারতীয় হিসাবে যখন আমি আমাদের দেশের বহু মানুষকে এখানে এসে ভণ্ড গুরু সেজে বসতে দেখি, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। পাশ্চাত্যে, যেমন যে কোন সাধারণ মানুষ তার জন্ম থেকেই খ্রিস্টান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, ভারতবর্ষেও একজন সাধারণ মানুষ তেমনই তার জন্ম থেকেই ধ্যান ও যোগসাধনের সঙ্গে পরিচিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে বহু অসৎ লোক ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসে যোগ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রদর্শন করে মন্ত্র দেওয়ার নামে লোক ঠকাচ্ছে এবং নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করছে। এই ধরনের অনেক প্রবঞ্চক তাদের অন্ধ অনুগামীদের এমনভাবে প্রবঞ্চনা করছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদেরই একটু জ্ঞান আছে, তাঁরাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। সেই কারণে শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছি। সেগুলি 'গুরু' ও 'যোগী' সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত যে ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা চলছে, তা বন্ধ করবে এবং সমস্ত মানুষকে প্রাচ্য সংস্কৃতির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেবে।"

ডঃ কৈলাস বাজপেয়ী
ডাইরেক্টর অভ্ ইণ্ডিয়ান স্টাডিস
সেন্টার ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিস
দি ইউনিভার্সিটি অভ্ মেক্সিকো

"এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থগুলি কেবল সুন্দরই নয়, তা বর্তমান যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে যখন সমগ্র জাতিই জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য এক সাংস্কৃতিক পন্থা খুঁজছে।"

ডঃ সি. এল. স্প্রেডবারি
প্রফেসর অভ্ সোসিওলজি,
স্টিফেন এফ অস্টিন স্টেট ইউনিভার্সিটি

"ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। এই গ্রন্থগুলি শিক্ষায়তন ও পাঠাগারগুলির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতিটি অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছে আমি বিশেষভাবে সুপারিশ করব *শ্রীমদ্ভাগবত*

পাঠ করার জন্য। মহান পণ্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী হচ্ছেন এক বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ এবং আধুনিক জগতের কাছে বৈদিক দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের এক মহান পথপ্রদর্শক। বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি একশটিরও অধিক পারমার্থিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর সব কয়টি দেশে বৈদিক জীবনধারা ও সনাতন ধর্ম প্রচারে তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। স্বামী ভক্তিবেদান্তের মতো গুণী মানুষের দ্বারা যে আজ *ভাগবতের* বাণী সারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হচ্ছে, সেই জন্য আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

ডঃ আর কালিয়া
প্রেসিডেন্ট
ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন্

"বৈদিক শাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করে স্বামী ভক্তিবেদান্ত ভগবদ্ভক্তদের উদ্দেশ্যে এক মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই তত্ত্বদর্শনের বিশ্বজনীন প্রয়োগ আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে এক আশীর্বাণী বহন করে এনে এই জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে। বাস্তবিকই এটি এক মহান অনুপ্রেরণা-প্রসূত রচনা, যা প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু মানুষের জীবন সম্বন্ধে 'কেন', 'কবে' ও 'কোথায়' প্রভৃতির অনুসন্ধানের সন্ধান দেবে।"

ডঃ জুডিথ এম টাইবার্গ
ফাউণ্ডার এণ্ড ডিরেক্টর
ইস্ট-ওয়েস্ট কালচারাল সেন্টার
লস্ এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া

"...শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তরাধিকারী রূপে, ভারতীয় সংস্কৃতির কর্ণধাররূপে ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যথার্থভাবেই 'কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি' (His Divine Grace) উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বামী প্রভুপাদ সংস্কৃত ভাষার উপর পরিপূর্ণ দখল অর্জন করেছেন। আমাদের কাছে তাঁর *ভগবদ্গীতা-ভাষ্য* মহান অনুপ্রেরণা নিয়ে এসেছে, কারণ তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক স্বীকৃত *ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের* প্রামাণিক বিশ্লেষণ। খ্রিস্টান দার্শনিক ও ভারত-তত্ত্ববিদ্ রূপে আমার এই প্রশস্তি ঐকান্তিক বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি।"

অলিভিয়ার ল্যাকোম্ব
প্রফেসর, ইউনিভার্সিটি দ্যা প্যারিস, সর্বোন
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অভ্ ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন, প্যারিস

"আমি গভীর উৎসাহ, মনোযোগ ও সাবধানতার সঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর গ্রন্থগুলি পাঠ করেছি এবং দেখেছি যে, ভারতের পারমার্থিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে উৎসাহী যে-কোন মানুষের কাছে সেগুলির মূল্য অবর্ণনীয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন দিয়ে গেছেন। বৈষ্ণব দর্শনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও যে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি অত্যন্ত জটিল ভাবধারাগুলি বর্ণনা করেছেন, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে তার মর্ম উপলব্ধি করেছেন।

তিনি অবশ্যই সেই পারমার্থিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, যা অতি অল্প কয়েকজন মহাপুরুষই লাভ করেছেন।"

ডঃ এইচ. বি. কুলকার্নী
প্রফেসর অভ্ ইংলিশ এ্যাণ্ড ফিলসফি
উটা স্টেট ইউনিভার্সিটি, লোগান, উটা

"আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীর এই গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় অবদান।"

ডঃ সুদা এল ভাট
প্রফেসর অভ্ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস
বোস্টন ইউনিভার্সিটি, বোস্টন, ম্যাসাচুসেট্‌স

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃত অনুবাদগুলি ভারত-তত্ত্ববিদ্ ও ভারতের পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী সাধারণ মানুষ, উভয়ের কাছেই এক মহা আনন্দের বিষয়।

"...গভীর মনোযোগ সহকারে যে-ই তাঁর ভাষ্যগুলি পাঠ করবে, সে-ই বুঝতে পারবে যে, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিও শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি, চিন্তা, আবেগ ও বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার এক সুষ্ঠু সমন্বয়।"

"...অত্যন্ত মনোরমভাবে সংকলিত এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আসক্ত মানুষের পাঠাগারগুলি অলংকৃত করবে—তা তিনি পণ্ডিতই হোন, ভক্তই হোন অথবা সাধারণ পাঠকই হোন।"

ডঃ জে. ব্রুস লঙ্গ
ডিপার্টমেন্ট অভ্ এশিয়ান স্টাডিস,
কর্ণেল ইউনিভার্সিটি

গীতা-মাহাত্ম্য

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্ ।

ভগবদ্‌গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে, অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনে ভয় ও শোকাদি বর্জিত হয়ে পরবর্তী জীবনে চিন্ময় স্বরূপ অর্জন করা যায়। *(গীতা-মাহাত্ম্য ১)*

গীতাধ্যায়নশীলস্য প্রাণায়মপরস্য চ ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥

"কেউ যদি আন্তরিকভাবে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে *ভগবদ্‌গীতা* পাঠ করে, তা হলে ভগবানের করুণায় তার অতীতের সমস্ত পাপকর্মের ফল তাকে প্রভাবিত করে না।" *(গীতা-মাহাত্ম্য ২)*

মলিনে মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে ।
সকৃদ্ গীতামৃতস্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥

"প্রতিদিন জলে স্নান করে মানুষ নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি *ভগবদ্‌গীতার* গঙ্গাজলে একটি বারও স্নান করে, তা হলে তার জড় জীবনের মলিনতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়।" *(গীতা-মাহাত্ম্য ৩)*

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥

যেহেতু *ভগবদ্‌গীতার* বাণী স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোন বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ ও কীর্তন করলে আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়। বর্তমান জগতে মানুষেরা নানা রকম কাজে এতই ব্যস্ত থাকে যে, তাদের পক্ষে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজনও নেই। এই একটি গ্রন্থ *ভগবদ্‌গীতা* পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারবে, কারণ *ভগবদ্‌গীতা* হচ্ছে *বেদের* সার এবং এই *গীতা* স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ বাণী। *(গীতা-মাহাত্ম্য ৪)*

ভারতামৃতসর্বস্বং বিষ্ণুবক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্ ।
গীতাগঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"গঙ্গাজল পান করলে অবধারিতভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, আর যিনি *ভগবদ্গীতার* পুণ্য পীযূষ পান করেছেন, তাঁর কথা আর কি বলবার আছে? *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে *মহাভারতের* অমৃতরস, যা আদি বিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলে গেছেন।" *(গীতা-মাহাত্ম্য ৫) ভগবদ্গীতা* পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, আর গঙ্গা ভগবানের চরণপদ্ম থেকে উদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবানের মুখ ও পায়ের মধ্যে অবশ্য কোন পার্থক্য নেই। তবে আমাদের এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, *ভগবদ্গীতার* গুরুত্ব গঙ্গার চেয়েও বেশি।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

"এই *গীতোপনিষদ্ ভগবদ্গীতা* সমস্ত *উপনিষদের* সারাতিসার এবং তা ঠিক একটি গাভীর মতো এবং রাখাল বালকরূপে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গাভীকে দোহন করেছেন। অর্জুন যেন গোবৎসের মতো এবং জ্ঞানীগুণী ও শুদ্ধ ভক্তেরাই *ভগবদ্গীতার* সেই অমৃতময় দুগ্ধ পান করে থাকেন।" *(গীতা-মাহাত্ম্য ৬)*

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব ।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

(গীতা-মাহাত্ম্য ৭)

বর্তমান জগতে মানুষ আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করছে একটি শাস্ত্রের, একক ভগবানের, একটি ধর্মের এবং একটি বৃত্তির। তাই, *একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্*— সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সেই একক শাস্ত্র হোক *ভগবদ্গীতা*। *একো দেবো দেবকীপুত্র এব*—সমগ্র বিশ্বচরাচরের একক ভগবান হোন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *একো মন্ত্রস্তস্য নামানি*—একক মন্ত্র, একক প্রার্থনা, একক স্তোত্র হোক তাঁর নাম কীর্তন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এবং *কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা*—সমস্ত মানুষের একটিই বৃত্তি হোক—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।

* * *

উদ্ধৃতি-সূত্র

ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থের তাৎপর্য অংশগুলিতে সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি প্রামাণ্য বৈদিক সূত্র অনুযায়ী সমর্থিত। সেখানে নিম্নলিখিত প্রামাণিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

অথর্ব বেদ
অমৃতবিন্দু উপনিষদ
ঈশোপনিষদ
উপদেশামৃত
ঋক্ বেদ
কঠোপনিষদ
কূর্ম পুরাণ
কৌষীতকী উপনিষদ
গর্গ উপনিষদ
গীতামাহাত্ম্য
গোপালতাপনী উপনিষদ
চৈতন্য-চরিতামৃত
ছান্দোগ্য উপনিষদ
তৈত্তিরীয় উপনিষদ
নারদপঞ্চরাত্র
নারায়ণ উপনিষদ
নারায়ণীয়
নিরুক্তি (অভিধান)
নৃসিংহ পুরাণ
পদ্মপুরাণ
পরাশরস্মৃতি
পুরুষবোধিনী উপনিষদ
প্রশ্ন উপনিষদ
বরাহ পুরাণ
বিষ্ণু পুরাণ
বৃহদারণ্যক উপনিষদ
বৃহদ্বিষ্ণুস্মৃতি
বৃহন্নারদীয় পুরাণ
বেদান্তসূত্র
ব্রহ্মসংহিতা
ব্রহ্মসূত্র
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
মহা উপনিষদ
মহাভারত
মাণ্ডুক্য উপনিষদ
মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতি
মুণ্ডক উপনিষদ
মোক্ষধর্ম
যোগসূত্র
শ্রীমদ্ভাগবত
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ
সাত্বত-তন্ত্র
সুবল উপনিষদ
স্তোত্ররত্ন
হরিভক্তিবিলাস

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির দর্শন করুন

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কনের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পীঠ এই শ্রীমায়াপুরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এক বৈদিক নগরী, যেখানে সনাতন ধর্মের মূর্ত রূপ প্রদান করার এক বিশেষ প্রয়াস করা হয়েছে। আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সহ্‌ এখানে এসে এখানকার এই দিব্য পরিবেশে আপনার সুপ্ত ভগবদ্ভক্তিকে জাগরিত করুন। এখানে সুরম্য অতিথিশালায় থাকার সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের পথ-নির্দেশ

গাড়ীতে—'ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩৪' ধরে বহরমপুর যাবার পথে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার যাবার পর পথের বাঁ দিকে শ্রীমায়াপুর রোডে মোড় ফিরুন। এই পথে আপনি সোজা শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে এসে পৌঁছবেন।

ট্রেনে—শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর জংশন। সেখান থেকে বাস, স্কুটার-রিক্সা বা ট্যাক্সি পাবেন 'নবদ্বীপ ঘাট' পর্যন্ত। সেখান থেকে জলঙ্গী নদীর অপর পারে শ্রীধাম মায়াপুর। সেখান থেকে রিক্সায় করে ১ কিলোমিটার দূরে শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে যাওয়া যাবে।

হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে রিক্সা করে নবদ্বীপ খেয়া ঘাটে এসে গঙ্গা পার হলেই শ্রীধাম মায়াপুর ঘাট। সেখান থেকে ১ কিলোমিটার দূরে শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির।